ঋতবাক

চতুর্দশ বর্ষ। ৪৯তম সংখ্যা। ২৬তম
ইন্টারনেট সংখ্যা

সূচিপত্র

নির্দিষ্ট লেখাটিতে পৌঁছোতে লেখার ওপরে ক্লিক করুন | সুচিপত্রে ফিরতে লেখার শেষে নিচের ডানদিকে দেয়া বক্স-এ ক্লিক করুন

	বিষয়	লেখা		লেখক
১	জয়ঢাকের দলবল			
২	আমাদের কথা			
৩	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		প্রকল্প ভট্টাচার্য
	কমিক্স	ছোট্ট পিঁপড়ের জোর		অনুপম, অন্তরা
৪		ইনুইটদের গল্প		মৌসুমী
	গল্প	ক	সাদায় কালোয়	শিবশংকর ভট্টাচার্য
		খ)	ছোট্ট হওয়া	কিশোর ঘোষাল
		গ)	গুবরে পোকা শিকারী- আর্থার কোনান ডয়েল	(অনুঃঅমিত দেবনাথ)
		ঘ)	পাথরের চোখ	শিশির বিশ্বাস
		ঙ)	বিকেলবেলায়	সংহিতা
		চ)	খালপাড় অভিযান	তাপস মৌলিক
		ছ)	রূপসী ভূত	রতনতনু ঘাটী
		জ)	বিশ্বনাথের চিত্রনাট্য	সত্যজিত দাশগুপ্ত
		ঝ)	ভয় পেয়ো না	দিলীপ ঘোষ
		ঞ)	খুঁতখুঁতে গৌরাঙ্গবাবু	অদিতি ভট্টাচার্য
৬	ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো- খাইবগড়		অর্ণব
৭	ভূতের আড্ডা	ক	ভূতুড়ে বাড়ি-	পিকলু
		খ	ভূতের গল্প- শলকেনের ছবি তৃতীয় পর্ব	মহাশ্বেতা
		গ	দেশবিদেশের ভূতেরা- পেত্নী, র‍্যাভেন্যান্ট	টুপুর
৮	বিচিত্র দুনিয়া	মরুভূমির লেক- এ মাছ ধরা		অরিন্দম দেবনাথ
	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক
		(খ)	অংকখেলা	সোমনাথ

৯		(গ)	মাথে মে ট্রিকস-	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য
		(ঘ)	বিচিত্র জীবজগত-	বৈজ্ঞানিক
		(ঙ)	চেনা পাখির অচেনা পরিচয়	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
		(চ)	প্রতিবেশী গাছ-	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
		(ছ)	ভারতের বৈজ্ঞানিকঃ মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	সংহিতা
		(জ)	টেকনো টুকটাক- সেতু	কিশোর ঘোষাল
১০	বনের ডায়েরি	(ক)	ভারতের বনাঞ্চল- মণিপুর	সংহিতা
		(খ)	অথ হনুমান কথা	স্বপ্না লাহিড়ী
১১		(ক)	নয়ন দাসের মেজাজ	তরুণ সরখেল
		(খ)	বৃষ্টি হবে	সংহিতা
		(গ)	ছোটবেলা ফিরে পাওয়া	ইন্দ্রাণী সরকার
		(ঘ)	তিন বুড়োর গান	আবু হোসেন
		(ঙ)	খয়েরিটোলা	কৌশিক ভাদুড়ি
		(চ)	প্রণাম	আশুতোষ ভট্টাচার্য
		(ছ)	মামার চন্দ্রযাত্রা	সৌম্যকান্তি জানা
		(জ)	বৃষ্টি	অনুপম চক্রবর্তী
		(ঝ)	ঋতুরং	তন্ময় চট্টোপাধ্যায়
১২		(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
		(খ)	কুইজ	ইন্দ্রশেখর
		(গ)	জানো কি	
		(ঘ)	শব্দখেলা	
		(ঙ)	ড্রুড্‌ল	
		(চ)	অবিশ্বাস্য	
		(ছ)	কীসের ফটো	
		(জ)	আশ্চর্য উলকি	
		(ঝ)	গত সংখ্যার উত্তর	
১৩	ধারাবাহিক উপন্যাস	(ক)	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
		(খ)	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল
		(গ)	অলোকপর্ণার বিড়াল	রোহণ কুন্দুস
১৪	কাতুকুতু	(ক)	অথ গোদো- প্রণবঃ কথা	তাপস মৌলিক
		(খ)	এম বিবিএস এম আর সি পি	স্বপ্না লাহিড়ি

১৫	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	পুরনো বাড়ি	মুকুট
		(খ)	মেহেলের ছবি	মেহেল
১৬	পুরাণ কথা		বুড়ো রাজহাঁস	সংহিতা
১৭	জাপানের গল্প		কাজুমার প্রতিশোধ (তৃতীয় পর্ব)	সংহিতা
১৮	রাশিয়ান সাহিত্য		বাবা ইয়াগার গল্প	প্রচলিত গল্প
			কমিকস	ভালুক কেন থাবা চোষে
১৯	পুরাতনী		গুণদাদা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০	স্মরণীয় যাঁরা		ডাক্তার মধুসূদণ গুপ্ত	উমা ভট্টাচার্য
২১	সুরঢাক		এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
২২	টাইম মেশিন		ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ (অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়)
			ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
২৩	বই পড়া		অংকের ভূত	মহাশ্বেতা
২৪	লোককথা		কুকুর ও ক্যাঙারুর গল্প	মহাশ্বেতা
২৫	বিশ্বের জানালা		কাকমারা	উমা ভট্টাচার্য
২৬	সেই মেয়েরা 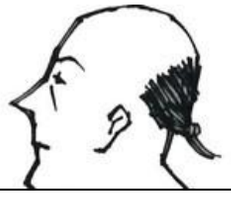		হটী বিদ্যালংকার	উমা ভট্টাচার্য
২৭	আমার শহর		ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়
২৮	জয়ঢাকের কিচেন		ঋকবাবুর রান্নাখেলা—বরশ স্যুপ	তনুশ্রী মুস্তাফি
২৯	দেশ ও মানুষ		যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	উমা ভট্টাচার্য
৩০	সিনেমা হল		মকড়ী	মহাশ্বেতা
৩১	খেলার পাতা		এভারেস্ট	এরিক শিপটন। অনুঃ বাসব চট্টোপাধ্যায়

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প , দেশবিদেশের ভূত

মহাশ্বেতা

বইপড়া, লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডা'র গল্প

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

শিবশংকর ভট্টাচার্য

মলয়চন্দন সাহা

মৌসুমী

মহুল

তাপস মৌলিক

অনুপম

অন্তরা

মুকুট

অর্ণব

শিমুল

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে,তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

দীপংকর

পিকল

সুচিতে ফিরে যান

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

এ ছাড়াও ভবিষ্যতের সম্পাদক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নানা বয়সের সহসম্পাদকের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বড়ো আর মাঝারিদের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছায়ায় বেড়ে উঠবে আগামিদিনের নবপ্রজন্মের পত্রিকা সম্পাদকের দল, এই আমাদের আশা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:)
সহ-সম্পাদকমণ্ডলীঃ উমা, সংহিতা, মহাশ্বেতা, মহুল
অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়
আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুন্দুস।
ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, c/o দেবজ্যোতি। BH-159(গ্রাউন্ড ফ্লোর), সেক্টর-২, সল্ট লেক কলকাতা-৯১
মেইল যোগাযোগ: joydhak@gmail.com

suchipotro

জয়ঢাকি

বোল

হ্যাঁচ্চো, কাশি, ঝর্ণামাসি যাই বলুক,
বৃষ্টি মানেই জল- আকাশে রামধনুক!
শীত, খিচুড়ি, স্কুল ছুটি আর বর্ষাতি,
ভুলোর ল্যাজে পটকা বাঁধা বজ্জাতি!
মাঞ্জাচেরা আকাশ ফুটোয় ঝরুক জল,
কই কে আছিস! দৌড়ে মোড়ে ভিজবি চল

বর্ষাকালে ভালো থেকো সব্বাই। জমিয়ে খিচুড়ি খেও বৃষ্টিভরা রাতে।
এবারে বৃষ্টির বোল লিখেছে তোমাদের প্রকল্পদাদা।

ভালোবাসায় ,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

suchipotro

অনেকদিন আগে উত্তরের বরফের দেশে থাকত এক বুড়ি। বুড়ির তিনকূলে নিজের বলতে কেউ ছিল না,কিন্তু স্বভাবটি ছিল মধুর। তার পড়শিরাই তাকে শিকার করে খাওয়াতো, দেখাশোনা করত।
একদিন তার পড়শিনী এসে বলল,
ঠাকুমা, জানো, আজ শিকারে গিয়ে আমার বর একটা ভালুকছানা পেয়েছে। তুমি কি ওকে রাখবে?
বুড়ি সঙ্গেসঙ্গে বাচ্চাটাকে তার ঘরে নিয়ে এল।
আহা বাছা আমার! ঠান্ডায় জমে গেছে । দেখি তোকে সারিয়ে তুলতে পারি কিনা।
তারপর তাকে গরম রেখে, যত্ন করে সারিয়ে তুলল।
ভালুকছানা তো সেই থেকে তার মানুষ মা’র কাছেই রয়ে গেল। মা’র সঙ্গেই শোয়, মা’র সঙ্গেই খায়। আস্তে আস্তে মা’র কথা শুনে শুনে মানুষের ভাষাও বুঝতে শিখে গেল। শুধু তার নিজের কিছু বোঝানোর দরকার হলে মা’র কাছে গিয়ে নাক ঠেকিয়ে ফোঁসফোঁস করে-
ফোঁসফোঁস (মা খেতে দাও)
এই দিই বাছা
পড়শিরাও বেজায় খুশি। তারাই ভালুকছানার খাবারের জোগান দেয়। আর তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা খেলে বেড়ায় ভালুকছানার সঙ্গে—
খোকা,তোমার নখগুলো ঢুকিয়ে নাও।নইলে খেলতে খেলতে ওদের লেগে যেতে পারে।
ভালুকছানা বরফদানা আমায় এবার খেলতে নে না!

দেখতে দেখতে ভালুকছানা বড় হতে লাগল--

প্রথমে খেলত ছোটোদের সঙ্গে

তারপর খেলত বড়ো খোকাদের সঙ্গে

তারপর একদম বড়োদের সঙ্গে

একদিন সে এমন বিশাল হয়ে গেল যে বড়োরাও তার সঙ্গে খেলায় এঁটে উঠতো না। তারপর তাকে নিয়ে সবাই শিকারে যেতে শুরু করল। দেখতে দেখতে পাকা শিকারি হয়ে উঠল ভালুকছানা। তখন পড়শিদের কথায় মা তার গলায় ঝুলিয়ে দিল চামড়ার মস্ত কলার

বছর ঘুরে গেল। ভালুকছানা এখন বেজায় শক্তিশালী আর নামকরা শিকারি। দূরদুরান্তে তার গল্প শুনে লোকে তাকে দেখতে আসে। যতই তার নামডাক বাড়ে,বুড়ি মার দুশ্চিন্তা ততই বেড়ে চলে-

সেবার গরমে ভালুক গেল সাগরে শিকার করতে। শীতে গেল বরফে- সঙ্গে পড়শিরা। একদিন ঝড়ের রাতে নিয়ে এল এক মরা মানুষের দেহ।

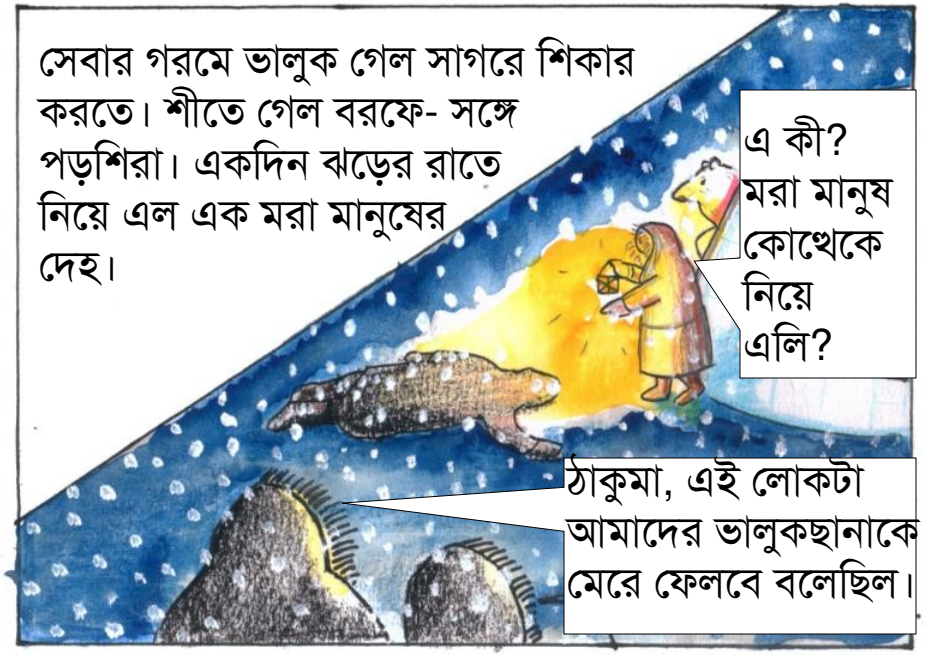

মা তো ভয়েই অস্থির। ভাবতে ভাবতে একমাস গেল, দু'মাস গেল—তিন মাসের মাথায় একদিন কেঁদে ফেলল খোকন বুড়ি আমার, এখানে থাকলে তোমার বিপদ হবে—তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাও।

বুড়ি যত কাঁদে ভালুকছানা ততই কাঁদে, পড়শিরা তার চেয়েও বেশি কাঁদে।

বুড়ি এরপর থেকে প্রতিদিন ভোরে উঠে আকাশ দেখে।

নাঃ, আজ মেঘ

নাঃ, আজ বেশি মেঘ

অবশেষে একদিন ঝকঝকে রোদে ভরা আকাশ দেখে বলে

বাছা আজই তুমি রওনা হও। যতদূর পারো উত্তরে চলে যাও তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে।

ভালুকছানা রওনা হয়

ফোঁৎ ফোঁৎ (মা গো--

খোকা রে—

বুড়ি মা তার গলায় প্রদীপের তেলপোড়া কালিমাখা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

মা কাঁদে

ভালুক ছানা পেছন ফিরে কাঁদে

পড়শিরা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে

কাহিনীর এখানেই শেষ। তবে লোকে বলে, অনেক উত্তরের বরফের দেশে অনেক মেরুভালুকের মধ্যে বরফের চাঁইয়ের মতন বিশাল এক ভালুককে তারা ঘুরতে দেখেছে- যার গলায় মস্ত কালো দাগ।

ইনুইটদের গল্প
বাংলা ভাষান্তর ও চিত্রণঃ মৌসুমী

suchipotro

ছোট্ট পিঁপড়ে-র জোর

গল্প ও ছবি- অনুপম চক্রবর্তী ও অন্তরা চক্রবর্তী

এক গ্রামে একটা গাছে থাকতো একটা দুষ্টু কাক। সে সারাদিন খালি ক্কঃ ক্কঃ করতো আর অন্যের খাবার চুরি করতো।

একদিন সে দেখল একটা পিঁপড়ে মুখে করে কোনও খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে পেয়েই কাক ছোঁ মেরে পিঁপড়ে-র খাবার ছিনিয়ে নিলো।

কিন্তু ঐ গ্রামেই ছিল এক লোভি কুকুর। সে ঐ গাছের তলায় এসে ভৌ-ভৌ করে কাকটাকে চমকে দিলো

চমকে গিয়ে কাকটার মুখ থেকে খাবারটা গেল পড়ে, আর কুকুরটা সেটা মহানন্দে খেতে থাকলো।

পিঁপড়ে ওদের দুজনকে বললো...”আমাদের মধ্যে যে ঐ সাধুবাবার ধ্যান ভাঙাতে পারবে...”

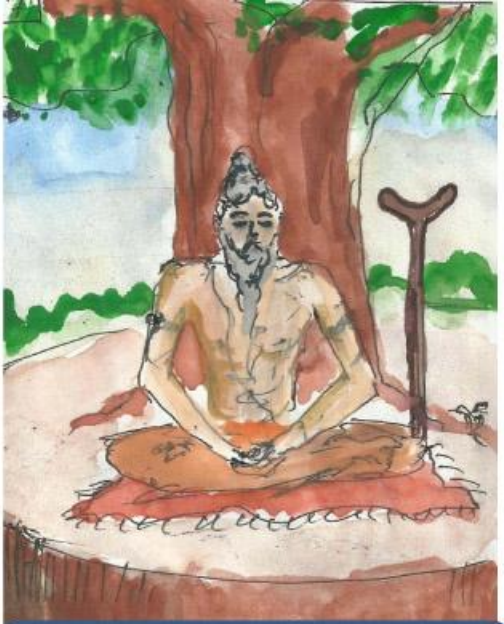

“... সে হবে বিজয়ী। আর সব খাবারের ওপর তার হবে প্রথম অধিকার ।”

ভৌঃ-
ভৌঃ
কুকুর তো প্রথমেই রাজি হয়ে গেলো। সে আগেই গেলো ধ্যান ভাঙাতে।
কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ভৌঃ-ভৌঃ করেও সে সাধুবাবার ধ্যান ভাঙাতে পারলো না ।

কঃ
কঃ
তারপর গেলো কাক। সে সাধুবাবার কানের কাছে সারাদিন ধরে কা-কা করলো, কিন্তু তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলোনা

সবশেষে গেলো পিঁপড়ে। কাক আর কুকুর তো ভাবছে "আমরাই কিছু করতে পারলাম না, ঐ ছোট্ট পিঁপড়ে আর কী করবে?"
পিঁপড়ে কিন্তু ততক্ষণে সাধুবাবার পিঠে উঠে দিয়েছে এক মোক্ষম কামড় !!!

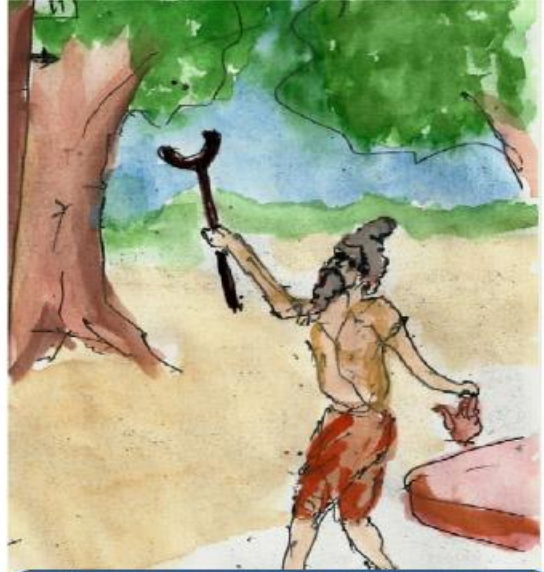

সেই কামড় খেয়ে সাধুবাবা "উরিবাবা" বলে সেখান থেকে পালালেন। ভাবলেন নিরাপদে ধ্যান করার জন্য অন্য কোনও জায়গা খুঁজতে হবে!!!

তখন কুকুর আর কাক বুঝল যে ছোট্ট বলে কাউকে
কম ভাবতে নেই। তারপর থেকে যে যা খাবার পেতো
তার একটু অংশ আগে পিঁপড়ে কে দিতো।
suchipotro

শিবশংকর ভট্টাচার্য

সাদায় কালোয়

রান্নাঘরের পাশে কলতলা। আট' পা- দশ পা বাঁধানো চাতাল, তারপর পুকুরঘাট। এটা একটা দেশ। এ দেশের রাজা কারিয়া। পা দিক এখানে আর কেউ, রেহাই নেই তার। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। সবসময় যে হাজির আছে তা নয়। তবে কান খাড়া আছে, চোখ খোলা আছে, বকুলগাছের একটা পাতা খসে পড়লেও বনবাদার ভেঙে কারিয়া তদন্তে হাজির, রান্নাঘরের বাসন নড়বার শব্দ হলে তো বটেই।

বিষ্টির দিনে কাদায় গড়াগড়ি দেবার অভ্যাস আছে। গরমকালে ধুলোয়। আম্মা বলেন, " ভূত একটা। এ কারণেই নাম পড়েছে কারিয়া পিরেত। পরশুরামদাদার কাছ থেকে ধার করে।

জন্মেছে মাস আষ্টেক। এর মধ্যেই ডাগরডোগর। সামনের দু পা তুলে দাঁড়ালে আপ্পুর কোমর ছুঁতে পারবে। সুযোগ পেলেই চেটে দেবার বদ অভ্যেস আছে। সেদিন বাবুনের গোড়ালি চেটে দিয়েছিল। বাবুনের চোখে খুশি, মুখে বিরক্তি, ধোয়াধুয়ির হ্যাঙ্গাম।

গোল বাধলো পুনু আসায়। পুনু চীনে পিকিনিজ। কুতকুতে টিপ বোতাম চোখ, নাক মাথা গোল, ঝোলা কান, খুরখুরে চলন। সাদা রেশম সুতোর তোড়ার মত লেজ। রেলগাড়ি চড়ে এসেছে পুনু। চামড়ার বকলেশ, রূপোলী চেন। পুনু যথেষ্ট গম্ভীর।

সাদা পুনু ঘরের ভেতর, কালো কারিয়া বাইরে। যেন দিন আর রাত। তেজি পুনুর ভুরু কুঁচকেই থাকে। কথায় কথায় রাগ। আর আদরের ভাগীদার দেখে দুষ্টু কারিয়া হঠাৎ শান্ত। আপ্পু গাল্লুকে দেখলেই লেজ নাড়ে বটে। লাফিয়ে গায়ে ওঠা নেই। চিৎ হয়ে গড়াগড়ি, বাগানময় অকারণ দৌড়, বেড়াল তাড়া করে গাছের মগডালে তোলা বন্ধ।

আপ্পু মন খারাপ করে বলল, " কারিয়ার আফ্রিকায় সাহেব এসেছে।"

মুখোমুখি দেখা হলে পুনু হাঁকডাকে বাড়ি মাথায় করে। কারিয়া বেচারা শান্ত মনোযোগী নজরে এক পলক দেখে চলে যায়। যেন বলতে চায়, " কী দরকার ছিল বকুনি দেবার।"

গাল্লু বড় হচ্ছে। শ্বাস ছেড়ে বলল, " অ্যাপার্টহেইট!"

গুব্বার লুঙ্গীতে থাবা তুলে মার খায় কারিয়া। পুনু আম্মাকে কামড় বসাবার পরেও বড়জোর ধমক।

"কারিয়ার এঁড়ে লেগেছে, বেটি হিংসুটি!" লক্ষ্মীপিসি বলে রাঁধতে রাঁধতে।

ছুটির শেষে সাহেব পুনু রেলগাড়ি চেপে ফিরে গেল তার নিজেদের ঘরে। আম্মা বললেন, "বাঁচা গেল বাপু। সাদায় কালোয় মিল হয়? কী অশান্তি কী অশান্তি!" চাতালের কোণে এঁটোকাঁটা ঢেলে দিয়ে কারিয়ার দুরন্ত লেজে চড় মেরে লক্ষ্মীপিসি বলল, "হিংসুটিটার শান্তি!"

দিন যায় মাস যায়। হঠাৎ চুপ করে যাওয়া কারিয়া আর বদলায় না। আপ্পু চুপি চুপি জানতে চায়, "কী হয়েছে রে কারিয়া? বড় হয়ে গেছিস বুঝি?" কারিয়া চেয়ে থাকে, অল্প লেজ নাড়ে। বাদলা দিনে সন্ধেবেলা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে অদ্ভুত ডাকে কারিয়া। যেন শাঁখের শব্দ। গাল্লু বই গোছাতে গোছাতে আনমনে শুনতে পায়। ডায়রির পাতায় লিখে রাখে, "কারিয়া কাঁদছে আজও।"

পুজো আসছে। বড়পিসি বাপের বাড়ি আসছেন। চিঠির খবর, আবার আসছে পুনু। আম্মা- গুব্বা- মা- বাবা সবাই একসাথে বললেন, "বেচারা কারিয়া।"

একদিন সোনালী রোদের সকালে হই হই পড়ে গেল বাড়িতে। হলদে ট্যাক্সি থেকে সব শেষে নাবলেন বড়পিসি আর রুপালী চেন বাঁধা পুনু। শোনা গেল এ বাড়ি ছাড়বার পর থেকে পুনুও যেন গম্ভীর। চেঁচামেচি কম। খাওয়াদাওয়ায় মন নেই।

বাড়ি ঢোকার মুখে হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে হাত থেকে চেন ছাড়িয়ে ছুটল পুনু বাগানের দিকে। হবে এবার একটা কান্ড। কোথায় ছিল ঝোপের আড়ালে, ছুটে এসেছে কারিয়াও! সাদায় কালোয় মুখোমুখি।

অবাক কান্ড। হাঁক- ডাক নেই, কামড়া- কামড়ি নেই। কারিয়া চেটে দিচ্ছে পুনুকে, পুনু কারিয়াকে। লেজ নড়ছে দুটোরই।

শুরু হল দুরন্তপনা। গড়াগড়ি, ছুটোছুটি, ফুলের ঝাড় তছনছ করে। যেন দুটো জীবন্ত ফুল। সাদায় কালোয় আঁকা চলন্ত ছবি একটা।

আপ্পু, মুনিয়া ছুটল মাঠে। বড়রা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গেলেন। গাল্লু আনমনে বলল, "কী ছিল বিধাতার মনে!"

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

পুরোনদিনের 'সন্দেশ' থেকে।
লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

suchipotro

ছোট্ট হওয়া

কিশোর ঘোষাল

১

প্রফুল্লনগরে তের নম্বরের কোন কোয়ার্টার নেই, বারো নম্বরের পর বারোর এ, তারপরে চোদ্দ। সেদিন পোস্টম্যান রসিকলাল পাণ্ডে এসেছিল বারোর এ- তে চিঠি বিলি করতে। অন্যদিন লোহার নীচু গেটটায় ঠকঠক আওয়াজ করলে, বাড়ির ভেতর থেকে কেউ না কেউ চিঠি নিতে বেরিয়ে আসে। আজ রসিকলাল দু- তিনবার আওয়াজ করা সত্ত্বেও কেউ বের হল না। রসিকলাল বাড়িটার দিকে নিরীক্ষণ করে দেখল। এই দুপুরবেলা, সামনের ঢাকা বারান্দায় সব বাড়িতেই শাড়ি, গামছা, কাপড় চোপড় শুকোতে দেখা যায়। সে সব কিছুই নেই। তার ওপর সিমেন্টের মেঝেয় বেশ কদিন ঝাঁট না পড়া ধুলো আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শুকনো পাতা। রসিকলাল বুঝতে পারল বেশ কদিন হল বাড়িতে কেউ নেই।

চিঠিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আরেকদিন আসবে ডেলিভারি দিতে, নাকি বন্ধ দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে চিঠিগুলো? বেড়ার গায়ে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে, রসিকলাল লোহার গেট খুলে ঢুকে পড়ল সামনের বাগানে। সিমেন্টের বাঁধানো পথে হেঁটে আসতে ভাবল, আজ না দিলে, এই গরমে আবার ফিরে আসতে হবে কাল বা পরশু, তাছাড়া কাল পরশুও যদি না ফেরে? কতদিন কে জানে, চিঠিগুলো তার জিম্মাতেই রাখতে হবে! তার চেয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো। একধাপ উঁচু বারান্দার ধারে এসে রসিকলাল দেখল দু'খানা বড় বড় তালা ঝোলানো বন্ধ দরজার নিচে চিঠি ঢোকানোর মতো যথেষ্ট ফাঁক আছে। বাঁহাতে রাখা চিঠির বাণ্ডিল থেকে এ বাড়ির দুটো চিঠি ডানহাতে নিয়ে রসিকলাল বারান্দায় ওঠার জন্যে পা বাড়ালো, আর সঙ্গেসঙ্গেই আচমকা ছিটকে পড়ল পেছনের সিমেন্ট বাঁধানো সরু রাস্তার ওপর। তার হাতে ধরা চিঠিগুলো ছড়িয়ে পড়ল

রজনীগন্ধা আর বেলিফুলের ঝাড়ের ওপর, আর কাঁধের ব্যাগটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ওপাশে ঘাসের জমিতে।

আচমকা পড়ে গিয়ে রসিকলাল একটু ভয় পেল এবং অবাক হল খুব। গরমটা উৎকট পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মাথা তো ঘোরে নি! আর কেন কে জানে তার মনে হল, কেউ যেন তাকে সামনে

থেকে ধাক্কা মারল। কিছুক্ষণ সিমেন্ট বাঁধানো পথের ওপর বসে একটু ধাতস্থ হয়ে নিল রসিকলাল, তারপর গুছিয়ে তুলে নিল সব চিঠিপত্র আর কাঁধের ব্যাগ। শরীরটা নিশ্চয়ই দুর্বল হয়েছে, সে ঠিক করে ফেলল, আজকে ডিউটি সেরে, কাল থেকে দিনকতক ছুটি নিয়ে বাড়িতে বিশ্রাম নেবে। এ বাড়ির চিঠিদুটো নিয়ে রসিকলাল আবার পা তুলতে গেল বারান্দায় এবং এবারও সে ছিটকে পড়ে গেল পিছনের সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায়!

রসিকলাল এবারে আর একটুও সময় নষ্ট করল না, কোনমতে চিঠিপত্র আর ব্যাগ তুলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল লোহার গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায়। ধীরেসুস্থে সাইকেল চালিয়ে সুধীরবাবু দুপুরের খাওয়া সেরে ওয়ার্কশপে যাচ্ছিলেন, রসিকলাল পড়ল গিয়ে তাঁর ঘাড়ে। হুড়মুড়িয়ে দুজনেই পড়লেন রাস্তার ধারে। বেমক্কা ধাক্কায় সুধীরবাবু রেগে উঠেছিলেন খুব, দাঁড়িয়ে উঠে ভেবেছিলেন আচ্ছা করে দেবেন বেয়াক্কেল লোকটাকে বেশ চার কথা শুনিয়ে। কিন্তু রসিকলালকে চিনতে পেরে আর তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে সুধীরবাবু সামলে নিলেন নিজেকে। জিগ্যেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন, তো, পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করেচে নাকি, অমন ছুটছিলেন কেন উন্মত্তের মতো?"

"এই বাড়িতে নিঘ্‌ঘাত ভূত আছে,"হাঁফাতে হাঁফাতে রসিকলাল বলল। সুধীরবাবু মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। প্রখর রোদজ্বলা দুপুর, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, এই সময়ে ভূত? ভুরু কুঁচকে রসিকলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে ভালো লোক বলেই তো জানতাম। আজকাল নেশা ভাঙ করা হয় নাকি?"

"একদম না, স্যার। মা কালীর দিব্বি। চা ছাড়া কোন নেশা জীবনে করিনি। চিঠি ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিলাম, দু' দুবার বারান্দায় পা তুলতেই কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল! প্রথমবার ভেবেছিলাম, আমার শরীরটাই বোধহয় দুব্বল, মাথাটা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ..." কথা শেষ করতে পারল না রসিকলাল, ভয়ে যেন শিউরে উঠল।

“ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি একা একা যেতে পারবেন তো? অফিসে গিয়ে একটু রেস্ট নিন। হাতের সমস্ত চিঠিই কাঁধের ঝোলায় ভরে রসিকলাল উঠে পড়ল তার সাইকেলে। আজকের ডাক বিলি আপাতত স্থগিত, সে চলে গেল পোস্ট অফিসের দিকে। মাঠের ধারের রাস্তা দিয়ে সাইকেলে তার চলে যাওয়াটা লক্ষ করার পর সুধীরবাবু তাকালেন বারোর এ কোয়ার্টারের দিকে।

এই কোয়ার্টারে থাকেন মুকুন্দবাবু, মুকুন্দ বিষয়ী। নাম বিষয়ী হলেও খুবই অমায়িক সজ্জন। মুকুন্দবাবুর চার কন্যা; বছরখানেক আগে বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মেজ মেয়ে পড়ে ক্লাস টুয়েলভে, ছোট দুটো যমজ – দুজনেই ক্লাস সেভেনে উঠেছে। তিন মেয়েকে নিয়ে মুকুন্দবাবু সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছেন, সিমলা কুলু মানালি। ঠিক কবে গেছেন মনে না করতে পারলেও দিন সাত- আট তো হবেই, পনের দিনের প্রোগ্রাম, কাজেই মুকুন্দবাবুর ফিরতে আরো অন্ততঃ দিন সাতেকের ধাক্কা। সুধীরবাবু একবার ভাবলেন ব্যাপারটা মুকুন্দবাবুকে ফোনে জানিয়ে দেবেন, আবার ভাবলেন কী হবে ভদ্রলোককে ব্যতিব্যস্ত করে? পোস্টম্যান কী করতে কী করেছে কে জানে! মুকুন্দবাবুকে জানানোর আগে, অন্ততঃ নিশ্চিত হওয়া দরকার আসল রহস্যটা কী? তিনি সাইকেলে উঠে ওয়ার্কশপের দিকে রওনা হলেন, ঠিক করলেন ডিউটি সেরে ফেরার পথে, এ রহস্যের তদন্তটা সেরে নেবেন, আপাতত ওটা তোলা থাক।

২

সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে নিজের সাইকেলের লক খুলতে খুলতে সুধীরবাবুর দেখা হল নেপাল ঘোষের সঙ্গে। ছোকরা খুব করিতকর্মা আর পরোপকারী, সুধীরবাবু খুব পছন্দও করেন নেপালকে। নেপালের দিকে তাকিয়ে, সুধীরবাবু বললেন, “এই নেপাল, খুব ব্যস্ত নাকি রে?”

“কেন বলোতো, সুধীদা, কোন কাজ আছে?”

“একটা জিনিস দেখাবো, যাবি?”

নেপাল একগাল হেসে বলল, “তোমার বাগানে আবার বুঝি স্থলপদ্ম ফুটেছে?”

সুধীরবাবুর বাগানের খুব শখ, নানান ধরনের ফুলগাছের চর্চা করা তাঁর নেশা। তাঁর গাছে বিশেষ কোনো ফুলটুল এলে তিনি চেনাশোনা সকলকে ডেকে ডেকে দেখান। অনেকটা ছেলে বা মেয়ের প্রাইজে পাওয়া ট্রফি দেখানোর মতো। তাঁর এই দুর্বলতার কথা অনেকেই জানে। নেপালের কথাটা গায়ে মাখলেন না সুধীরবাবু, বললেন,

“উঁহু, আরো ইন্টারেস্টিং। ভূত। ঠিকঠাক বললে ভূতের ঠেলা, খাবি?”

“এই সুধীদা, তোমার শরীর- টরীর ঠিক আছে তো? তোমার সাইকেলটা রেখে, আমারটায় ওঠো, তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসছি।”

মুচকি মুচকি হেসে সুধীরবাবু নেপালকে কাছে ডাকলেন, তারপর খুলে বললেন রসিকলাল পোস্টম্যানের দুপুরের ঘটনাটা। সব শুনেটুনে নেপাল খুব খানিক হো হো করে হাসল, তারপর বলল, “মুকুন্দদার কোয়ার্টারে ভূতের ঠ্যালা? তুমিও পারো, মাইরি। পোস্টম্যান বলল আর তুমি মেনে নিলে?”

“মেনে নিয়েছি তোকে কখন বললাম? বললাম না তদন্ত করে দেখব, যদি ব্যাটা মিথ্যে কথা বলে থাকে, পোস্টফিসে কমপ্লেন করবো। নেশা করে ভরদুপুরে বাড়ি বাড়ি ডাক বিলি করছে। ওই সময়ে বাড়িতে শুধু মেয়েরাই থাকে, আমরা তো সব ওয়ার্কশপে। কিছু একটা হয়ে গেলে?”

"হুঁ, কথাটা মন্দ বলনি। তবে, চলো ঘুরেই আসি একবার মুকুন্দদার কোয়ার্টারে। দাঁড়াও ওদেরকেও ডাকি।"

ওই সময়েই সাইকেল স্ট্যাণ্ডে সাইকেল বের করতে ঢুকল দেবু নস্কর আর প্রভাত পাল। ওরা নেপালের প্রায় সমবয়সী কলিগ, খুব ভাব তিনজনে। নেপাল দেবুকে ডেকে বলল, "এই দেবু, সাইকেল বের করে তুই আর প্রভু আয় তো, মুকুন্দদার কোয়ার্টারে যাবো।"

"মুকুন্দদারা নেই তো, জানিস না? সেখানে গিয়ে কী করবি?" প্রভু উত্তর দিল।

"আয় না, কাজ আছে। রাস্তায় যেতে যেতে বলব, আমি আর সুধীদা এগোচ্ছি, তোরা আয়।"

মুকুন্দবাবুর বারোর এ কোয়ার্টারের সামনে চারজনে সাইকেল থেকে নামল। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আর বাগানের বেড়ার ধারে কিছু বড় গাছের জন্যে এখন বাড়িটাকে একটু ছায়া ছায়া মনে হল সুধীরবাবুর। এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে বেশ ঘেমে উঠেছিলেন, এখন এই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটা শীতল হাওয়ার অনুভূতি পেয়ে তাঁর আরাম লাগারই কথা, কিন্তু তিনি বেশ অস্বস্তি অনুভব করলেন। ওরা তিনজনে লোহার গেটটা খুলে ঢুকল। সুধীরবাবু নিজের সাইকেলটা ধরে গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নেপাল আর প্রভু আছে সামনে, দেবু ওদের পেছনে। সিমেন্টের বাঁধানো সরু রাস্তাটা পার হয়ে ওরা বারান্দাটার সামলে দাঁড়াল।

"কই, কিছুইতো হল না, সুধীদা?" নেপাল জিগ্যেস করল। তার গলায় ঠাট্টার সুর।

"ওই তো ওই বারান্দাটা, বারান্দায় ওঠ।"

সুধীরবাবুর কথা শেষ হবার আগেই নেপাল আর প্রভু ছিটকে পিছনে এসে পড়ল দেবুর ওপর, তারপর তিনজনেই সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায় চিৎপাত! নেপাল আর প্রভু বারান্দায় ওঠার জন্যে পা রাখতে গিয়েছিল, তাতেই এই বিপত্তি। তিনজনেই মাটিতে পড়ে কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল, তারপর নেপাল চেঁচিয়ে উঠল, "পালা, দেবু পালা, প্রভু, পালা। ও সুধীদা, তোমার মনে শেষ অব্দি এই ছিল? তারপর তিনজনেই উঠে পড়ে হুটোপুটি করে এক দৌড়ে বেরিয়ে এল লোহার গেট পেরিয়ে রাস্তায়। দম নিতে নিতে চারজনে মিলে তাকিয়ে রইল বারোর এ বাড়িটার দিকে।

৩

এই ঘটনার পর সুধীরবাবু মুকুন্দবাবুকে ফোন করেছিলেন। তাঁর থেকে পুরো ব্যাপার জেনে, মুকুন্দবাবু স্ত্রী আর মেয়েদের সব কথা বললেন, শুনে মুকুন্দবাবুর স্ত্রী খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তোমাকে তখনই বলেছিলাম, মেয়েদের কথায় না নেচে, চলো মথুরা, বৃন্দাবন কি হরিদ্বার যাই। তা আমার কথা তুমি কানে তুলবে কেন? এখন কী উপায় হবে সেটা বলো, হাত পা গুটিয়ে, বসে না থেকে কিছু একটা ভাবো। মুকুন্দবাবু খুব অবাক হয়ে মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বোঝো, সিমলা, কুলুর সঙ্গে বাড়িতে ভূতের ঠ্যালার কি সম্পর্ক?"

আরো অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মুকুন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে মুকুন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, "এখনো বুঝলে না?"

"নাঃ।"

"ভুত প্রেতরা কার সঙ্গে থাকে, কার চ্যালা চামুণ্ডা?"

"কার আবার? শিব ঠাকুরের আর মা কালীর।"

"অ্যাই, এতক্ষণে মাথা খুলছে। পাহাড় দেখা, বরফ দেখা অনেক হয়েছে। বরফ দেখে কার কটা হাত পা গজিয়েছে শুনি? নামার সময় হরিদ্বার হয়ে চলো, ওখানে পুজো দিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে গেলে, সব অমঙ্গল ঘুচে যাবে।

"কিন্তু রিজার্ভেশন? আমাদের রিজার্ভেশন তো কালকা থেকে, সেটা ক্যানসেল করালে হরিদ্বার থেকে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না, খুব ভিড় এই সময়টায়।

"সে আমি জানিনা, তুমি জানো আর জানে তোমার রেল কোম্পানি।" মুকুন্দবাবুর স্ত্রী দুমদুম করে পা ফেলে স্নান করতে ঢুকলেন হোটেলের বাথরুমে। সেখান থেকে বললেন, "টুম্পি, রুনুঝুনু, আমার হয়ে গেলে তোরাও চান করে রেডি হয়ে নে, হিড়িম্বা টেম্পলে পুজো দিতে যাবো।" মুকুন্দবাবুর মেজমেয়ের নাম টুম্পি আর ছোট দুই যমজ মেয়ের নাম রুনু আর ঝুনু।

বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনার পর টুম্পি চাপা গলায় বাবাকে জিগ্যেস করল, "কী হতে পারে বল তো, বাবা?"

মুকুন্দবাবু ঠোঁট উল্টে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, "কে জানে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না।"

টুম্পি বিজ্ঞানের ছাত্রী, ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। তার ধারণা, পৃথিবীতে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই, সব ব্যাপারের ব্যাখ্যাটা হয়তো আমরা ঠিক ধরতে পারিনা, কিন্তু সেটা বুঝতে পারলেই সব জলবৎ তরলং, দুই আর দুইয়ে চার। একটু চিন্তা করে সে বলল, "ম্যাগনেটিক ফিল্ড? আমার মনে হচ্ছে এটা জিওম্যাগনেটিক ফিল্ডের সমস্যা।"

"তার মানে? চুম্বক ঠেলে ফেলে দিচ্ছে সবাইকে!" মেয়ের পাণ্ডিত্যে চমকে উঠলেন মুকুন্দবাবু।

"ধুর, এ চুম্বক সে চুম্বক নাকি? আমাদের এই পৃথিবীটাও একখানা বিশাল চুম্বক, ভুলে গেলে? ঝামেলা হচ্ছে পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা আমাদের লোহার চুম্বকের থেকে বেশ আলাদা। পৃথিবীর উত্তর মেরুটা সামান্য নড়াচড়া করে, তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর পেটের মধ্যে জমে থাকা গরম তরল লোহা। তাছাড়া, কয়েক লক্ষ বছরে একবার, এমনও হয় পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরুটাই উল্টে যায়। যদিও খুব সামান্য সময়ের জন্যে।"

মুকুন্দবাবু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন টুম্পির কথায়, "আমাকে আর জ্বালাস না, টুম্পি। তোর কী মনে হচ্ছে, আমাদের বারান্দায় যে যখন পা তুলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীর মেরুদুটো 'ও কুমীর তোর জলকে নেমেছি' বলে কুমীরডাঙা খেলছে, আর ওপারে গিয়ে ভেসে উঠছে?"

রুনুঝুনু খিক খিক করে হেসে উঠল বাবার কথায়, তার চেয়েও মজা পেল, বাবার কাছে দিদির হেনস্থাতে। দিদিটা এত পাকু, আর এত দিদিগিরি ফলায়, অসহ্য। টুম্পি দুই বোনকে একটুও পাত্তা না দিয়ে বাবাকে বলল, "তোমার ফোনটা দাও তো, বাবা।"

"কেন, এখন আবার কাকে ফোন করবি?"

"সরুদাকে।"

"সরু কী করবে?"

"এমনি, ব্যাপারটা বলব, সরুদা কী বলে দেখি।"

সর্বজিৎ, ডাকনাম সরু, টুম্পিদের মাসতুতো দাদা। খুব ভালো ছেলে, আই আই টি কানপুরে পড়ে, থার্ড ইয়ার। টুম্পির ধারণা বিজ্ঞানে সরুদা হচ্ছে শেষ কথা। মুকুন্দবাবু টুম্পির হাতে ফোনটা দিয়ে উঠে গেলেন ঘরের বাইরে বারান্দায়। রুনুঝুনু নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া- চাওয়ি করে চুপটি করে দেখতে লাগল দিদির কাণ্ডকারখানা। সরুদাকে ফোনে সব কথা বলল টুম্পি, তারপর নিজের ব্যাখাটাও শোনাল খুব জাহির করে। শুনে সরুদা এত জোরে হাসল হো হো করে, রুনু- ঝুনুও

পরিষ্কার শুনতে পেল সেই আওয়াজ। টুম্পির মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছিল তখন। রেগে গিয়ে টুম্পি বলল, "বেশি হ্যা হ্যা করে হেসো না তো? খুব যে হাসছো, তুমিই তাহলে বল না ব্যাপারটা কী?"

"সিম্পল, ভূত। ভবিষ্যত হয়তো থাকবে, বর্তমান নিশ্চয়ই রয়েছে, ভূত তো তাহলে ছিলই।" হাসি থামিয়ে সরুদা ফোনে বলল টুম্পিকে। টুম্পি বেজার মুখ করে ভেংচি করে উত্তর দিল, " 'ভূত তো তাহলে ছিলই', ছিলই যদি, তাহলে সেটা বর্তমান হয়ে গেল কী করে, শুনি?"

"সে অনেক জটিল ব্যাপার, এখন তুই বুঝবি না। আরো ছোট হ, বুঝতে পারবি।"

"ছোট হবো, তার মানে?"

"হুঁ ছোট হ। ছোটরা অনেক কিছু চট করে বুঝে ফেলে, বড়োরা পাকামি করতে গিয়ে কেঁচিয়ে একশেষ হয়। চিন্তা করিস না, রুন্টু- ঝুন্টু ঠিক জানে, দেখে নিস। সরুদা রুনুঝুনুকে আদর করে রুন্টুঝুন্টু বলে। ফোনটা কেটে দিয়ে, টুম্পি বলল, "বলে কি না, ভূত? এক নম্বরের ভূত।"

রুনুঝুনুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সরুদা কী বলল পুরোটা শুনতে, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না, মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এমন তাগাদা দিলেন, ফোন রেখে টুম্পি ঢুকে পড়ল বাথরুমে। রুনু ঝুনুকে চুপিচুপি বলল, "সরুদা, ভূতই বলল, না?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝুনু বলল, "সরুদা, সবই তো জানে।"

৪

ছোট্ট নিরিবিলি শহর প্রফুল্লনগর তোলপাড়। চারপাঁচদিনে মুকুন্দবাবুর কোয়ার্টারের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকাল কেব্‌লে দিনে সতেরবার দেখাচ্ছে ওই বারোর এ- র ছবি। ওরা দুটো ডানপিটে ছোঁড়াকে ধরে বারান্দায় ওঠার এবং ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হবার লাইভ রেকর্ডিং করেছিল। সেটা স্লো মোশনে লাগাতার দেখাচ্ছে, সিনেমার ফাঁকে ফাঁকে। কোয়ার্টারের সামনের

মাঠটায় মেলার মতো ভিড়। লাল আর বেগুনি রংয়ের কাপড়ের তাঁবু ফেলে আস্তানা গেড়েছে এক জটাধারী সাধু, সঙ্গে তার দুই চেলা। সাধুবাবার গা হাত পা টিপছে, আর মাঝে মাঝে ব্যোম শংকর হুংকার দিচ্ছে। সাধুবাবা বলছে, "ওই বাড়িতে বাসা বেঁধেছে বেম্মদত্তি। ইয়াব্বড়ো গোঁফ, মাথায় বাবরি চুল আর কাঁধে ধবধবে পৈতে। দখল করে নিয়েছে বাড়িটা, কাউকে ঢুকতে দেবেনা। যদিও অনেক হ্যাপা কিন্তু এর একমাত্র সমাধান মহাপ্রবেশ যজ্ঞ।"

দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ চেলা এই সাধুবাবা। মহাদেবের আদেশ, "যা বেটা, পার কর দে মুকুন্দকো অওর উস্‌কা পরিবারকো, বসা দে উন্‌কা ঘর।" মহাদেবের আদেশেই নাকি হিমালয় থেকে সরাসরি সাধুবাবা এসেছে। দেবতার কি লীলা, সুদূর কৈলাসেও বিখ্যাত হয়ে গেছেন মুকুন্দবাবু!

বিস্তর লোকজন আসছে মুকুন্দবাবুর কোয়ার্টার দেখতে, আর সেই সঙ্গে সাধুবাবার কাছে ভাগ্য গণনা করতে। বাবামহাদেবের সঙ্গে যে সাধুবাবার রোজ কথা হয়, সেটা জানতে আর কারো বাকি নেই। সেইসঙ্গে চারদিকে বসে গেছে, অনেক ফেরিওয়ালা। এগরোল থেকে জিভে জল আনা আচারের স্টল। আইসক্রিম, বুড়ির চুল, ফুচকা, চুরমুর, আলুকাবলি সারাদিনে এত বিক্রি হচ্ছে, সামলাতে পারছে না ফেরিওয়ালারা।

মুকুন্দবাবুরা হরিদ্বার ঘুরে যেদিন আসানসোলে ট্রেন থেকে নামলেন, স্টেশনের বাইরেই শুনলেন, মিনিবাসের কণ্ডাকটার হাঁকছে মুকুনবাড়ি, মুকুনবাড়ি। বাসের গায়ে লেখা আছে প্রফুল্লনগর- আসানসোল, এটা যে তাঁদের ওদিকেই যাচ্ছে, সেটা না বোঝার কোন কারণ নেই, কিন্তু মুকুনবাড়ি স্টপেজটা কোথায় তিনি বুঝতে পারলেন না। প্রফুল্লনগর যাবার বাস চিরকাল তিনি আসানসোল বাসস্ট্যান্ড থেকেই ছাড়তে দেখেছেন। এবারে স্টেশন থেকে ছাড়তে দেখে তিনি অবাক হলেও লটবহর নিয়ে বাসে উঠে পড়লেন, সিটও পেয়ে গেলেন সকলে। আরো লক্ষ করলেন পাঁচমিনিটের মধ্যে বাস ছেড়ে দিল, কারণ বাসটা ভরে গিয়ে গেটে দুজন ঝুলছে! পিছনে আরো দুটো প্রফুল্লনগরের বাস দাঁড়িয়ে, কণ্ডাকটারগুলোও ডাকছে মুকুনবাড়ি, মুকুনবাড়ি। সে বাস দুটোও ভরতে দেরি নেই, এত লোকের ভিড়।

বাড়ির যতো কাছাকাছি আসছেন, ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে মুকুন্দবাবুর, আর তাঁর স্ত্রী ঘন ঘন হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাচ্ছেন হরিদ্বারের পুষ্প। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললে মুকুন্দবাবুর দুশ্চিন্তার চাপটা একটু হয়তো কমত, কিন্তু ভিড়ের জন্যে বলতে পারছিলেন না। কিন্তু রূপনারায়ণগঞ্জ বাসস্টপে ঘোষবাবু বাসে উঠে মুকুন্দবাবুকে দেখতে পেয়ে দরজা থেকেই বললেন, "কি মুকুন্দবাবু, বাড়িতে জলজ্যান্ত বেম্মদত্তি পুষছেন, আর আমরা কেউ জানতেই পারলাম না!"

মুকুন্দবাবু যে ভয়ে এতক্ষণ কথা বার্তা বলছিলেন না, সেটাই ঘটে গেল। বাসের সব লোক মুকুন্দবাবুর দিকে গোলগোল চোখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একজন দেহাতি ওই ভিড়ের মধ্যেই নিচু হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "গোড় লাগি মহারাজ, গোড় লাগি। বোলো মুকুনমহারাজ কি জয়।" বাসভর্তি লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "জয়।"

লাগাতার জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে মুকুনবাড়ির রহস্যটাও তাঁর বোধগম্য হল – মুকুন্দবাড়ি, দেহাতি ভাষায় মুকুনবাড়ি হয়ে গেছে। আমলাবাগান মার্কেটের বাসস্টপটাই মুকুন্দবাবুর বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছে। একটু আগেই তিনি মেয়েদের তাড়া দিলেন, "রেডি হ। নামতে হবে সামনের স্টপে।"

সেই শুনে ঘোষবাবু, আর বাসের কণ্ডাক্টর হই হই করে উঠল, "বাস তো আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই যাবে, সবাই নামবে, ওখানেই খালি হয়ে যাবে।" ভক্তি গদগদ সেই দেহাতি লোকটা

নিচু হয়ে বলল, "পরেশান মত হোইয়ে মহারাজ, সব হি আপকা কিরপা।" তারপর দুহাত তুলে বলল, "মুকুনদেও কি জয়।"

অমনি সমস্বরে রব উঠল "জয়।"

সত্যি সত্যি বাসটা রাস্তা পালটে তাঁর বারোর এ কোয়ার্টারের সামনে থেমে গেল। হুড়মুড় করে নামতে লাগল বাসের সব যাত্রী। সবার শেষে মুকুন্দবাবুরা ধীরেসুস্থে নেমে এলেন, তাঁদের লটবহর নামিয়ে দিল বাসের যাত্রীরাই! বাস থেকে নামা মাত্র চেনাজানা পড়শিরা ঘিরে ধরল তাঁদের। পাশের কোয়ার্টারের বক্সিদা আর বৌদি বললেন, "এবেলা আমাদের বাড়ি চলো, তেতেপুড়ে এসেছ, একটু জিরিয়ে নাও। ওবেলা দেখা যাবে যাগযজ্ঞ কী করলে কী করা যায়।"

মুকুন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী হকচকিয়ে দেখতে লাগলেন সবকিছু, মাঠের মেলা, মাইকের ভজন, চারপাশের গিজগিজে ভিড়। টুম্পিও হতভম্ব হয়ে বাড়ির লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিল, তাদের বাড়িটা নিয়ে এমন কাণ্ড হচ্ছে! এদিকে রুনু আর ঝুনু লোহার গেট খুলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায়। দুইবোন হাত ধরাধরি করে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে দিদিকে ডাকল, "এই মেজদি, বাড়ি ঢুকবি না? ডাক শুনে টুম্পি ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখেই চিৎকার করে উঠল, "কী করছিস কী তোরা? পালিয়ে আয়।"

তার চিৎকার শুনে আশেপাশে সকলেই চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল, "না।" ততক্ষণে রুনুঝুনু উঠে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, দুজনের মুখেই হাসি, টুম্পিকে বলল, "বাবার থেকে চাবিটা চেয়ে আন না, মেজদি, দরজাটা খুলি'।

৫

বাসায় ঢুকেই পনের দিনের পড়ে থাকা ঘরের ধুলো সাফ করতে লেগে গেলেন মুকুন্দবাবুর স্ত্রী। মুকুন্দবাবু চট করে বেরিয়ে এনে দিলেন আলু, ডিম আর টুকটাক জিনিসপত্র। টুম্পির ঘাড়ে পড়ল ভাত আর ডিমের ঝোল রান্নার দায়িত্ব। গোছগাছ সেরে, চান খাওয়া করতে করতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। দীর্ঘ জার্নির ক্লান্তি আর চরম দুশ্চিন্তার অবসানে, সকলেই ঘুমিয়ে নিলেন ঘন্টা দুয়েক। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাইরে বারান্দায় এসে বসলেন মুকুন্দবাবু, তাঁর স্ত্রী আর টুম্পি। রুনুঝুনু চা বানাচ্ছে তিনজনের জন্যে। রাস্তা পার হয়ে সামনের বিরাট মাঠটা আগের মতোই শুনশান। গোটা পাঁচেক কুকুর কি সব শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে আর অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সাধুবাবার ফেলে যাওয়া ধুনি থেকে। এসব দেখে কে বলবে কয়েক ঘন্টা আগেও ওখানে বসেছিল জমজমাট মেলা। রুনুঝুনু বাবা- মা আর দিদিকে চা দিয়ে, বারান্দার ধারে দাঁড়াল। সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে রুনু বলল, "ইস, অমন সুন্দর মেলাটা কি রকম ভেস্তে গেল, না?"

ঝুনু উত্তর দিল, "সত্যি, এই সময় দিব্বি চুরমুর খাওয়া যেত, কতদিন চুরমুর খাওয়া হয় নি, বল?"

"আর ফুচকা? ইস, একদম ঘরের সামনে, বাটি ভরে তেঁতুলজল নিয়ে নেওয়া যেত, কি মজা। ইস!"

দু বোনে জিভে জল টানার শব্দ করে হাসল। মুকুন্দবাবু তিন চার চুমুক চা খেয়ে ওদের ডাকলেন, "রুনু, ঝুনু, এইদিকে আয় দেখি, আমার কাছে বোস।"

দুজনে বাবার পাশে এসে বসল। মুকুন্দবাবু আবার বললেন, "এবারে বল তো, ব্যাপারটা কী হয়েছিল?" রুনুঝুনু ভয় পাওয়া মুখে বসে রইল মুখ নিচু করে।

"কোন ভয় নেই, বল না কী হয়েছিল। আমি জানি, তোরা সব জানিস। আমাদের সকলের দুশ্চিন্তায় ঘুম ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু আমি দেখেছি তোরা দুটিতে বেশ মজা পাচ্ছিলি আমাদের কথাবার্তায়।"

রুনু ঝুনুর মুখের দিকে একবার তাকালো, ঝুনু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে রুনুর কাঁধে হাত রাখল। রুনু বলল, "বেড়াতে যাবার দিন তুমি বললে না, পনের দিন বাড়িটা শুধু দুটো তালার ভরসায় ছেড়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে, তাই –" রুনু একটু দ্বিধা নিয়ে থেমে গেল।

"তাই, কী?" মুকুন্দবাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন। টুম্পি এবং মুকুন্দবাবুর স্ত্রীও আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন দুই বোনের দিকে।

"তাই, আমরা রুকু আর সুকুকে বলে গিয়েছিলাম, পাহারা দিতে। আমরা পাঁচজন ছাড়া, বারান্দায় কাউকে যেন উঠতে না দেয়।"

"রুকু- সুকু, তারা আবার কে?"

"ভূত।"

"ভুত! যমজ ভুত?"

"হ্যাঁ। ওরাও যমজ, তবে ভাই।"

"তাদেরকে তোরা চিনলি কী করে? পেলি কোথায়?"

"ক্লাস সিক্সের রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল বলে তুমি আর মা বকবে ভয়ে আমরা দুজনে ওই গাছতলায় বসেছিলাম," মাঠের দিকে হাত তুলে গাছটা দেখাল রুনু। মুকুন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, "সর্বনাশ, ওটা তো পাকুড় গাছ!" মুকুন্দবাবু হাত তুলে স্ত্রীকে চুপ করতে বললেন। রুনু আবার বলতে শুরু করল, "সন্ধে হয়ে এসেছিল, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। আশেপাশে কাউকে দেখতে পাইনি প্রথমে। তারপর দেখলাম আমাদের থেকে হাত তিনেক দূরে এইটুকুনি একটু চিকিমিকি আলো, আর সেদিক থেকেই আসছে কান্নার আওয়াজ। আরো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, ফ্যাকাশে রঙের সুকুকে। সুকু হাঁটু ধরে কাঁদছে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে ঝাপসা রুকু, আর খুব চেষ্টা করছে সুকুকে ভুলিয়ে রাখতে।"

"তোদের ভয় করে নি?" মুকুন্দবাবু জিগ্যেস করলেন।

"না, আমরা এমনিতেই তোমাদের ভয়ে ছিলাম, আর কত ভয় পাবো?"

মুকুন্দবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বোঝো কাণ্ড, তারপর?"

"ঝুনুই প্রথম কথা বলল, জিগ্যেস করল, 'তোমরা কারা? ও কাঁদছে কেন?'

" 'আমার নাম রুকু, আর ও হচ্ছে সুকু, আমরা দুই ভাই, ঠিক তোমাদের মতো যমজ। আজকে ফুটবল খেলতে গিয়ে পল্টুর বলে ও এমন জড়িয়ে গেল, হাঁটুর ছাল উঠে গিয়ে ব্যাথা পেয়েছে, তাই কাঁদছে।'

"ওখানটায় আলো জ্বলছে কেন?

" 'ওমা, তাও জানো না, তোমাদের যেমন ছাল উঠে গেলে রক্ত বেরোয়, আমাদের বেরিয়ে পড়ে, আলো। রাত্রে আলো আর দিনের বেলায় কালো। আমাদের চামড়ার রং আবার উল্টো, দিনের বেলা আলো আর রাতের বেলা কালো। সেই জন্যেই তো আমাদের চট করে দেখা যায় না। মুশকিল কি জানো, ওর ওই কাটা থেকে যতো আলো বেরোবে, ও ততো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, আর ওকে দেখতে পেয়ে যাবে মানুষেরা। তা হলেই আমাদের খুব বিপদ। সবাই তো তোমাদের মতো ভালো নয়।'

“সেদিন আমরা ওদের দুজনকে আমাদের বাড়ি এনেছিলাম, ওরা ওই পেয়ারা গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল চুপটি করে। আমরা ডেটল দিয়ে সুকুর হাঁটুটা মুছে একটা ব্যান্ড- এড লাগিয়ে দিতেই, ওর আলো পড়া বন্ধ হয়ে গেল। তিন চারদিনের মধ্যে সেরেও উঠল সুকু। সেই থেকে আমাদের সঙ্গে খুব ভাব।”

“আহারে, মরে যাই, ছেলে দুটোর মা নেই বুঝি?” চোখের জল মুছে মুকুন্দবাবুর স্ত্রী বললেন।

টুম্পি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “সরুদা কী করে জানলো ওদের কথা?”

“গতবার সরুদা যখন এসেছিল, আমাদের সঙ্গে ওদের কথা বলতে দেখে ফেলেছিল যে! জিগ্যেস করেছিল, ‘ঝাপসাদুটো কে রে?’”

“সরুদা তিনদিনের জন্যে এসে দেখে ফেলল আর আমি দেখতে পেলাম না এতদিনেও?”

“ছোট হ, দিদি, তুইও দেখতে পাবি।” গম্ভীর মুখে টুম্পি বলল।

“হুঁ, সরুদাও একই কথা বলেছিল সেদিন। বড়ো হতে হতেও, ছোট্ট হতে হবে। তা না হলে..

- **-

ছবিঃ মলয়চন্দন সাহা

suchipotro

এই যে আমি, ডা. হ্যামিলটন, ডাক্তারিতে দেশজোড়া খ্যাতি আমার। কিন্তু মশাইরা, আপনারা জানেন কি, আজ আমার এত পসার, এত নামডাকের পেছনে লুকিয়ে আছে এক দারুণ অভিজ্ঞতা, নিদারুণও বলতে পারেন। ঘটনাটা এতই কৌতুহলজনক এবং বিস্ময়কর যে, কোনও লোকের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা দুবার ঘটবে বলে মনে হয় না। সেই ঘটনাই আজ আপনাদের শোনাব, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের অভিরুচি।

তখন সদ্য ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছি, প্র্যাকটিশ তখনও শুরু করিনি, থাকতাম গোয়ার স্ট্রিটের এক ভাড়া বাড়িতে। এখন অবশ্য সে রাস্তার নাম পালটে গেছে। মেট্রোপলিটন স্টেশন থেকে নেমে বাঁ হাতে তখনকার রাস্তায় ওইরকম খিলান দেওয়া জানালাওলা বাড়ি একটাই ছিল। তিনজন ডাক্তার আর একজন ইংজিনিয়ারিং- এর ছাত্র তখন ভাড়া থাকত ওই বাড়িতে। মার্চিনসন নামের এক বিধবা মহিলা ছিলেন ওই বাড়ির মালকিন। সবচেয়ে সস্তা হবে বলে আমি ছাদের ঘরটায় থাকতাম। তখন আমার জমানো পুঁজি ছিল খুব সামান্যই, আর প্রতি সপ্তাহেই দ্রুত কমে আসছিল তা। প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম যে বসে না থেকে কিছু একটা করা দরকার। আসলে তখনও পর্যন্ত আমার সাধারণ ডাক্তারি প্র্যাকটিশ করার ইচ্ছে ছিল না, কারণ বিজ্ঞান ছিল আমার প্রিয় বিষয়, বিশেষ করে প্রাণীবিদ্যার ওপর ঝোঁকটা ছিল আমার বরাবরই বেশি। যাই হোক, যখন আরও পড়াশোনার ব্যাপারে হাল প্রায় ছেড়ে দিয়ে সেই চিরাচরিত ডাক্তারির একঘেঁয়ে উঞ্ছবৃত্তিই বেছে নিতে চলেছিলাম, সে সময়েই এমন একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

একদিন সকালে খবরের কাগজটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। যথারীতি সেই বস্তাপচা রাজনীতির একঘেয়ে খবর পড়ে বিরক্ত কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি, সেই সময় ব্যাক্তিগত কলামে একটা বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনটা অনেকটা এই রকম-

"এক বা তার বেশিদিনের জন্য একজন ডাক্তার চাই। আবেদনকারীকে চমৎকার স্বাস্থ্য, কঠিন স্নায়ু এবং দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হতে হবে। কীটপতঙ্গের ওপর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গুবরে পোকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হলে অগ্রাধিকার। আবেদনকারী নিজে, আজ দুপুর বারোটার মধ্যে ৭৭বি, ব্রুক স্ট্রিটে এসে দেখা করুন।"

বন্ধুগণ, আগেই বলেছি যে প্রাণীবিদ্যা আমার প্রিয় বিষয় এবং প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুবরে পোকা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল আমার সবচেয়ে বেশি। বেশ কিছু লোক আছে যারা প্রজাপতি সংগ্রহ করে। কিন্তু অনেকেই জানেনা যে কীটপতঙ্গের মধ্যে গুবরে পোকার বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। সে কারণেই গুবরে পোকা আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করত এবং আমি প্রায় শ- খানেক গুবরে পোকার একটা সংগ্রহও গড়ে তুলেছিলাম। আমি জানতাম, স্নায়ুর ওপর আমার যথেষ্ট দখল আছে আর ডাক্তারি পড়ার সময় শটপাটে আমি ইন্টার কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। পরিষ্কার ব্যাপার এই, যে আবেদন করার পক্ষে আমার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। সুতরাং বিজ্ঞাপনটা পড়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আমি ব্রুক স্ট্রিটের দিকে রওনা হলাম।

যেতে যেতে এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটার মানে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। চমৎকার স্বাস্থ্য, কঠিন স্নায়ু, দৃঢ় সংকল্প, ডাক্তারি, আবার গুবরে পোকা সম্পর্কে জ্ঞান- এসবের মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায়? তার ওপরে আবার কাজটা পাকা নয়, যে কোনও দিনই চাকরি নাকচ হয়ে যেতে পারে। যতই ভাবছিলাম, ততই যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভাবাই ছেড়ে দিলাম, কারণ তখন আমার যা অবস্থা, তাতে আমার আর হারাবার কিছু ছিল না, পয়সাকড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল বললেই চলে, কাজেই আমি যে কোনও কাজই করতে রাজি ছিলাম, যাতে সৎভাবে দুটো পয়সা রোজগার করা যায়। আমার অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই জুয়াড়ির মতো, যার পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই, তাও এটা সেটা বাঁধা রেখে জুয়া খেলে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করছে!

৭৭বি, ব্রুক স্ট্রিটের বাড়িটা বেশ পুরনো, কমসে কম পঞ্চম জর্জের আমলে তৈরি বলেই মনে হয়, বিবর্ণ, মলিন, প্রথম দর্শনে তেমন নজরকাড়া নয়। গাড়ি থেকে নামতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন যুবক, ব্যাজার মুখে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে আমার দিকে এমন বিচ্ছিরি আর কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাল যে আমার মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। হাঁ বন্ধুগণ, বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল! কারণটা আর কিছুই নয়, ছোকরার হাবভাবে মনে হচ্ছিল যে ও- ও একজন আবেদনকারী এবং ইনটারভিউতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। অতএব আমার এখনও সুযোগ আছে। সুতরাং বেশ আশা নিয়েই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজায় জোরে কড়া নাড়লাম।

একজন চাপরাশি এসে দরজা খুলে দিল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বাড়ির মালিক অত্যন্ত সচ্ছল এবং শৌখিন।

"বলুন স্যার, কাকে চাইছেন?"

"আমি একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে- "

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন স্যার," চাপরাশিটি বলল, "লর্ড লিনচমেয়ার আপনার জন্য লাইব্রেরি রুমে অপেক্ষা করছেন।"

লর্ড লিনচমেয়ার! নাম যেন শুনেছি শুনেছি মনে হল, কিন্তু কোথায় শুনেছি সেই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না। যাই হোক, চাপরাশির পেছন পেছন লাইব্রেরি রুমে উপস্থিত হলাম। বইবোঝাই বিরাট ঘরের একপাশে একটা লেখার টেবিলের পেছনে একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ বসে ছিলেন। প্রশান্ত মুখ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, ধুসর লম্বা চুলের গোছা ব্যাকব্রাশ করা। আমার নাম লেখা কার্ডটা

চাপরাশি তাঁর হাতে দিতে, তিনি সেটা ডানহাতে ধরে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর, তাঁর মুখে এমন একটা হাসি ফুটে উঠল যে আমার মনে হল যেভাবেই হোক, প্রথম ধাপটা বোধহয় উতরে গেলাম।

"ডা. হ্যামিলটন, আপনি তো আমার কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপনটা দেখেই আসছেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যা, স্যার।"

"আপনার কি মনে হয়, আমারা যেসব যোগ্যতা চেয়েছি সেগুলো আপনার আছে?"

"আমার মনে হয়, আছে।"

"আপনি অবশ্য বেশ শক্তিশালী লোক, সেটা আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি।"

"আমার গায়ে বেশ জোর আছে বলেই আমার ধারণা।"

"দৃঢ়তা?"

"যথেষ্ট।"

"আপনি কি জানেন, আপনি যে কাজে এসেছেন, তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে?"

"না, তা জানি না।"

"অথচ আপনার মনে হচ্ছে সে সময়ে আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবেন?"

"আমার বিশ্বাস আমি পারব।"

"ঠিক আছে, আমারও মনে হচ্ছে, আপনি পারবেন। আমার দেখে ভাল লাগল যে আপনি কাজটা সম্পর্কে কিছু না জেনেও সবজান্তা ভাব দেখাননি। আমার ধারণা, আপনিই সেই লোক, যাঁকে আমি খুঁজছি। তাহলে এবার আমরা পরের কথায় যেতে পারি।"

"পরের কথা?"

"গুবরে পোকা সম্বন্ধে আপনি কতদূর কী জানেন, বলুন তো?"

গুবরে পোকা! ঠাট্টা করছে নাকি লোকটা? সোজা তাকালাম তাঁর মুখের দিকে, দেখলাম তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"আমার মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না!" তিনি বলে উঠলেন।

"আপনাকে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে বিজ্ঞানের এই শাখাটায়, আমার ধারণা, আমি সত্যিই কিছু খোঁজখবর রাখি।"

"আমি শুনতে আগ্রহী। আপনি বলুন, কী কী জানেন?"

আমি বললাম। গুবরে পোকা সমন্ধে বিশদ বিবরণে না গিয়ে, এদের স্বভাব, এদের বিভিন্ন প্রজাতি ইত্যাদি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিলাম, আমার যে ছোট সংগ্রহটা আছে এবং গুবরে পোকা নিয়ে আমার লেখা একটা প্রবন্ধ যে কীটপতঙ্গ সম্বন্ধীয় জার্নালে বেরিয়েছে, তাও জানালাম।

"বাঃ, চমৎকার!" চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড লিনচমেয়ার, "আপনার নিজস্ব সংগ্রহশালাও আছে!" তাঁর চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠল। "আপনি নিশ্চিতভাবেই সেই লোক যাঁকে আমি খুঁজছি! আপনাকে দিয়েই আমার কাজ হবে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আমি জানতাম এত বড় লন্ডন শহরে এরকম একজন লোক থাকবে না এটা হতে পারে না, তবে তাঁকে খুঁজে বার করাই মুশকিল। আপনাকে যে পেয়েছি, এতে আমি নিজেই নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করছি।"

তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে চাপরাশিকে ডাকলেন।

"লেডি রোজিস্টারকে এখানে নিয়ে এসো," তিনি বললেন এবং একটু পরেই ঘরে প্রবেশ করলেন লেডি রোজিস্টার। ছোটখাটো চেহারার মাঝবয়সি মহিলা, লর্ড লিনচমেয়ারের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য আছে। চুলের রঙ ও তেমনই কালচে- ধূসর রঙের। লর্ড লিনচমেয়ারের মুখে যে একটা উদ্বেগের ছাপ লক্ষ করছিলাম, দেখলাম, এই মহিলার মুখেও সেই রকম উদ্বেগের ছাপ, এ ছাপ বরং আরও গভীর। মনে হল, কোনও কারণে মহিলা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছেন। লর্ড লিনচমেয়ার আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় যখন তিনি ঘুরে পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। তাঁর কপালে ডান ভুরুর ওপরে প্রায় দু- ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ শুকিয়ে এসেছে। একটা প্লাস্টার দিয়ে ক্ষতটা ঢাকা দেওয়া, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ক্ষতটা বেশ গভীর এবং খুব বেশি আগে ওটা

ঘটেনি।

"ইভলিন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ডা.হ্যামিলটনকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, আমাদের কাজের পক্ষে উনি একেবারে যোগ্য ব্যাক্তি," লর্ড লিনচমেয়ার বললেন, "উনি একজন গুবরে পোকা বিশেষজ্ঞ ও সংগ্রাহক এবং এ সমন্ধে ওঁর লেখা প্রবন্ধও বিভিন্ন জার্নালে বেরিয়েছে।"

“ওমা, তাই নাকি?” লেডি রোজিস্টার বললেন, “তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আমার স্বামীর নাম শুনেছেন। গুবরে পোকা সম্বন্ধে যাঁদেরই আগ্রহ আছে, তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই স্যার টমাস রোজিস্টারের নাম শুনবেন।”

অ্যাই! এই প্রথমবারের জন্য আমি এই অদ্ভুত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলাম। এতক্ষণে, এঁদের সঙ্গে গুবরে পোকার একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল। স্যার টমাস রোজিস্টার এ বিষয়ে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যাক্তি। তিনি সারাজীবন এদের নিয়ে গবেষণা করেই কাটিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধও বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আমি বললাম যে আমি শুধু তাঁর নামই শুনিনি, তাঁর বহু লেখাও পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি।

লেডি বললেন, “আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?”

“আজ্ঞে না।”

“এবারে করবেন,” লর্ড লিনচমেয়ার বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বললেন।

ডেস্কের পাশে, লর্ড লিনচমেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন লেডি রোজিস্টার। তাদের মুখের এত মিল যে আমি নিশ্চিত হলাম তাঁরা নিশ্চয়ই ভাইবোন।

“চার্লি, তাহলে তুমি সত্যিই কাজটা করতে যাচ্ছ? তুমি হয়ত ভালোর জন্যই করছ, কিন্তু আমার খুব ভয় করছে।” লেডির গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল অজানা আশঙ্কায় এবং লর্ড লিনচমেয়ার যখন কথা বললেন, তাঁর গলাও কেঁপে উঠল, যদিও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংযত রাখার।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, কোনও ভয় নেই, আর, আর- এছাড়া তো অন্য কোনও রাস্তাও নেই।”

“কিন্তু উপায় তো আছেই।”

“না না, ইভলিন, কোনোমতেই তোমার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না- কিছুতেই না। সব ঠিক হয়ে যাবে, আর এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই না যে, এই ভদ্রলোককে আমারা আমাদের মধ্যে পেয়েছি।”

আমি তাঁদের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বোধহয় এঁরা ভুলেই গেছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই লর্ড লিনচমেয়ার সচেতন হয়ে উঠলেন আমার সম্পর্কে এবং আমার দিকে তাকালেন।

“কাজের কথায় আসা যাক, ডা. হ্যামিলটন। আমি চাই, আপনি এখন থেকে সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। আপনাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে এবং সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকবেন। আর আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আমি এখন থেকে যা বলব, আপনি তৎক্ষণাৎ তাই করবেন, সে আপনার কাছে যতই অর্থহীঊন মনে হোক না কেন।”

“আপনি সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন,” আমি বললাম।

“দুর্ভাগ্যবশত, আমি এখন এর চেয়ে বেশি কিছু আপনাকে বলতে পারছি না কারণ আমি নিজেই জানিনা কী ঘটতে চলেছে। তবে একটা ব্যাপার আমি বলতে পারি যে আমি আপনাকে এমন কিছু করতে বলব না যা আপনার বিবেকে বাধবে এবং আপনাকে আরো একটা কথা বলতে চাই যে যদি সবকিছু ঠিকঠাক শেষ হয় তবে এ কাজের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনি গর্ববোধ করবেন।”

“যদি সবকিছু ঠিকঠাক শেষ হয়,” লেডি বললেন।

“ইয়ে, আমি কোন পারিশ্রমিক পাবো কি?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"দিনে কুড়ি পাউন্ড।"

আমার চমকানিটা লর্ড লিনচমেয়ার লক্ষ করেছিলেন, মৃদু হেসে তিনি বললেন, "বিজ্ঞাপনটা পড়ে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলেন, আমরাও আপনাকে পেয়ে তেমনি অবাক হয়েছি, কারণ এতগুলো বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য একজন মানুষের মধ্যে পাওয়ার ঘটনাও খুবই বিরল। সে কারণেই আপনার পারিশ্রমিকটাও উপযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গোপন করে লাভ নেই, আপনার কাজটা বেশ কষ্টকর। এমনকি বিপজ্জনকও হতে পারে। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি, পুরো ব্যাপারটা বোধ হয় একদিন কি দুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অন্তত সেরকম সম্ভাবনা আছে।"

"ওঃ ভগবান!" অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন লেডি রোজিস্টার।

"তা হলে ডঃ হ্যামিলটন, আপনার ওপর আমি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি তো?"

"সম্পূর্ণভাবে," আমি বললাম, "শুধু বলুন, আমাকে কী করতে হবে।"

"আপনার প্রথম কাজ হল এখনই বাড়ি ফিরে যাওয়া। দিনকয়েক বাইরে যাবার জন্য গোছগাছ করে তৈরি হয়ে নিন। আজ বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে প্যাডিংটন স্টেশন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করব।"

"অনেক দূরের পথ?"

"প্যাংবোরন পর্যন্ত ট্রেনে যেতে হবে। আমি টিকিট কেটে রাখব।তাহলে এখন গুডবাই ড: হ্যামিলটন। আর হ্যাঁ, দুটো জিনিস যদি আপনি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে বড়ই বাধিত হব। একটা হচ্ছে আপনার সংগ্রহের কিছু গুবরে পোকা, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে একটা লাঠি। লাঠিটা বেশ বড়ো আর মোটাসোটা হলে ভালো হয়।"

বন্ধুগণ, বুঝতেই পারছেন, ব্রুক স্ট্রিট থেকে বাড়ি ফিরে আবার প্যাডিংটন স্টেশনে লর্ড লিনচমেয়ারের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত অজস্র হাবিজাবি চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল। পুরো ব্যাপারটাই এমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল যে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। চিন্তা করে প্রত্যেকবারই একেকটা নতুন নতুন কারণ খুঁজে বের করছিলাম, আর প্রত্যেকটা আগের চেয়ে এমন উদ্ভট ঠেকছিল যে শেষ পর্যন্ত ভাবাই ছেড়ে দিলাম। দরকারি জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলাম একটা ছোট ব্যাগে, গুবরে পোকা সংগ্রহের একটা বাক্স নিলাম, আর নিলাম শক্তপোক্ত একটা বেতের ছড়ি। ঠিক সময়েই পৌঁছে গেলাম প্যাডিংটন স্টেশনে। প্রায় তখনই পৌঁছে গেলেন লর্ড লিচেনমেয়ার। আমি যতটা ভেবেছিলাম, তাঁকে তার চেয়েও ছোটখাটো লাগছিল—আরো দুর্বল, আরো ফ্যাকাশে, সকালের চেয়েও আরো অনেক বেশি সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল তাঁকে। একটা লম্বা, পুরু ওভারকোট পরেছিলেন তিনি এবং আমি লক্ষ করলাম তাঁর হাতে একটা কালো রঙের মোটা লাঠি। সেটা এতই মোটা যে লাঠি না বলে লগুড় বললেই ভালো হয়।

"টিকিট কিনে এনেছি। চলুন যাওয়া যাক," বলে তিনি প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

"এই আমাদের ট্রেন। আমি একটা গোটা কামরাই রিজার্ভ করে নিয়েছি। কারণ যেতে যেতে আপনাকে দু একটা কথা বলবার প্রয়োজন মনে করছি।"

বন্ধুগণ, সারা সারা রাস্তা তিনি যা বলতে বলতে গেলেন তা হল এই যে, আমি তাঁর রক্ষক হিসেবে যাচ্ছি, আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি এবং আমি যেন কোন অবস্থাতেই তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও না যাই। গোটা রাস্তায় এই কথাগুলিই তিনি ঘুরিয়েফিরিয়ে বারবার বলতে লাগলেন এবং আমি দেখতে পেলাম, কথাগুলো বলতে গিয়ে তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন।

শেষ পর্যন্ত, আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "হ্যাঁ ড: হ্যামিলটন, আমি ভয় পাচ্ছি। আমি বরাবরই ভিতু মানুষ, দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে আমার সাহস আরও

কম। কিন্তু মনের জোর আমার যথেষ্টই আছে, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি ভয় পাইনা। অনেক শক্তিশালী মানুষের চেয়েও আমার মনের জোর বেশি। আজ আমি যা করতে চলেছি, সেটা বাধ্য হয়ে নয়, পুরোপুরি দায়িত্ববোধ থেকে, যদিও নিঃসন্দেহে কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ কাজে যদি ব্যর্থ হই তাহলেও জানব যে একটা মহৎ কাজ করতে গিয়ে আমার মৃত্যু ঘটল।"

এই প্রহেলিকা, হেঁয়ালিভরা কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার মনে হল, আমার কিছু বলা দরকার।

"স্যার, আমার মনে হয় আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখলে ভালো করবেন," আমি বললাম, "আমাদের কাজটা কী, এমন কি আমরা কোথায় যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কিছু না জানলে আমার পক্ষে সবকিছু ঠিকঠাক করা সম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমরা কোথায় যাচ্ছি এটা বলতে আর আপত্তি কোথায়?" তিনি বললেন, "আমরা যাচ্ছি ডেলামেয়ার কোর্টে, স্যার টমাস রোজিস্টারের বাড়িতে, যাঁর নাম আর কাজের সঙ্গে আপনি পরিচিত। এ যাত্রা আমাদের কোন লাভ হবে কি না বলতে পারছি না, যদিও আপনার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে। আপনাকে গোপন করে লাভ নেই, আমরা অভিনয় করছি। হ্যাঁ ড: হ্যামিলটন, 'আমরা' মানে আমি আর আমার বোন, লেডি রোজিস্টার, কারণ এর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্মান জড়িত। আমি চাই, যেভাবেই হোক পারিবারিক কেচ্ছা কেলেংকারিকে রুখতে হবে। এর চেয়ে বেশি কিছু এখনই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, আর এক্ষুণি তার কোন প্রয়োজনও নেই। আপনাকে সব খুলে বললে এখন বরং উলটো ফল হতে পারে। সবচেয়ে ভালো যেটা হবে তা হল আপনার সক্রিয় সহযোগিতা, যেটার প্রয়োজন আমার সবচেয়ে বেশি। আমি আপনাকে ঠিক ঠিক সময়ে বলে দেব কখন কী করতে হবে।"

এর পরে আর কোনও কথা চলে না। তার ওপর আবার দিনে কুড়ি পাউন্ড পারিশ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে। তবুও আমার মনে হচ্ছিল, লর্ড লিনচমেয়ার খুব বাজে ব্যবহার করছেন আমার সঙ্গে। তাঁর ইচ্ছে, তাঁর হাতের ওই মোটা লাঠিটার মতই আমাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। যাই হোক, তাঁর মেজাজ দেখে মনে হচ্ছিল যে এই ঘটনাটা, সেটা যা- ই হোক না কেন, তাঁর কাছে বড়োই চিন্তার বিষয় এবং আরেকটা ব্যাপারও আমার মনে হচ্ছিল যে যতক্ষণ অন্য কোনও কিছু না ঘটছে ততক্ষণ তিনি পুরোপুরি আমার ওপর ভরসা করতে পারছেন না। এ রহস্যের সমাধানের জন্য চোখ আর কানের ওপর ভরসা রাখতে হবে, তবে এটুকু আত্মবিশ্বাস আমার ছিল যে তাঁরা যে আমার ওপর ভরসা করছেন তা বিফলে যেতে দেব না।

প্যাংবোরন স্টেশন থেকে ডেলামেয়ার কোর্ট প্রায় মাইল পাঁচেকের পথ। এই রাস্তাটুকু আমরা একটা খোলা গাড়িতে চেপে গেলাম। গোটা রাস্তাটাই লর্ড লিনচমেয়ার চুপ করে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করছেন। যখন আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন তিনি হঠাৎ এমন একটা কথা বললেন, যা আমাকে সত্যিই অবাক করল, " আপনি কি জানেন ডঃ হ্যামিলটন যে আমিও আপনার মতন একজন ডাক্তার?"

"বলেন কী? আমি তো জানতাম না!"

"আমার তরুণ বয়সে আমি ডাক্তারি পাশ করি। আমি কখনো প্র্যাকটিশ করিনি বটে, কিন্তু শিক্ষাটা নিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তারি পড়ার সেই দিনগুলোর কথা আমি এখনো ভুলতে পারি না। এই যে ডেলামেয়ার কোর্ট এসে গেছে।"

গেটের দুপাশে দুটো পিলারের মাঝখান দিয়ে ছায়াঢাকা পথ ঢুকে গেছে প্রাসাদের বুকে, লরেল আর রডোডেনড্রন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রাসাদের আইভিলতায় ছাওয়া পুরোনো ইটের

তৈরি ত্রিকোণাকৃতি ছাদের কানাগুলোকে। সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম এই বিরাট, চমৎকার প্রাসাদের বিভিন্ন অংশগুলোর দিকে, এমন সময় আমার সঙ্গী উত্তেজিতভাবে আমার হাত খামচে ধরলেন।

"ওই আসছেন টমাস," চাপা গলায় বললেন তিনি, "গুবরে পোকা সম্বন্ধে যা জানেন বলবেন।"

লম্বা, রোগা চেহারার এক ব্যক্তি লরেল ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলেন। দস্তানা পরা হাতে

একটা খুরপি। বড়োসড়ো কানাওয়ালা টুপিতে তাঁর মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না বটে, তবে মুখভর্তি এলোমেলো দাড়ি আর একেবারেই সাদামাঠা চালচলনে বোঝা যাচ্ছিল যে ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ। গাড়ি থামতেই লর্ড লিনচমেয়ার লাফ দিয়ে নামলেন।

"টমাস, কেমন আছো?" খুব আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কিন্তু স্যার টমাস কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর শ্যালকের কাঁধের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, আর আমি অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা টুকরো টুকরো কথার ফুলকি, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে—এটা কে এসেছে সঙ্গে—আস্ত উজবুকের মত চেহারা—যত্তসব ফালতু ঝামেলা—" শেষে লর্ড লিনচমেয়ার তাঁকে ফিসফিস করে কী বললেন, তারপর তাঁরা দুজনে গাড়ির পাশ দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

"ডঃ হ্যামিলটন, স্যার টমাস রোজিস্টারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই," লর্ড লিনচমেয়ার বললেন, "ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আপনার আশা করি খুব ভালো লাগবে।"

আমি তাঁকে অভিবাদন করলাম। স্যার টমাস অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর টুপির ফাঁক দিয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন।

"লর্ড লিনচমেয়ার আমাকে বললেন যে তুমি নাকি গুবরে পোকার সম্বন্ধে কিছু জানো টানো? কী জানো হে তুমি?"

"গুবরে পোকা সম্বন্ধে আপনার যে সমস্ত গবেষণাপত্র রয়েছে সেগুলো থেকেই আমি অনেককিছু জানতে পেরেছি স্যার টমাস," আমি বললাম।

"ব্রিটেনে যেসব প্রজাতির গুবরে পোকা দেখা যায় তার কয়েকটার নাম বলো তো শুনি।"

আমি ঠিক এরকম প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিলাম না, যদিও সৌভাগ্যবশত কয়েকটার নাম আমার মনে ছিল, সেগুলো বললাম। আমার উত্তরটা তাঁকে খুশি করল বলেই মনে হল, কারণ তিনি অনেকটা সহজ হলেন।

"বাঃ। আপনি তো সত্যিই আমার বইপত্র পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে মশাই" তিনি বললেন, "এসব ব্যাপারে আগ্রহ আছে এরকম লোকজনের তো প্রায় দেখাই পাই না। মানুষ এত আজেবাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করে, কিন্তু গুবরে পোকার মত আশ্চর্য প্রাণী নিয়ে মাথাই ঘামায় না। আপনাকে বলছি, আমাদের দেশের বেশির ভাগ মাথামোটা লোকগুলো জানেই না যে আমি—হ্যাঁ , একমাত্র আমিই এদের নিয়ে গবেষণা করছি বা কোনও বইপত্র লিখেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়োই খুশি হলাম। চলুন, আপনাকে আমার সংগ্রহশালা দেখাই। আমি নিশ্চিত, দেখে আপনার খুব ভালো লাগবে।" তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন আর বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কে আমাদের বলতে লাগলেন।

আগেই বলেছি যে স্যার টমাস রোজিস্টার এক বিরাট কানাওয়ালা টুপি পরেছিলেন, যেটাতে তাঁর ভুরু পর্যন্ত ঢাকা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করে তিনি টুপিটা খুলে ফেললেন, আর তখনই একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখে আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ সেটা টুপির আড়ালে ছিল বলে বোঝা যায় নি। তাঁর চওড়া কপালটা, যেটা চুলের স্বল্পতার জন্য আরো বেশি চওড়া দেখাচ্ছিল, থরথর করে কেঁপে চলেছে। স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে মাংসপেশিগুলো কখনও সামান্য কাঁপছিল, আবার পরক্ষণেই প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি আগে কখনও দেখি নি। পড়ার ঘরে ঢোকার পর তিনি আমাদের দিকে তাকাতেই এটা আরও বেশি করে চোখে পড়ল। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা কপালের নীচের ভুরুর তলা দিয়ে একজোড়া কঠিন, ধূসর চোখ মেলে তিনি যখন আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, ব্যাপারটার অদ্ভুত বৈপরিত্যের জন্য তখন রহস্যময় মনে হচ্ছিল তাঁকে।

"আমি দুঃখিত," তিনি বললেন, "লেডি রোজিস্টার এখন এখানে নেই। আপ্যায়নের হয়তো একটু ত্রুটি হবে। ভালো কথা চার্লি, ইভলিন কবে ফিরবে কিছু বলেছে নাকি?"

"ও তো শহরে আরও কয়েকদিন থাকবে বলল," লর্ড লিনচমেয়ার বললেন, "আর তুমি তো জানোই যে মেয়েরা একবার শহরে গেলে আর আসতেই চায় না। কতরকম কাজ যে ওদের থাকে, কে জানে! বোন এখন লন্ডনে তার পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা করে বেড়াচ্ছে।"

"তাই নাকি? ঠিক আছে, ও ওর মতন ঘুরেফিরে আসুক, যে ক'দিন থাকতে চায় থাকুক, আমার আপত্তি নেই। তবে ও ফিরে এলেই ভালো হতো। ও না থাকলে বাড়িটা বড়ো খালি খালি লাগে।"

"ঠিকই তো। খালি খালি তো লাগবেই। সেইজন্যেই তো আমি ড: হ্যামিলটনকে নিয়ে এখানে চলে এলাম। তোমার বিষয়ে ওঁর আগ্রহ এত বেশি যে আমি জানি ওঁকে নিয়ে এলে তুমি কিছু মনে করবে না।"

"আমার এখন অবসর জীবন ড: হ্যামিলটন, আর সেইজন্যেই আমি আজেবাজে লোককে একদম পাত্তা দিই না," স্যার টমাস বললেন, "যৌবন বয়সে আমাকে গুবরে পোকার খোঁজে প্রচুর ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, বহুবার আমাকে অস্বাস্থ্যকর সব জায়গায় থাকতে হয়েছে। বহুবার ম্যালেরিয়াতেও ভুগেছি। সে

জন্য ফালতু লোকদের এখন আমার কাছে ঘেঁষতে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তবে আপনার মতন একজন ভ্রাতৃপ্রতিম গুবরে পোকা বিশেষজ্ঞ সবসময়েই আমার কাছে স্বাগত। আমি খুব খুশি হব যদি আপনি আমার সংগ্রহ দেখেন। জোর দিয়ে বলতে পারি, এ ব্যাপারে গোটা ইউরোপে আমার থেকে বেশি কেউ জানে না।"

বাস্তবিক এতে কোন সন্দেহই নেই। ওককাঠের তৈরি বিরাট ক্যাবিনেটের মধ্যে খোপে খোপে সাজানো ছিল বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা গুবরে পোকা—কালো, বাদামি, নীল, সবুজ এবং আরো নানারকম রঙের। প্রত্যেকটি সঙ্গে আটকানো ছিল নাম আর শ্রেণীবিভাগ করা টিকিট, প্রতি মুহূর্তেই তাঁর হাত ঘুরছিলো এধার থেকে ওধারে। অনর্গল তিনি তাদের নাম- ধাম- স্বভাব সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন, পরম মমতায় হাত বোলাচ্ছিলেন পোকাগুলোর ওপরে আর ধারাভাষ্য চলছিল ক্রমাগত—কীভাবে এই দুর্লভ জীবগুলো তাঁর হাতে এলো। এ'রকম একটা অসাধারণ গবেষণার বিষয় নিয়ে এত মনোযোগী শ্রোতা তিনি সম্ভবত আগে পাননি, সেই কারণেই অনর্গল বকে যাচ্ছিলেন তিনি,যতক্ষণ পর্যন্ত না বিকেল রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল। চমক ভাঙল ঘন্টার শব্দে—ডিনারের সময় সমাগত।

সারাক্ষণই লর্ড লিনচমেয়ার তাঁর ভগ্নীপতির একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি কোনও কিছুকে ভয় পাচ্ছেন, কোনও কিছুর প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু সেটা যে কী তা অনেক ভেবেও বের করতে পারলাম না।

বিকেলটা বেশ ভালোভাবেই কাটল। সত্যি কথা বলতে কি, আরও ভালোভাবে কাটত, যদি লর্ড লিনচমেয়ারকে অত চিন্তা করতে না দেখতাম। এর মধ্যে গৃহস্বামীর সঙ্গেও আলাপ আরও গাঢ় হয়েছে। তিনি বারংবার বলছিলেন তাঁর স্ত্রীর কথা, আর সেইসঙ্গে তাঁর ছোট ছেলের কথাও, যে এখন বোর্ডিং স্কুলে থাকে। ওরা থাকলে বাড়ির চেহারাটাই পালটে যেত বলে তিনি ক্রমাগত আক্ষেপ করছিলেন। তাঁর গবেষণাগার আর সংগ্রহশালাটি না থাকলে যে তাঁর সময় কাটত না, বলতে লাগলেন তাও। ডিনারের পর আমরা বিলিয়ার্ড রুমে বসে কিছুক্ষণ ধুমপান করলাম, তারপর একটু তাড়াতাড়িই শুতে চলে গেলাম।

সেই প্রথমবার আমার মনে হল, লর্ড লিনচমেয়ারের মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে। স্যার টমাস নিজের ঘরে চলে যাওয়ার পর তিনি সোজা আমার শোবার ঘরে চলে এলেন।

"ডাক্তার," তিনি দ্রুত চাপা গলায় বললেন, "আপনি আমার ঘরে আসুন। আজ রাত্রে আপনি আমার ঘরে শোবেন।"

"তার মানে?"

"মানে বোঝানোর সময় নেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনি আমার কথা মানতে বাধ্য। আমাদের ঘরদুটো একদম কাছাকাছি, কাজেই সকালে চাকররা এসে ডাকবার আগেই আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারবেন।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ আমি একা শুতে ভয় পাচ্ছি," তিনি বললেন, "আর এটাই কারণ।"

পরিষ্কার পাগলামির লক্ষণ।অনেকগুলো প্রশ্ন মুখের সামনে গজগজ করছিল। কিন্তু তক্ষুনি দিনে কুড়ি পাউন্ড পারিশ্রমিকের কথাটা মাথায় আসায় প্রশ্নগুলো আপাতত মুলতুবি রেখে তাঁর পেছনপেছন তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"দেখুন," আমি বললাম, "ঘরে কিন্তু একটাই বিছানা।"

"হ্যাঁ, কেবল একজনই শুতে পারবে," তিনি বললেন।

"তাহলে আরেকজন কী করবে?

"সে জেগে পাহারা দেবে।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এমন করছেন যেন কেউ আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।"

"আমি সেইরকমই আশংকা করছি।"

"তাহলে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন না কেন?"

"হয়তো আমি আক্রান্ত হতে চাই বলে!"

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে দেখা গেল। পাগল আর কাকে বলে! যাই হোক, এখন আর দেখা ছাড়া কোনও কাজ নেই। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফায়ার প্লেসটার সামনের আরামকেদারাটাতে বসে পড়লাম।

"তাহলে আমি বসে পাহারা দিই," আমি বললাম একটু ক্ষুব্ধ হয়েই।

"না না, আমরা ভাগাভাগি করে পাহারা দেব। আপনি যদি দুটো অবধি জেগে থাকেন তাহলে বাকি রাতটা আমি পাহারা দেব।"

"বেশ।"

"তাহলে ঠিক দুটোর সময় আমাকে ডেকে দেবেন।"

"ঠিক আছে।"

"সবসময়েই সজাগ থাকবেন, কান খোলা রাখবেন। যদি কোনওরকম শব্দ শোনেন তবে সেই মুহূর্তেই—বুঝতে পেরেছেন—সেই মুহূর্তেই আমাকে ডেকে দেবেন।"

"আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন," আমি গুরুত্ব দিয়েই বললাম, যতটা তিনি দিচ্ছেন।

"আরেকটা কথা, ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, কোন অবস্থাতেই ঘুমোবেন না," বলে তিনি কোটটা খুলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমার অত্যন্ত বিরক্ত লাগছিল। গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে। যদি ধরেও নিই যে লর্ড লিনচমেয়ার যে কোনও কারণেই হোক স্যার টমাস রোজিস্টারের বাড়িতে তাঁর নিজের ওপরে হামলার আশংকা করছেন, তাহলে কেন তিনি নিজেকে রক্ষা করবার জন্য দরজাটা বন্ধ করে দিলেন না? তাঁর নিজের ভাষায়, তিনি আক্রান্তই হতে চান—এ আবার কেমন কথা? কেন তিনি নিজের ওপর আক্রমণ চাইছেন? আর, কে- ই বা তাঁকে আক্রমণ করবে? পরিষ্কার কথা, লর্ড লিনচমেয়ার কোনও মানসিক রোগে ভুগছেন, আর তার ফলে যেটা হল, আমার রাতের ঘুমের বারোটি বাজল। যাই হোক, যখন তাঁর সঙ্গে, তাঁর হয়ে কাজ করতে এসেছি, তখন তাঁর নির্দেশ আমাকে অক্ষরে অক্ষরে মানতেই হবে। ফাঁকা ফায়ারপ্লেসটার পাশে বসে বসে আমি শুনতে লাগলাম বাইরের কোনও ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ঘন্টা বাজবার শব্দ। সময় যেন আর কাটতে চাইছিল না। ঘড়ির ওই শব্দ ছাড়া গোটা বাড়িটা একেবারে শুনশান, নিস্তব্ধ। আমার সামনের টেবিলটায় একটা ছোট বাতি জ্বালানো ছিল। তাতে আমার সামনেটায় একটু আলো হচ্ছিল বটে কিন্তু ঘরের বাকি অংশটা একেবারে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ছিল। খাট থেকে লর্ড লিনচমেয়ারের গভীর নিশ্বাস- প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তাঁকে ঘুমোতে দেখে আমার রীতিমত হিংসে হচ্ছিল, আর বারবার চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু চটকা ভেঙে যাচ্ছিল বারবারই, কারণ আমার অবচেতন মনে কাজ করছিল, যে জেগে থাকাটাই আমার কাজ, তাই বারবারই ফের সোজা হয়ে বসছিলাম, চোখে পাতা কচলে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিলাম, আর প্রতীক্ষা করছিলাম কখন সময় শেষ হয় তার জন্য।

অবশেষে দীর্ঘ ক্লান্তির প্রতীক্ষার অবসান হল। বাইরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। আমি ঘুমন্ত লর্ড লিনচমেয়ারের কাঁধে হাত রাখতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন, তাঁর চোখেমুখে একটা উদগ্রীব জিজ্ঞাসা।

"কিছু শুনতে পেয়েছেন?"

"না স্যার। এখন ঠিক দুটো বাজে।"

"ঠিক আছে। এখন আমি জাগছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে লম্বা হলাম, আর অচিরেই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। শেষ মনে আছে বাতির গোল আলোটা, আর লর্ড লিনচমেয়ারের কুঁজো, ঝুঁকে পড়া ছোট্ট শরীরটা, মুখে উৎকন্ঠার স্পষ্ট ছাপ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, আচমকা হাতে একটা হ্যাঁচকা টান খেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরজোড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু একটা তেলপোড়া গন্ধে বোঝা যাচ্ছিল, বাতিটা নেভানো হয়েছে।

"তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি," আমার কানের কাছে লর্ড লিনচমেয়ারের গলা শোনা গেল। আমি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠলাম, তিনি তখনও আমার হাত ধরে টানছেন।

"ওদিকে—ওদিকে-- " তিনি চাপা স্বরে বলেই আমাকে টেনে ঘরের এক কোণায় নিয়ে গেলেন, "চুপ! শুনুন- "

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, বাইরের করিডোর দিয়ে কে যেন আসছে। খুব নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছে। প্রতিটি পদক্ষেপের পরই একটু বিরতি—তারপর আবার, যেন কোন লোক পা ফেলছে খুব মেপে মেপে –যেন কেউ জানতে না পারে। মাঝে মাঝে একএকটা পদক্ষেপের পরে প্রায় আধমিনিটখানেক নৈঃশব্দ্য, তারপর খসখস আওয়াজ। আমার সঙ্গী উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন। যে হাত দিয়ে তিনি আমার হাত খামচে ধরেছিলেন, তা এত কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল যেন ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশপাতা থরথর করে কাঁপছে।

"কে আসছে?" আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম।

"উনি।"

"স্যার টমাস?"

"হ্যাঁ।"

"কী ব্যাপার?"

"চুপ। আমি না বলা পর্যন্ত কিচ্ছু করবেন না। চুপচাপ থাকুন।"

তখনই বুঝতে পারলাম, দরজা দিয়ে কেউ ঢোকবার চেষ্টা করছে। একেবারে আস্তে খুট করে দরজার হাতলটা ঘোরানোর শব্দ হল আর অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম একটা ছায়ামূর্তিকে। বাইরে দূরে কোথাও একটা আলো জ্বলছিল। সেটা আমাদের অন্ধকার ঘর থেকে বাইরেটা দেখতে পাবার পক্ষে যথেষ্ট। ধূসর ছায়ামূর্তিটা ক্রমেই এগিয়ে আসছিল , খুব ধীরে ধীরে—খুব নিঃশব্দে। অবশেষে একটা মানুষের পরিষ্কার অবয়ব বোঝা গেল। গুঁড়ি মেরে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছিল সে। ধীরে ধীরে দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেল আর তার মাঝখানে দেখতে পেলাম সেই অশুভ মূর্তিটাকে। তখনই হামাগুড়ি দেয়া মূর্তিটা ছিলে- ছেঁড়া ধনুকের মত ঘরে ঢুকে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খাটের ওপর আর দমাস- দমাস- দমাস—তিনটে ভয়ানক আওয়াজ ভেসে এল খাট থেকে। যেন কোন ভারী জিনিস দিয়ে প্রচন্ডভাবে ঘা দেয়া হল খাটের ওপর।

আমি পুরো ঘটনাটার আকস্মিকতায় এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে নড়াচড়া করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার সঙ্গীর প্রচন্ড চিৎকারে সম্বিৎ ফিরে এল। খোলা দরজা দিয়ে আসা সামান্য আলোতে দেখতে পেলাম, ছোট্টখাট্টো লর্ড লিনচমেয়ার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর ভগ্নীপতির ওপর, হাত দিয়ে তাঁর গলা পাকড়ে পেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন তাঁকে। লম্বা, রোগা চেহারার স্যার টমাস ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু লর্ড লিনচমেয়ারও প্রাণপণে পেছন থেকে জাপটে ধরেছিলেন তাঁকে, যদিও তাঁর চিল- চিৎকারে বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁর দম ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। কারণ, লড়াইটা হচ্ছিল অসম। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর ওপর আর দুজনে মিলে কোনক্রমে স্যার টমাসকে মাটিতে পেড়ে ফেললাম। যদিও তার মধ্যেই স্যার টমাস দাঁত বসিয়ে দিয়েছেন আমার কাঁধে। তিনি যেভাবে হাত পা ছুঁড়ছিলেন, তাতে আমার শরীরে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল তাঁকে বশে আনতে। অবশেষে তাঁর পরনের ড্রেসিং গাউনের দড়ি দিয়েই তাঁর হাতদুটো বেঁধে ফেলা হল। পরে আমি তাঁর পা দুটো জাপটে ধরলাম। এর মধ্যেই লর্ড লিনচমেয়ার বাতিটা জ্বালাবার চেষ্টা করছিলেন। আর তখনই শুনতে পেলাম, বাইরে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। পরক্ষণেই ঘরে প্রবেশ করল বেয়ারা আর দুজন চাপরাশি। চিৎকারের চোটে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওদের। এবার আর বন্দিকে আয়ত্বে আনতে কোন অসুবিধে হল না। মেঝেতে শুয়ে রাগে ফুঁসছিলেন তিনি। জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন আমাদের দিকে। তাঁর মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছিল যে কি সাংঘাতিক বিপজ্জনক একজন মানসিক রোগী তিনি এবং খাটের ওপর রাখা ছোট হাতুড়িটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে কী ভয়ংকর এক খুনি মানসিকতা কাজ করছে তাঁর মধ্যে।

“ব্যস ব্যস আর কিছু করার দরকার নেই,” লর্ড লিনচমেয়ার যখন বললেন, আমরা তখন ছটফট করতে থাকা মানুষটাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। একটু পরেই উনি ঝিমিয়ে পড়বেন, এমনকি অচৈতন্য হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়, এবং আমার ধারণা সেই সময় তখন হয়ে এসেছে। লর্ড লিনচমেয়ার যখন কথা বলছিলেন, স্যার টমাসের ছটফটানি ততক্ষণে কমে আসছিল, এবং মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষটার মাথা আচমকা ঝুলে পড়ল তাঁর বুকের ওপর, যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আমরা তাঁকে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলাম। নিস্পন্দ হয়ে গেছিলেন মানুষটা। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস পড়ছিল তাঁর।

“তোমাদের মধ্যে দুজন ওঁকে পাহারা দাও,” লর্ড লিনচমেয়ার বললেন, “আর ড: হ্যামিলটন, আপনি যদি আমার ঘরে আসেন তাহলে গোটা ঘটনাটা খুলে বলতে পারি। পারিবারিক কেলেংকারির ভয়ে যে ঘটনা এতক্ষণ আপনাকে জানাতে পারিনি। আজকের রাতটায় আপনি যা করেছেন, তার জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।”

তাঁর ঘরে গিয়ে মুখোমুখি বসবার পর তিনি বললেন, “পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বলছি। আমার হতভাগ্য ভগ্নীপতিটি বিশ্বের অন্যতম সেরা পতঙ্গবিদ, স্বামী হিসেবে চমৎকার মানুষ এবং একজন স্নেহময় পিতা। কিন্তু তিনি এমন এক বংশের মানুষ, যে বংশধারায় পাগলামির বীজ লুকিয়ে আছে। এর আগে একাধিকবার তাঁর মধ্যে নরহত্যার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, আর যেটা সবচেয়ে বেদনাদায়ক তা হল, তিনি তাদেরই আক্রমণ করেন যাঁদের তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন। তাঁর ছেলেকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যই বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমার বোন, তাঁর স্ত্রী কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছে, জখম অবস্থায় পালিয়ে গেছে লন্ডনে, সে ক্ষতচিহ্নটি আপনি হয়ত লক্ষ করে থাকবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি যখন সুস্থ থাকেন তখন এসব কথা কিছুই মনে রাখতে পারেন না, এমনকি এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলতে গেলে তিনি সেটা হেসেই উড়িয়ে দেন, কারণ তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে যাদের তিনি এত ভালোবাসেন তাদের তিনি কোন আঘাত করতে পারেন। আপনি নিশ্চয় জানেন যে এটা এক বিশেষ ধরণের রোগের লক্ষণ, যে রোগে রোগীদের বোঝানোটাই খুব মুশকিল হয়ে পড়ে যে তাঁরা এ কাজ করতে পারেন।”

“আমাদের লক্ষ ছিল একটাই যে তাঁর হাত যেন আর রক্তরঞ্জিত না হয়। কিন্তু তাতে অসুবিধে ছিল। উনি একা থাকতেই ভালোবাসেন বেশি, আর কখনো ডাক্তার দেখাতে চান না। অথচ তিনি যে একজন মানসিক রোগী সে কথা প্রমাণ করবার জন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শ খুব জরুরি। সাধারণ সময়ে উনি কিন্তু আমার- আপনার মতই সুস্থ মানুষ, খুব কদাচিৎ তাঁর এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবার সম্ভাবনা থাকে তখনই তাঁর মধ্যে কিছু কিছু লক্ষণ পরিষ্কার ফুটে ওঠে যেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকেত হয়ে দাঁড়ায় অন্যের পক্ষে। জানান দেয় যে নিজেদের রক্ষা করবার সময় এসে গেছে। এর মধ্যে প্রধান লক্ষণটাই হল কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠা আর লাফানো। সাধারণত রোগের আক্রমণের তিন থেকে চারদিন আগে থেকেই এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়। এবার যেদিন এটা দেখা দিয়েছিল, সেদিনই তাঁর স্ত্রী সোজা লন্ডনে ব্রুক স্ট্রিটে আমার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

“এখন, স্যার টমাসের এই পাগলামির রোগটা প্রমাণ করবার জন্য একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমার কাছে জরুরি ছিল। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যখন তিনি সুস্থ, তখন এটা প্রমাণ করা মুশকিল। তিনি গুবরে পোকা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, আর এই বিষয়ে আগ্রহী কোনও ব্যক্তিকে তিনি খুব পছন্দ করেন এটা আমার মাথায় ছিল। সেইজন্যেই আমি ওইরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা কাগজে দিয়েছিলাম এবং আমার সৌভাগ্য যে আপনার মতন একজন লোককে আমি খুঁজে বের করতে পেরেছি। একজন শক্তিশালী মানুষ

এক্ষেত্রে জরুরি ছিল, কারণ যে বিপদের ঝুঁকিটা আমি নিয়েছিলাম, তাতে আমার মৃত্যুও হতে পারত। কারণ আমি জানতাম যে সম্ভবত উনি আমাকেই হত্যা করতে চাইবেন, কেন না সুস্থ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। বাকিটা আশা করি আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি অবশ্য বুঝতে পারিনি যে আজ রাতেই আমার ওপর আক্রমণ হবে। তবে তার সম্ভাবনা একটা ছিলই। এর আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রমণগুলো হয়েছিল খুব ভোরের দিকে। আমি খুব ভিতু মানুষ। কিন্তু এ ঝুঁকিটা আমায় নিতেই হয়েছিল। কারণ, এছাড়া আমার বোনকে আর বাঁচাবার কোন পথ ছিল না। এবার আপনি ঠিক করুন, ওঁর পাগলামির সপক্ষে কোন সার্টিফিকেট আপনি দেবেন কি না।"

"এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠবে না লর্ড লিনচমেয়ার, কিন্তু দুজন ডাক্তারের সই এখানে জরুরি," আমি বললাম।

মৃদু হেসে লর্ড লিনচমেয়ার বললেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমারও একটা ডাক্তারি ডিগ্রি আছে। আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এনে রেখেছি। কাজেই আপনি এখনই লেখালেখিগুলো করে সইসাবুদ করে দিলে কাল সকালের মধ্যেই রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো যাবে।"

বন্ধুগণ, এই হল আমার বিখ্যাত গুবরে পোকা শিকারী স্যার টমাস রোজিস্টারের সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্প। আর সাফল্যের প্রথম সোপান হিসেবে এটাই আমাকে বিখ্যাত করে দিল। লেডি রোজিস্টার আর লর্ড লিনচমেয়ারের সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কোনও দিনও তাঁরা আমার আমার সাহায্যের কথা ভুলতে পারেন নি। স্যার টমাসও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু যদি কোনওদিন আবার আমাকে ওই ডেলামেয়ার কোর্টে রাত্রিবাস করতে হয় তাহলে আমি অবশ্যই ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখব।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের "দা বিটল্ হান্টার" অবলম্বনে।

ছবিঃ শিমুল

suchipotro

শিশির বিশ্বাস

পাহাড়ের চোখ

অফিসের কাজে কাঞ্চিপুরম যাচ্ছিলাম। এদিকের ট্রেনে সারা বছরই ভিড় খুব বেশি। সেদিন কিন্তু মামবালম থেকে উঠে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কামরায় যাত্রী বলতে মাত্র আর একজন। লালমুখো এক ইউরোপিয়ান।

এক সময় সাহেবদের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখকরা জাঁদরেল বিশেষণটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই জুড়ে দিতেন। একালে সে- সব সাহেবদের দেখা প্রায় আর মেলেই না। তবু গোড়ায় ভদ্রলোককে কিছুটা ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়েছিল। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। কপালে ভাঁজ পড়েছে গোটা কয়েক। নিখুঁত পোশাক পরিচ্ছদ। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। চোখে গাঢ় রঙের সানগ্লাস। হাতে মোটাসোটা একটা বই নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছেন। আমার পায়ের শব্দে সামান্য মাথা তুলেই ফের বইয়ের ভিতর ডুবে গেলেন। ট্রেনে উঠে একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই আমার ঘুম পায়। বোধহয় দু- তিনটের

বেশি স্টেশন পেরোয়নি, জানলার ধারে বসে যথারীতি ঢুলতে শুরু করেছি। হঠাৎ ছোট্ট একটা ঝাঁকুনিতে চোখ মেলে দেখি, ভদ্রলোক কখন জায়গা বদল করে আমার উল্টো দিকে এসে বসেছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে একটু উসখুস করে হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এলেন। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সামান্য ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, "হ্যালো মিস্টার, তুমি কি হিন্দু? আই মিন তুমি কি দেবদেবীর মন্দিরে যাও?"

হঠাৎ ঐ অদ্ভুত প্রশ্নে গোড়ায় একটু অবাক হলেও সাহেবের হাতের সেই বইটির দিকে নজর পড়তে বোঝা গেল ব্যাপারটা। বইটির নাম 'টেম্পলস অব সাউথ ইন্ডিয়া'। সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক ট্যুরিস্ট। কিংবা ভারতের মন্দির নিয়ে গবেষণা করতে এদেশে এসেছেন। সামান্য মাথা দুলিয়ে ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরটা জানিয়ে দিলাম।

"কত মন্দিরে গিয়েছ তুমি? অনেক? থাউজ্যান্ড? ল্যাখ?"

গাঢ় সানগ্লাসের আড়ালে চোখের তারা অদৃশ্য। কিন্তু গলার স্বর, মুখের ভাঁজেই বোঝা যাচ্ছিল কি ভীষণ উৎকন্ঠা নিয়ে উত্তরটা জানতে চাইছেন মানুষটি। সামান্য হেসে বললাম, "না অত নয়। তবে সাউথ ইন্ডিয়ার অনেক মন্দিরেই আমি গেছি।"

ভদ্রলোক আরো ঝুঁকে পড়ে বললেন, "মিস্টার, তুমি এমন কোন মন্দির দেখেছ, যেখানে দেবমূর্তির একটা মাত্র চোখ?"

গোড়ায় প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারিনি। মাথা নাড়লাম, "না না, তেমন কোন মন্দিরে আমি যাইনি। তা ছাড়া, এক চোখের কোন দেবদেবী হিন্দুশাস্ত্রে আছে বলেও আমার জানা নেই।"

"না না, তা নয়," মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, "আমি সে কথা বলছি না। মানে এমন কোন দেবদেবীর মূর্তি, যার একটা চোখ খোয়া গেছে। আই মিন চুরি।"

আমি মাথা নাড়লাম।

একটু যেন নিরাশ হলেন উনি, "ভাল করে মনে করে দেখ তো! মন্দির ছাড়া অন্য কোথায়, কোনও মিউজিয়াম, কিউরিও শপ, অথবা কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আই মিন, পুরোনো দিনের অনেক দেবদেবীর মূর্তিও তো এখন আর মন্দিরে নেই।"

বলা বাহুল্য, তেমন কোনও দেবমূর্তির খোঁজ আমার জানা ছিল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম না। ইতিমধ্যে মনের ভিতর সামান্য কৌতূহল উঁকি মারতে শুরু করেছে। বললাম, "হঠাৎ এমন এক দেবমূর্তির খোঁজ করছেন কেন?"

"হঠাৎ নয় মিস্টার। আজ প্রায় দেড় বছর হল এদেশে এসেছি ওই দেবমূর্তির খোঁজে। প্রায় চষে ফেলেছি সারা ভারতবর্ষ।"

হেসে বললাম, "ওই রকম এক দেবমূর্তি যে এদেশে থাকতে পারে, তা কী করে ভাবলেন আপনি?"

"আমি জানি, এমন এক দেবমূর্তি সত্যিই রয়েছে। আর তার খোঁজ যে করেই হোক পেতেই হবে আমাকে।"

থামলেন উনি। সানগ্লাসের আড়ালে সম্ভবত আমার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন, "তুমি তো হিন্দু। দেবতার অভিশাপে বিশ্বাস করো?"

চট করে কোনও উত্তর জোগাল না। অবশ্য সে জন্য উনি অপেক্ষাও করলেন না। বললেন, "লিসবনের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ওই বিশেষ দেবমূর্তি গত দেড় বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।"

অবাক হয়ে বললাম, "হিন্দু দেবতার অভিশাপ লিসবনের এক ইউরোপিয়ান পরিবারের উপর তো পড়ার কথা নয়। অবশ্য যদি ওরা হিন্দু হয় তো আলাদা কথা।"

"নো মিস্টার। লিসবনের বেনডিক্ট ডি-সুজার পরিবার গোঁড়া ক্যাথলিক। তবুও গত তিনশো বছর ধরে এক হিন্দু দেবতার অভিশাপ ডি-সুজা পরিবারকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আজ আট পুরুষ পরে এসেও রেহাই মেলেনি। ভাবতে পারো?"

শুরু থেকেই মানুষটির কথাবার্তা কেমন প্রলাপের মতো। এখন আর কোনও সন্দেহই রইল না যে, সাহেবের মাথাটাই গেছে। তবু গল্পের গন্ধে সামান্য উসকে দেবার জন্যই বললাম, "তা ডি-সুজা পরিবার কী এমন অপরাধ করেছিলেন যে, আট পুরুষ পরেও তাঁদের উপর অভিশাপের খাঁড়া ঝুলছে?"

কাজ হল। সামান্য ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন, "ইয়েস মিস্টার, অপরাধ করেছিলেন বেনডিক্ট ডি-সুজার এক পূর্বপুরুষ। গোঁড়া ক্যাথলিক ম্যানুয়েল ডি-সুজা অবশ্য ব্যাপারটাকে আদৌ অপরাধ বলে ভাবেন নি। সে সব তিনশো বছর আগের কথা। কোম্পানির আমলের একেবারে গোড়ার দিক। ইংরেজ আর ডাচদের পাশাপাশি পোর্তুগিজরাও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা মানে লুঠতরাজ। অবশ্য আগের মতো রমরমা আর নেই। তবু মোটামুটি চলছে। ম্যানুয়েল ডি-সুজা এই সময়েই ভারতে আসেন।"

এই পর্যন্ত বলে সামান্য থাকলেন ভদ্রলোক। মনে হল, সানগ্লাসের আড়ালে একবার দেখে নিলেন আমাকে। বোধ হয় বুঝে নিতে চাইলেন গল্পটা আদৌ শুনছি কিনা। তারপর ফের শুরু করলেন, "ম্যানুয়েল ডি-সুজা এদেশে এসেছিলেন জাহাজের সামান্য এক খালাসি হয়ে। কতই বা মাইনে! প্রতি মাসে পাঁচ কি সাত ক্রুসাডো। প্রতি ক্রুসাডোর বাজার দর সেকালে আড়াই শিলিং–এর বেশি হত না। এই সামান্য মাইনের জন্য কেউ কি আর দেশ ছেড়ে এত দূরে আসে! সুতরাং বুঝতেই পারছ, সকলের আসল লক্ষ্য ছিল উপরি পাওনা, অর্থাৎ লুঠতরাজ। যেখানে সেটা সম্ভব নয়, সেখানে চুরিতেও এরা পিছপা হত না।

"ম্যানুয়েল ডি-সুজাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। বছর আড়াই এদেশে ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সব মিলিয়ে প্রচুর রোজগার করে ফেলেছিলেন। ম্যানুয়েল এই সময়েই এখানে এক মন্দিরের খোঁজ পান। সেখানে পাথরের দেবমূর্তির চোখে নাকি দুটো হিরে বসানো। খবরটা কানে আসতেই মনস্থির করতে আর দেরি করেন নি। দলবলসহ মন্দির লুঠ খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না হয়তো। কিন্তু সে ক্ষেত্রে হিরে দুটো চলে যেত

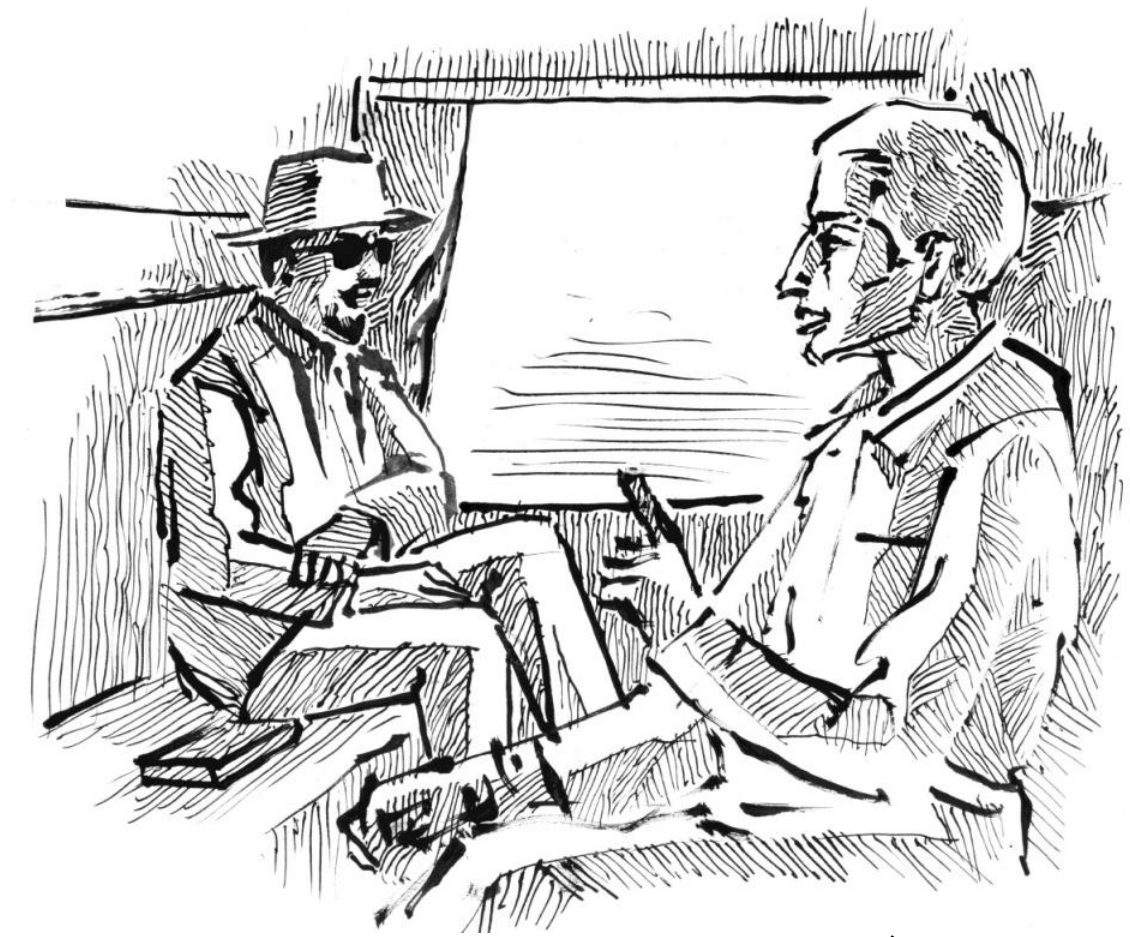

ক্যাপ্টেনের হেফাজতে। সুতরাং, হিরে দুটো তিনি চুরি করবেন ঠিক করলেন। দিন কয়েকের মধ্যে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে এক রাত্তিরে হানা দিলেন সেই মন্দিরে। পুরোহিতসহ মন্দিরের জনা কয়েক স্থায়ী বাসিন্দা পাশের একটি ঘরে বাস করত। জনা কয়েক প্রহরী শুধু রাত কাটাত মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে। ম্যানুয়েল খবর নিয়ে জেনেছিলেন, এদের কেউই রাতে তেমন জেগে থাকে না। রাত কিছু বাড়লেই একে একে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। সুতরাং তেমন সমস্যা হয় নি। নাটমন্দিরের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘুমন্ত প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে খুব সহজেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। ভিতরে সিংহাসনের উপর দেবমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছে। আবছা আলো-আঁধারি পরিবেশ। সেই স্বল্প আলোয় জ্বলজ্বল করছে দেবমূর্তির চোখের হিরে দুটো। ম্যানুয়েল এরপর সময় নষ্ট করেন নি। সঙ্গে কয়েকরকম লোহার ফলা, উকো ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেবমূর্তির উপর। প্রায় পায়রার ডিমের আকারের বাঁ চোখের পাথরটা খুলে ফেলেছিলেন সামান্য চেষ্টাতেই। গন্ডগোলটা হল এর পর। তড়িঘড়ি করার জন্যই হোক, বা অন্য কোনও কারণে হঠাৎ পায়ে লেগে পুজোর কোনও পাত্র আচমকা ঝনঝন করে উল্টে যেতে প্রহরীরা জেগে উঠে হইচই শুরু করে দিল। দেবমূর্তির দ্বিতীয় চোখ ম্যানুয়েল তখন সবে ছুরি দিয়ে খোঁচাতে শুরু করেছেন।

কিন্তু বেগতিক দেখে সেটার আশা ত্যাগ করেই পালাতে হল। ব্যাপারটা দলের কাউকেই আর বলেননি তিনি। পাথরটা লুকিয়ে রেখেছিলেন জাহাজের এক গোপন জায়গায়।

এর মাস কয়েক বাদে দেশে ফিরে লুঠের জিনিসপত্র বেচে ম্যানুয়েল ছোটোখাটো একটা জমিদারি কিনে ফেললেন। তবে মন্দির থেকে চুরি করা সেই পাথরটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি নিরাশ করেছিল। এক জহুরিকে দিয়ে যাচাই করাতে গিয়ে জানতে পারলেন, সেটা হিরে নয়। ভাল জাতের জারকন। বাজারদর সামান্যই। পাথরটা তাই আর বিক্রি করেন নি। যে জিনিসের জন্য প্রায় প্রাণ যেতে বসেছিল, তা অত সস্তায় বিক্রি করতে আর মন চায়নি। রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছেই।

"ডি- সুজা পরিবারে অঘটন শুরু হল এর পর থেকেই। অঘটন কেন, একরকম বিপর্যয়ই বলা যায়। বছর কয়েক বাদে ম্যানুয়েলের একমাত্র পুত্র অ্যান্টনির জন্মের পর দেখা গেল নবজাতকের বাঁ চোখের আইবলটি নেই। সাধারণত এমনটি দেখা যায় না। অন্ধ হয়ে অনেকেই জন্মায়। কিন্তু আইবলহীন অবস্থায় জন্ম, এমন বড়ো একটা শোনা যায় না। তবু এটাকে নিছক অ্যাকসিডেন্ট বলেই মেনে নিয়েছিল সবাই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। এর অনেক বছর বাদে অ্যান্টনির একমাত্র পুত্র ফ্রান্সিসের জন্মের পর দেখা গেল তারও বাঁ চোখের আইবল নেই। ব্যাপারটাকে এবার আর নিছক কাকতালীয় বলে মেনে নিতে পারলেন না ম্যানুয়েল। তখন বয়স হয়েছে। দেহ- মনে আগের তেজ আর নেই। এক অজানা আশঙ্কায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। ছেলেকে একান্তে ডেকে একদিন সেই পাথরটার কথা খুলে বললেন।

"অ্যান্টনি ছেলেবেলা থেকেই একটু অন্য রকমের। নিয়মিত চার্চে যায়। ধর্মভীরু মানুষ। বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর দেখতে চাইল সেটা। সিন্দুকের এক কোণে অযত্নে পড়ে ছিল পাথরটা। খুঁজেপেতে বের করল ম্যানুয়েল। পাথরটা হাতে নিয়ে অ্যান্টনি উল্টে- পাল্টে দেখল খানিক। তারপর এক সময় বিষন্ন গলায় বলল, "পাথরটার কথা তুমি আগে কেন বলো নি বাবা?"

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন ম্যানুয়েল, "কেন রে?"

প্রত্যুত্তরে একটু বিষণ্ন হাসল অ্যান্টনি। তারপর হঠাৎ এমন এক অদ্ভুত কাজ করে বসল, যা ম্যানুয়েল স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

এই ঘটনার পর ম্যানুয়েল আর বেশিদিন বাঁচেন নি। মরবার আগে বেচারা জেনে গিয়েছিলেন, ওঁদের বংশে কেউ আর বাঁ চোখ নিয়ে জন্মাবে না।

ম্যানুয়েল মরে বাঁচল। ডি- সুজা পরিবারের পরবর্তী অবস্থা তাঁকে আর চোখে দেখে যেতে হয়নি। সেটা দেখল অ্যান্টনি। ওর ছেলে ফ্রান্সিসের কর্মক্ষম ডান- চোখটাও অন্ধ হয়ে গেল যৌবন পার হবার আগেই। আর পরবর্তী কয়েক জেনারেশন ধরে ডি- সুজা পরিবারে চলছে ওই একই ব্যাপার। পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী বেনডিক্ট- এর দুই চোখই আজ অন্ধ। বিয়ে করেনি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, দেবমূর্তির বাঁ চোখের সেই পাথরটা যথাস্থানে ফিরিয়ে না দিলে বংশের কেউ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না। মিস্টার, পাথরটা

আমি সঙ্গে এনেছি। গত দেড় বছর ধরে এ দেশের পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই দেবমূর্তির খোঁজ এখনও পাইনি।"

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন ভদ্রলোক। হাতের ঘড়ির দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "চিঙ্গলপুট বোধ হয় এসে গেল। তাই না?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সময় অনুযায়ী গাড়ি চিঙ্গলপুট স্টেশনেই ঢুকতে চলেছে। গল্পের ঝোঁকে কোথা দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। মাথা নাড়লাম। উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমি চিঙ্গলপুটেই নামব। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। সামান্য নীচু হয়ে সিটে নামিয়ে রাখা বইটা তুলে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, হঠাৎ কোন কারণে ট্রেন আচমকা ব্রেক কষল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কোন রকমে টাল সামলে নিলেও চোখ থেকে সানগ্লাসটা ছিটকে আমার কোলে এসে পড়ল। সেই সঙ্গে আরও কিছু ঠং করে ছিটকে পড়ল মেঝেয়।

ওঃ –গড। চাপা আর্তনাদে মানুষটি মূহুর্তে ঝুঁকে পড়লেন মেঝের উপর। অন্ধের মত হাতড়ে কিছু খুঁজতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি কোলের উপর থেকে সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে বললাম, ওখানে কী খুঁজছেন। এই তো আপনার সানগ্লাস।

ডানহাত দিয়ে সেইভাবেই হাতড়াতে হাতড়াতে মুখ তুললেন উনি। বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। সানগ্লাসটা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের উপর দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠলাম। মানুষটি সম্পূর্ণ অন্ধ। বাঁ চোখে বিশাল একটা গর্ত। কোনও আইবল নেই। ডান চোখের মণি সাদা। সম্পূর্ণ ছানিপড়া। অথচ খানিক আগেই এঁকে বই পড়তে দেখেছি। এতক্ষণ যে কথা বললেন, একবারও মনে হয়নি উনি অন্ধ।

হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে উনি হাতড়ে আমার হাত থেকে সানগ্লাসটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে ফের মেঝের উপর ঝুঁকে দু'হাতে হাতড়াতে শুরু করেছেন। অস্ফুট স্বরে বললাম, "আপনি, আপনি আপনার বাঁ চোখের পাথরটা খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ –হ্যাঁ ম্যান। তুমি কি পেয়েছ ওটা? প্লিজ দাও?"

ততক্ষণে পাথরটা আমার নজরে পড়েছে। বললাম, "ওটা আপনার ডানদিকে মেঝেতে পড়ে রয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে।"

তৎক্ষণাৎ উনি ডানদিকে ঘুরে গিয়ে পাগলের মত দেয়ালের দিকের মেঝে দু'হাতে প্রায় সাপটাতে শুরু করলেন। তবু পায়রার ডিমের আকারের উজ্জ্বল পাথরটার উপর মানুষটির হাত কিছুতেই আর পৌঁছোচ্ছিল না। একবার মনে হল, তুলে ওর হাতে দিই। কিন্তু জিনিসটাকে হাতে নেবার কথা ভাবতে অজান্তেই শিউরে উঠল শরীর। ঠায় বসে রইলাম।

ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত অবশ্য খুঁজে পেলেন পাথরটি। পরম মমতায় রুমালে মুছলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখের সানগ্লাস সামান্য তুলে পুরে দিলেন বাঁ-চোখের ভিতর।

ট্রেন ইতিমধ্যে চিঙ্গলপুট স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। গতি কমে আসছে। উঠে দাঁড়ালেন উনি। মেঝে থেকে বইটা তুলে নিয়ে সামান্য হাসলেন, "চলি মিস্টার।" হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। প্রত্যুত্তরে আমিও হাত বাড়ালাম। ট্রেনটা ততক্ষণে থেমে গেছে। করমর্দন করে নেমে গেলেন তিনি।

ডি-সুজা পরিবারের বর্তমান পুরুষ বেনডিক্ট ডি-সুজার সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। জানি না, শেষ পর্যন্ত উনি সেই দেবমূর্তিটি খুঁজে পেয়েছেন কিনা। আর পেলেও, পাথরটি কি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন?

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

suchipotro

বিকেলবেলায়

সংহিতা মুখোপাধ্যায়

বিকেলবেলাটা বেশ মজাদার লাগে টিপুর। কেমন দিনটা আস্তে আস্তে নিভে আসে আর আকাশটা একটা হালকা কালচে রঙা ওড়না জড়ায় যেন। কালো লেপটা জড়িয়ে ঘুটঘুটে রাত দেখানোর আগে তার আভাস দেয় যেন। যেমন মিনি পিসি তাল ঠুকে তেড়েফুঁড়ে আআআআআ করে গলা ছেড়ে গান গাওয়ার আগে অনেকক্ষণ ইনিয়ে বিনিয়ে বিনবিনে তান ধরে।

খেলার মাঠে বিকেলবেলা কেউ নেই আজ। পরীক্ষা শুরু হয়েছে যে। সবাই হয় ঘুমোবে এখন, নয়তো পড়বে। টিপুর সারা বছর একই রুটিন। পরীক্ষার সময়েও তার মাঠে আসার ছুটি নেই। কারণ খেলা না হলে সে বিকেলটা দেখবে আর রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলে ওঠার আগেই বাড়ি ফিরে যাবে।

হাতে থিবামেচো কমিক সিরিসের নতুন বইটাও ছিলো। টিপু পা ঝুলিয়ে বসল মাঠের ধারের লোহার বেঞ্চে। একটা কাক আরেকটা কাকের পালকের পোকা বেছে দিচ্ছে। দুটো ফড়িং কুস্তি করছে। টিপুর একটা বড়ো হাই উঠল। তাই টিপু বইটা খুলল। অমনি তার বাঁ কাঁধে কে যেন টোকা দিল। টিপু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা থিবামেচো তার পাশে বসে ঝলমলাচ্ছে। টিপু "হাই" বলে হাসল। থিবামেচোটা বলল, "নিভি।" টিপু বুঝল থিবামেচোটা ওর কথা বুঝতে পেরেছে। ওদের ভাষায় "হাই" মানে "ভিনি"; তার উত্তরে বলতে হয় "নিভি"। টিপু জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম?" সে উত্তর দিল, "জেকোদেপো।" টিপু প্রমাদ গুণল, নাম না টাং- ট্যুইস্টার! কী করে ডাকবে আস্ত একটা মানুষকে এই নামে! কিন্তু এটাও ঠিক নামটা এক থিবামেচোর, মানুষের নয়। তবু টিপু হাত বাড়িয়ে দিয়ে শেকহ্যান্ড করতে করতে নিজের নামটা বলল, "অরিত্রাস মুখোপাধ্যায়, তবে তুমি আমাকে 'টিপু' বলেও ডাকতে পারো।" জেকোদেপোর মুখ দেখে বোঝা গেল যে ও খুব বিরক্ত হয়েছে। বলল, "এই তোমাদের মুশকিল। একটা লোকের এত্তোগুলো নাম আর একই নামে অত্তগুলো লোক।" কথাটা ঠিকই। টিপুদের ক্লাসে টিপু হলো অরিত্রাস তিন।

আরও চারটে অরিত্রাস নামের ছেলে তাদের ক্লাসেই পড়ে। তবে জেকোদেপোর ওপর ওর একটু রাগও হলো। যেমন হয় ওদের ক্লাসের কল্পজিতের ওপর।

কল্পজিৎ ক্লাসে কখনও সখনও ফার্স্ট হয়। তাই অহঙ্কারে মাটিতে তার পা- ই পড়ে না। সে সারাক্ষণ গলা ফাটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সে নিজে যা করে না সে সব কিছুই করা খারাপ। যেমন সে বোঝাবার চেষ্টা করে যে ডাংগুলি খেলা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। যারা সেটা খেলে তারা জঘন্য ছেলে। সে তর্ক করে যে কুলফি খাওয়া খারাপ। তাতে দাঁত আর গলা দুইই খারাপ হয়ে যায়। কারণ সে নিজে ডাংগুলি খেলতে পারে না। আর কুলফি খেলে ওর গলা বন্ধ হয়ে যায়। জেকোদেপোরও তাই। ওদের নাম মানুষের নামের মতো হয় না। তাই মানুষের নামটা খারাপ হয়ে গেল ওর কাছে। টিপুরও তো ওর নামটা উদ্ভট লাগছে। টিপু কি ওকে বলেছে সে কথা? নাকি ওর নামটা টিপুর বিচ্ছিরি লেগেছে?

জেকোদেপো বলল, "তুমি যে দুঃখ পেলে দেখছি! আমি তো নিন্দে করি নি। সত্যি কথাটা অধৈর্য হয়ে বলে ফেলেছি মাত্র। তো আমরা কথা বলতে বলতে একটু আধটু অধৈর্য হয়ে যাই বটে।" টিপু বলল, "না দুঃখ পাই নি। তবে এটাও ঠিক কথা আমি জানিও না তোমাদের নামগুলো আমাদের নামের থেকে ঠিক কী রকম আলাদা।" জেকোদেপো খুব উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে লাগল, "আমাদের একটা থিবামেচোর একটাই নাম হয়। সেই নামটা আর কারুর হয় না। নাম বললেই বোঝা যায় আমার বাবা কে, মামা কে, পিসে কে।" টিপু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আর মা, মাসি, পিসিদের নাম?" জেকোদেপো উত্তর দিল, "হয় না। মা, মাসি, পিসিই তো হয় না।" টিপু বলল, "মানে?" জেকোদেপো বুঝিয়ে বলল, "আমাদের শুধু বাবা, মামা আর পিসে হয়। মা, মাসি, পিসি হয় না। মেসোও হয় না।" টিপু তাতেও কিছু বুঝল না। তখন জেকোদেপো বলল, "যেমন আমার বাবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের গাঁট থেকে আমার জন্ম, তেমন আমার পিসে জন্মেছে আমার বাবার ডান পায়ের গোড়ালি থেকে; আর আমার মামা জন্মেছে বাবার শিড়দাঁড়ার গাঁট থেকে। পিসের নাম জেহাঙোলে আর আমার মামার নাম জেভাখুশে।" টিপুর চোখ চকচক করে উঠল, বলল, "তার মানে তোমার বাবার নাম 'জে', তাই তো?" জেকোদেপো হাসল হো-হো করে। তারপর বলল, "মানুষগুলোর এই দোষ। একবার কী শিখেছে দুয়ে দুয়ে চার হয়, অমনি সব কিছুর মধ্যে সেই নিয়ম খাটাবে। আর নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে খুশি হবে।"

টিপুর চুপসে যাওয়া মুখটা দেখে বলল, "না গো, আমার বাবার নাম 'জে' নয়, 'ফিগোরাজে'; আর তার বাবার নাম, 'এঞাষোবেফি'; তার বাবার নাম 'ছোমেসিঞা'; তার বাবার নাম- " টিপু মাঝপথে থামিয়ে দিল জেকোদেপোকে। ওর কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল নামগুলো শুনে। তাই বলল, "অন্য কিছু বলো।" জেকোদেপো বলল, "অন্য কী বলব? কী বলা যায় তোমাকে?" ভয়ানক দ্বিধায় পড়ে সে নখ দিয়ে দাঁত চুলকে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলল। অবস্থা সামাল দিতে টিপু বলল, "তোমাদের জাতীয় সঙ্গীতটা না হয় গেয়ে শোনাও।"

শুনে জেকোদেপোর বেগুনীরঙা গা ফ্যাকাসে হয়ে ছাইরঙা হয়ে গেল। ভাঙা খনখনে গলায় সে বলল, "সঙ্গীত মানে যেগুলো সুর করে গাওয়া পদ্য তো?" টিপু দেখল ব্যাটাকে কায়দা করা গেছে। তাই ও ঘটঘট করে ঘাড় নাড়ল। হাঁ- হাঁ করে উঠল জেকোদেপো, "না না সেসব হয় না

আমাদের দেশে।" টিপু বলল, "কী রকম?" জেকোদেপো ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ওরে বাবারে, পদ্য বললেই আমাকে গায়েব করে দেবে!" টিপু বলল, "কে গায়েব করে দেবে পদ্য বললে?" জেকোদেপো বলল, "ওরে বাবা, রাজার পেয়াদা।" টিপু ছাতি ফুলিয়ে বলল, "আমাদের দেশে সবাই পদ্য বলতে পারে, গান গাইতে পারে। তুমিও পারবে। গাও না!" জেকোদেপোর কাঁপুনি তখনও বন্ধ হয় নি। গলাটা আরও কেমন খনখনে হয়ে গেছে। তবু বলল, " না হে, আমাদের দেশে নিয়ম নেই। নিয়ম ভাঙলেই দেবে গায়েব করে, আর ফিরতে পারব না....." টিপু বলল, "তোমাদের দেশের আইন এখানে লাগবে না। এটা আমাদের দেশ।" জেকোদেপো বলল, "না হে, আমরা যেখানে যাই সেখানে আমাদের সঙ্গে আমাদের আইন যায়। আসলে আমাদের সঙ্গে তো আমাদের দেশটাও যায়।" টিপু বলল, "সে আবার কী?" জেকোদেপো শুধু ঘাড় নাড়ল ঘটঘট করে। টিপু তার থেকে চোখ সরিয়ে দেখল সামনে মাঠটা গায়েব, সেখানে একটা ছাইরঙা হ্রদ। আকাশটা হলুদ। আর তারা মোটেই বেঞ্চে বসে নেই, বসে হ্রদের পাথরে বাধানো ঘাটের সিঁড়িতে। পাথরটা দেখতে জলের মতো স্বচ্ছ।

টিপুর বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না যে সে থিবামোচেদের দেশে এসেছে। তাই সে আপনমনে আওড়াল,

"মাঠে গেলে ঘাসে নাচে ফড়িং- এর হাঁচি
কচকচ কেটে চলে এলোমেলো কাঁচি
তার ফাঁকে হাঁপ ধরে পেটে মুখে বুকে
পিঠে ব্যাথা সেরে যায় আগে পিছে ঝুঁকে।"

ডুকরে কেঁদে উঠল জেকোদেপো। বলল, "তুমি আমাকে গায়েব করিয়েই ছাড়বে।" টিপু এবার খেপে উঠল। হাত- পা ছুঁড়ে বলল, "আমি মনে মনে পদ্য আওড়ালে তোমাকে গায়েব করবে কেন? আর করবেই বা কে, কাউকে তো দেখছি না আশেপাশে কী এদিকে আসতে?" জেকোদেপো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "পেয়াদাদের কী চোখে দেখা যায় গো। তাঁরাও অদৃশ্য থাকেন। আর অন্যায় অপরাধ দেখলেই ঘ্যাঁক করে গায়েব করে দেন। আর আমাদের দেশের নিয়ম হচ্ছে যে মনে মনে কেউ কিছু বললে সেটা টের পেলে গলা ছেড়ে বলে দিতে হবে। না হলেও গায়েব করে দেবে। আর তুমি মনে মনে বললে তো বললে একটা পদ্যই বললে!" আবার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল জেকোদেপো। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জেকোদেপো বলল,

"মাঠে গেলে ঘাসে নাচে ফড়িং- এর ছিঁক
কচকচ কেটে চলে এলোমেলো কাঁই
তার ফাঁকে হাঁপ ধরে পেটে জিভে হাতে
পিঠে ব্যাথা সেরে যায় আগে পিছে হেঁটে।"

আর অমনি তার হাঁটু থেকে বাকি পা- টা গায়েব হয়ে গেল। সে হাঁ- হাঁ করে উঠল, "আমি এবার ফিরব কী করে আমার ঝোপে!" টিপু অবাক হয়েছিল। থাকতে না পেরে বলল, "কিন্তু তুমি তো আমার পদ্য বলো নি!" জেকোদেপো বলল, "তাতেই তো মুশকিল হলো। এখানে কোনো চালাকি সহ্য করে না পেয়াদারা। তাই আমাকে নিয়ম ভাঙার শাস্তি দিল।" এবার আর জেকোদেপোর চোখ দিয়ে জল বেরোলো না, সে খানিকটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করল। তারপর সুর করে বলল,

"মাঠে গেলে ঘাসে নাচে ফড়িং- এর হাঁচি
কচকচ কেটে চলে এলোমেলো কাঁচি
তার ফাঁকে হাঁপ ধরে পেটে মুখে বুকে
পিঠে ব্যাথা সেরে যায় আগে পিছে ঝুঁকে।"

ব্যস, বলা শেষ হওয়া মাত্র সে ঝপ করে গায়েব হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল তার হ্রদ আর আকাশ আর পাথর বাধানো ঘাট।

টিপুও বইটা বন্ধ করে বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল। বাড়ি এসে হাত- পা ধুয়ে পড়তে বসে গেল।

ছবিঃ অর্ণব

suchipotro

গৌতম মৌলিক

খালপাড় অভিযান

ব্রেকফাস্টের সময় বাবিদা আর তম্বু নেই। খোঁজ, খোঁজ। সবাই আমার দিকেই তাকাচ্ছে। ওদের সব দায়িত্ব যেন আমার। যদিও আমাকে না নিয়ে ওদের কোথাও যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক। বাড়ির কোথাও নেই। বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। রাস্তার ওপারে ধানক্ষেত। মোটামুটি একশো মিটার দূরে এক সারি নারকেল গাছ, এ মাঠের সীমানা। তার ওপারে আবার ধানক্ষেত, বহুদূর অবধি, যদ্দূর দেখা যায়। ডানদিকে একটা বিশাল বাঁশবন।

ফোরের পরীক্ষার পর আমরা বেড়াতে এসেছি বড়পিসির কাছে, সোনারপুরের শীতলা গ্রামে। এখানে বড়পিসি, পিসো ছাড়াও আছে বড়দা, বড়দি, ছোড়দা, ছোড়দি – আমার পিসতুতো দাদা-দিদিরা। তাদের একমাত্র কাজ আমাদের ওপর খবরদারি করা। বাবিদা আমার জেঠতুতো দাদা, সেলিমপুরে থাকে, এবারে সিক্সে উঠবে। আমি আর আমার ভাই তম্বু এসেছি মায়ের সঙ্গে, কালনা থেকে। তম্বু এখনও দুধেভাতে, স্কুলে ঢুকতে আরও একবছর। ওর পড়ার বই বলতে অরণ্যদেব, ম্যানড্রেক এসব। আমার আর বাবিদার মাথায় গিজগিজ করছে টিনটিন, ফেলুদা, শঙ্কু, শার্লক হোমস, ঋজুদা। সবকিছুর মধ্যেই আমরা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

মাঠের দিকে তাকাতেই দূরে ওদের দেখতে পেলাম। বাঁশবনের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে। আমাকে দেখেই বাবিদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করল। কাছে এসে বলল, “চল, আগে খেয়ে নি, তারপর বলছি।” বাড়ি ঢুকতেই তারস্বরে সবাই চিৎকার আরম্ভ করল – কোথায় গেছিলি, বলে যাস না কেন, পাখা গজিয়েছে, সারাদিন টইটই, বেশি বাড়াবাড়ি করলে বাড়ি পাঠিয়ে দেব – এইসব। বড়দি সবচেয়ে বেশি চেঁচায়। যাক গে। চুপচাপ ভালমানুষের মত ব্রেকফাস্ট করেই ছাতে উঠে গেলাম।

বাবিদা বলল, “কালকের কাগজ পড়েছিলি?” বলে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের টুকরো বার করল। এই খবরটা চোখে পড়েনি। ‘সোনারপুরে যুবক খুন’। ছোট্ট চারলাইনের নিউজ। গতকাল সোনারপুরে একটি চাষের খালের জলে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা তার মাথায় কোনও ভারি জিনিস দিয়ে আঘাত করে খুন করে তারপর খালের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যুবকের নামপরিচয় জানা যায় নি। পুলিশ তদন্ত করছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কাউকে এখনও গ্রেফতার করতে পারে নি।

বাবিদা বলল, "খালটা ওদিকেই। বাঁশবন ছাড়িয়ে গেলে খালের উঁচু পাড়টা দেখা যায়।"

চাষের মাঠ যখন আছে, খাল তখন থাকতেই পারে। কিন্তু সেই খালেই যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে তার কী মানে আছে?

বাবিদা বলল, "ওই খালই সেই খাল। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করছিল। প্রশ্ন হচ্ছে এই পাড়াগাঁয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে বাইরের একটা লোক এসে কী করছিল যে তাকে খুন হতে হল?"

"বাইরের লোক কী করে জানলে?"

"গাধা! এখানকার লোক হলে কি আর নামপরিচয় জানা যেত না?"

সত্যিই তো! রহস্য! কিন্তু কত কিছুই তো হতে পারে। লোকটা হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ওখানে পিকনিক করতে গেছিল যাদের কারো কোনও মোটিভ ছিল। হয়তো অন্য কোথাও ওকে খুন করে শেষে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

বাবিদা বলল, "স্পটটা দেখতে পারলে হয়তো কোনও ক্লু পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু স্পটটা কতদূর?"

"প্রথমে তো খালের ধারে পৌঁছতে হবে। খাল ধরে হাঁটলেই নিশ্চয় বুঝতে পারব জায়গাটা।"

সুতরাং উত্তেজনা। এই রহস্যের সমাধান আমাদের করে ফেলতেই হবে। করতে পারলে বাড়ি ফিরে স্কুলের বন্ধুবান্ধবের কাছে একটা বলার মতো ব্যাপার পাওয়া যাবে। আর অত ছোট ছোট পাণ্ডব গোয়েন্দারা, এনিড ব্লাইটনের ফেমাস ফাইভ যদি এত কিছু পারে, আমরাই বা পারব না কেন? শুধু একটু আটঘাট বেঁধে এগোতে হবে। খালি হাতে দুম করে বেরিয়ে পড়লে তো হবে না! প্ল্যান করতে হবে।

ঠিক হল দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়ব। বাবিদা বলল বাঁশবন থেকে খালপারটা বেশ দূর। তারপর খালপারে পৌঁছে সঙ্গেসঙ্গেই যে আমরা স্পটটা পেয়ে যাব তা তো নয়। হয়তো একদিকে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম না, তখন আবার ফিরে গিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে হবে। অতএব, সময় লাগবে। আজ যদি জায়গাটা খুঁজে না পাই, ফিরে এসে কাল আবার সেখানে যাওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। তাই ঠিক হল দরকার পড়লে রাতে আমরা খালপারেই থেকে যাব, কাল সকাল থেকে যাতে ফের খোঁজাখুঁজি শুরু করা যায়। সুতরাং সঙ্গে অনেককিছু নিতে হবে। লিস্ট তৈরি হল, তারপর লিস্ট মিলিয়ে সংগ্রহ।

আমি আর বাবিদা দুটো পিঠে ঝোলানো স্কুলব্যাগ নিচ্ছি, হাঁটতে সুবিধে হবে। তম্বু ছোট, ওয়াটার বটলটা ও নেবে। ব্যাগে প্রথমেই ঢুকল তিনটে চাদর, শীত আছে যথেষ্ট। একটা টর্চ ঢোকালাম, রাত্রে লাগবে। দেশলাই, ব্লেড, ছোট কাঁচি, একটা ছুরি। সবই বাড়ির এখান সেখান থেকে চুপচাপ ঢোকানো হল। কেউ টের পেলেই ঝামেলা। নানা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে। কতগুলো পুরনো খবরের কাগজ নিলাম, রাত্রে বিছিয়ে শোয়ার জন্য। কিছু ওষুধপত্তর নিতে হবে। তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল, ফুরাসিন ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একটা প্লাস্টিকে পুরে ফার্স্ট এইড কিট বানিয়ে ফেললাম। এরপর খাবারদাবার জোগাড় করার পালা। এটাই সবচেয়ে ঝামেলা। ছোড়দি, বড়দি, বড়পিসিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু সরানোই মুশকিল। প্রথমেই দু'তিনটে প্লাস্টিক রেডি করলাম। পিসোর এখন অফিস যাওয়ার সময়। সবাই মোটামুটি তটস্থ। হলঘরে পিসো খেতে বসেছে। খেতে দিচ্ছে বড়পিসি। তার মধ্যেই ছোড়দি পিসোকে জুতোমোজা পরিয়ে দিচ্ছে, আর বড়দি ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই আমরা ছিলাম। রান্নাঘরের মুড়ির টিন খুলে এক প্লাস্টিক ভরতি মুড়ি নিয়ে নিলাম। আরেকটাতে চানাচুর, বেশ খানিকটা। প্রতিদিন সন্ধেবেলা এখানে একটা বড় গামলায় মুড়ি- চানাচুর- পেঁয়াজ মাখা হয়, সবাই একসঙ্গে খাই। একটু পরেই শুরু হয় মুড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি। একজন হাঁ করে, আরেকজন দূর থেকে মুখ টিপ করে মুড়ি ছোঁড়ে। শেষে সারা মেঝেতে মুড়ি ছড়াছড়ি। তাই মুড়ি- চানাচুরের পরিমাণ একটু কমলে কেউ অতোটা খেয়াল করবে না।

আর নিলাম বিস্কুট। পিসো বেরিয়ে যাওয়ার পরও ছোড়দির কাছে চেয়ে দু'বার বিস্কুট নিলাম, আর ব্যাগে পুরলাম। ছোড়দি একটু অবাক হল। সাধারণত এই সময়ে বিস্কুট চেয়ে খাওয়ার সময় আমাদের থাকে না। পিসো বেরিয়ে গেলেই আমরাও সোজা মাঠে, ক্রিকেট। আজ তিনজন ছাদে গুজগুজ ফুসফুস করছি দেখলে একটু অন্যরকম লাগতেই পারে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না দেখলাম। হয়তো ভাবছে সকালের বকাঝকায় বেশ কাজ হয়েছে।

অন্যদিন মাঠ থেকে মোটামুটি কান ধরে তিনজনকে টেনে আনতে হয়। আজ চুপচাপ তিনজনের স্নানটান সারা। তক্কে তক্কে আছি কখন বেরোনো যায়। জুতোমোজা পরে সবার সামনে দিয়ে তো বেরোনো যাবে না, জিগ্যেস করবে কোথায় চললি! আমাদের খাওয়াদাওয়ার পর বড়রা সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। এটাই মোক্ষম সময়। ওদের খাওয়া এখন ঘন্টাখানেক চলবে। খাওয়া তো শুধু নয়, আড্ডা- গল্প- হাহা- হিহি'র ম্যারাথন।

বেরিয়ে পড়লাম। সামনের মাঠটা দৌড়ে পেরিয়ে গেলাম, তারপর ডানদিকে ঘুরে বাঁশবনে ঢুকে গেলাম। ব্যাস, নিশ্চিন্ত। বাড়ি থেকে আর কেউ দেখতে পাবে না। জিনিসপত্র আরও কিছু যোগ হয়েছে। টুকিটাকি, সাবান, ব্রাশ, ডায়রি, পেন্সিল ইত্যাদি। পিসোর একটা মর্নিং ওয়াকের লাঠি আছে, মাথাটা গোলমতো, রুপো দিয়ে বাঁধানো। পিসোর খুব ফেভারিট জিনিস, কেউ ধরতে সাহস পায় না। বেরোনোর সময় বাবিদা সটান সেটাকে নিয়ে নিল। কে আর দেখছে এখন! তম্বুর পক্ষে ওয়াটার বটলের স্ট্র্যাপটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে, হাঁটলে পরে হাঁটুতে ঢকর ঢকর করে লাগছে। গিঁট মেরে সেটাকে খাটো করে দিলাম।

বাঁশবন পেরিয়ে আবার মাঠ, ধূ ধূ করছে। কোনও গাছপালা নেই। ধান কাটার পর ধানগাছের গোড়াগুলো শুকিয়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। শীতকাল, তাই সাপের ভয় নেই। বহুদূরে উঁচুমত একটা বাঁধ টাইপের দেখা যাচ্ছে। ওটাই মনে হচ্ছে খালপার। খালের দু'পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া থাকে জানি। বাঁধ ধরে গাছের সারি চলে গেছে। তার আগে আর কোনও আড়াল নেই।

বাঁশবন ছেড়ে বেরোনোর পরে আবার বাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। যদিও অত দূর থেকে আমাদের বুঝতে পারবে না, তবু কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি খালের ধারে পৌঁছনো যায় ততই ভাল।

কিন্তু তম্বু নেহাতই ছোট। এই ঘন্টাদেড়েক হেঁটেই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'তিনবার জল খাওয়া হয়ে গেছে। এরপর মাঠের মধ্যে উবু হয়ে বসেই পড়ল। রেস্ট। বাবিদা অধৈর্য হয়ে পড়ছে। বলল, "হাঁটতে না পারলে বাড়ি চলে যা।" তম্বু বলল, "বাড়ি? বাড়ি তো অনেক দূর!"

"কোথায় দূর? ওই তো দেখা যাচ্ছে। ভয় নেই, আমরা তাকিয়ে আছি। খবরদার কিন্তু বলবি না।"

"দেখা গেলেই কি কাছে হল? সূর্যও তো দেখা যাচ্ছে!"

বুঝলাম বাড়ি ফেরার পাত্র তম্বু নয়। তখন বাবিদা আরেকটা প্রস্তাব দিল, "তুই তাহলে এখানেই বোস। জলের বোতল আর একটু মুড়ি চানাচুর রেখে দে। ফেরার সময় আমরা তোকে নিয়ে ফিরব।"

"কখন ফিরবে তোমরা?"

"খালের ধারেই এখনও পৌঁছলাম না! স্পটটা খুঁজে বার করতে হবে। কোনও ক্লু যদি পাওয়া যায়।"

তম্বুর নির্ঘাত আমাদের প্ল্যান মনে পড়ে গেল, দরকার হলে রাতটা খালের ধারেই কাটাব আমরা। আর বিকেল তো প্রায় হয়েই এসেছে। দেখি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে হাঁটতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভব ব্যাপারটা কল্পনা করল যে – রাত হয়েছে, চাঁদ উঠেছে, ধূ ধূ খোলা মাঠের মধ্যে একা উবু হয়ে বসে আছে তম্বু, সামনে একটা প্লাস্টিকের ঠোঙায় একটু মুড়ি- চানাচুর।

আরও ঘন্টাখানেক হাঁটার পর খালধারে পৌঁছলাম। খালের দু'ধারেই উঁচু পার। জল খুব কম। বড়জোর হাঁটু অবধি হবে। পরিষ্কার টলটলে জল, তিরতির করে বইছে। আমরা যেরকম আশা করছিলাম – রক্তের স্রোত- টোত, ধস্তাধস্তির চিহ্ন – সেসব কিছু নেই। স্বচ্ছ জলের নিচে কাদামাটি এত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে কেউ খালে নামলে তার পায়ের ছাপও ওপর থেকেই দেখা যাবে। তাই স্পটটা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়।

পাড় ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। সারি দিয়ে গাছ লাগানো পারে। শীতকাল বলে গাছে পাতা কম। মাটিতে প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে আছে। রাত্রে আগুন জ্বালাতে কোন অসুবিধে হবে না। আধঘণ্টা হেঁটেও কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। ধারেকাছে কোনও গ্রামটাম নেই। চাষিদেরও মাঠে এখন কাজ নেই। তাই চারদিক শুনশান। খালের ওপারের উঁচু বাঁধটার ঠিক পেছনের অংশটা এদিক থেকে দেখা যায় না। ওপারে গেলে যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়! তাই বাবিদা বলল, "চল, খালটা পেরিয়ে ওপারে যাই।"

আমরা কেউই সাঁতার জানিনা। তবে জানার কোনও দরকার নেই। জল খুবই কম। জুতোমোজা খুলে জলে নেমে পড়লাম। প্রথমে বাবিদা, তারপর আমি। তম্বু দেখছে আমরা কী করি, ওকে তো শুধু জুতোমোজা খুললে হবে না! জলে নামতেই বিপত্তি। নরম কাদায় পা ঢুকে যাচ্ছে। একটু এগোতেই প্রায় হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেল। আর এগোতেও পারি না, পেছোতেও পারি না। ওপারে যাওয়ার প্ল্যান ত্যাগ করতে হল। পিসোর লাঠিতে ভর দিয়ে, হাঁচড়পাঁচড় করতে করতে কোনও রকমে ফের পারে উঠে এলাম। হাত- পা কাদায় মাখামাখি। খবরের কাগজগুলো এখন কাজে লাগল। কাদা- টাদা মোটামুটি পরিষ্কার করে ফের হাঁটা লাগালাম।

একটু হাঁটার পর দেখি উল্টোদিক থেকে চার- পাঁচটা ছাগল নিয়ে এক বুড়োদাদু মাঠ ভেঙে আসছে। খাটো করে লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা নস্যি রঙের চাদর। আমাদের দেখতে পেয়েছে। কাছে আসার পর জিগ্যেস করল, "কই চললেন বাবুরা?"

আমি বললাম, "দাদু, এই খালের ধারে কোথায় নাকি একটা খু... –আঃ!"

বাবিদার এক রামচিমটি খেয়ে আমার কথা থেমে গেল। তাড়াতাড়ি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলল, "দাদু, বলছিলাম কী, এই খালের ধারে কোথায় নাকি একটা খুব সুন্দর বাগান আছে? সেটা কতদূর জানো?"

বুড়োদাদু অবাক হয়ে বলল, "এইখানে আবার বাগান কই? সবই তো মাঠ।"

"ও, বাগান নেই? আর জঙ্গল?"

"জঙ্গল আবার কই? ওই সামনে একটা খেজুর বাগান আছে। আপনেগো বাড়ি কই? শীতলা?"

"না না, আমরা কলকাতায় থাকি। ওই খেজুর বাগানের কথাই তো বলছিলাম। চল চল, তাড়াতাড়ি চল," বলে বাবিদা আমাদের তাড়া লাগালো। আমরাও প্রায় দৌড়লাম সামনের দিকে। আরেকটু হলেই ধরা পড়ে গেছিলাম আর কি!

বুড়োদাদু পেছন থেকে বলল, "ওই বাগানে যাইয়েন না, সন্ধ্যা হইয়া আসছে।"

আমরা আর দাঁড়াই! বাবিদা আমার দিকে তাকিয়ে রেগেমেগে বলল, "বোকারাম, আর একটু হলেই সব গুবলেট করে দিচ্ছিলি। তুই ওকেই জিগ্যেস করতে গেছিলি কোথায় খুন হয়েছে?"

"কেন, কী হয়েছে তাতে? ও তো এখানকারই লোক, জানতেও পারে।"

"দাদুর গায়ের চাদরটার মধ্যে কালচে লাল ছোপগুলো লক্ষ্ করেছিলি?"

"ছোপ? ও, পানের পিকের ছোপগুলো?"

"বুদ্ধু! ওগুলো শুকনো রক্তের দাগ। আমার ধারণা ওই খেজুর বাগানে গেলেই স্পটটা পেয়ে যাব।"

"কী করে বুঝলে?"

"আমরা যাতে না যাই ওই জন্যই দাদু আমাদের বারণ করছিল। পড়িসনি, অপরাধী মাঝে মাঝেই তার অপরাধের জায়গায় ফিরে আসে? নাহলে, চারদিকে কেউ কোত্থাও নেই, একা একা এই ধূ ধূ মাঠে ও এখন কী করছিল?"

যখন দাদুর সেই খেজুর বাগানটায় পৌঁছলাম, বিকেল প্রায় শেষের দিকে। এই জায়গাটা চাষের মাঠ নয়। খালের ধারে উঁচুনিচু অনেকটা ঘাসজমি। সেখানে অনেক খেজুর, নিম, বাবলা আর শিমুল গাছ। জঙ্গল ঠিক বলা যায় না, তবে অনেক গাছপালা। শীতকাল, পাতা ঝরে গিয়ে গাছগুলো কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। নিচের মাটিতে ঘাসের ওপর শুকনো পাতার পুরু স্তর। দাদুর ছাগলগুলো মনে হয় এখানেই ঘাস- পাতা খেতে এসেছিল।

পৌঁছেই একটা শিমুল গাছের গুঁড়ির ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ে তম্বু ঘোষণা করল, "আমি মুড়ি খাব।"

তম্বু বলতেই খেয়াল হল, আমাদেরও পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারপাশের মাঠের ওপর ধীরে ধীরে পাতলা সাদা কুয়াশার চাদর নেমে আসছে। ঠাণ্ডা লাগছে একটু একটু। এতটা হেঁটে বেশ পা ব্যথাও করছে। আমরাও দুটো গাছের তলায় ব্যাগ- ট্যাগ নামিয়ে বসে পড়লাম।

মিনিট দশেক বসার পরই বেশ শীত করতে লাগল। চারদিক কেমন নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বাবিদা বলল, "শুকনো পাতা জড়ো করি চল। আগুন জ্বালবো। তারপর মুড়ি মাখা যাবে।"

তম্বুকে ওঠানো গেল না, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে চুপ করে বসেই রইল। বেচারা বাচ্চা মানুষ, হাঁপিয়ে গেছে। আমি আর বাবিদা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকনো পাতা জড়ো করে একটা বিশাল স্তূপ বানিয়ে ফেললাম। তারপর সেটায় দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া গেল।

প্রথমে একটু সময় লাগলেও একটু পরই পাতার স্তূপটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। বেশ উঁচু একটা আগুন হল। বাবিদা আমাকে বলল, "তুই আগুনের মধ্যে পাতা দিয়ে যা, আমি মুড়ি মাখছি।" আমি চারপাশ থেকে পাতা ছাড়াও শুকনো ডালপালা, কাঠিকুঠি জোগাড় করতে লেগে গেলাম। আগুনের আঁচে তখন শীতটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

অনেকটা মুড়ি- চানাচুর মেখে, তিনটে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভাগ করে আমরা আগুনটা ঘিরে বসলাম। আমাদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো চারপাশের গাছের গায়ে পড়ে আগুনের তালে তালে দুলতে লাগল। রাত হয়ে গেছে। আকাশে হাল্কা জ্যোৎস্না উঠেছে। সেই আলোয় আর কুয়াশায় তিনপাশের ধূ ধূ মাঠ কেমন 'হাইলি সাশপিশাস' লাগছে।

মুড়ি খেতে খেতে বাবিদা বলল, "বুঝলি, খেয়ে নিয়ে আরও ডালপালা যোগাড় করতে হবে। আগুনটা সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তাহলে আর শীত করবে না।"

বললাম, "স্পটটা খুঁজে দেখবে না?"

"এই অন্ধকারে টর্চের আলোয় কি আর কিছু বোঝা যাবে? কাল সকাল থেকে ফের তদন্ত শুরু করতে হবে।"

তম্বু বলল, "আমরা কোথায় ঘুমবো?"

বাবিদা বলল, "ঘুমবো কেন? এখানেই সারারাত আগুন পোয়াব।"

তম্বুর মনে হয় বাবিদার প্ল্যানটা খুব একটা পছন্দ হল না। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্ধকারে ঝুপসি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোকে দেখতে লাগল। এখন যদি বলে বসে বাড়ি যাব, তবেই হয়েছে। সেটা অবশ্য বলল না। বলল, "এখানেই বসে থাকব? ঘাসগুলো তো শিশিরে ভেজা। প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে।"

বাবিদা পিসোর ওয়াকিং স্টিক দিয়ে আগুনটা খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "খবরের কাগজ নিয়ে এসেছি তো, পেতে দেব।"

"যদি কেউ আসে?"

"কে আসবে? ভূত?" বলে বাবিদা হেসে উঠল।

আমাকেও বাধ্য হয়ে হাসতে হল, নাহলে ওরা কী ভাববে! কিন্তু কিছুক্ষণ ধরেই একটা কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। বললাম, "ভূত নয়, কিন্তু ওই বুড়োদাদুটা যদি আবার আসে?"

বাবিদা বলল, "সে আবার এখানে আসতে যাবে কেন?"

"বা রে, তুমিই তো বলছিলে, অপরাধী বার বার তার অপরাধের জায়গায় ফিরে আসে। ও তো আমাদের এদিকে আসতে দেখেছে। আমরা কী করছি দেখার জন্য যদি আবার ফিরে আসে? দাদুর হাতে কিন্তু একটা কাস্তে ছিল।"

"আসুক না। এলেই হল? আমরা তো তিনজন আছি। কী করবে?"

"যদি লোকজন জুটিয়ে নিয়ে আসে? আমার মনে হয় ও শীতলাতেই থাকে।"

তম্বু হঠাৎ বলল, "ওই যে, আসছে তো!"

তম্বুর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা দু'জনেই মাঠের দিকে তাকালাম। দেখি সত্যিই কুয়াশার আবছা অন্ধকারের মধ্যে দূরে তিনটে ছায়ামূর্তি এদিকেই এগিয়ে আসছে। সেই বুড়োদাদু আছে কি না আরও কাছে না এলে বোঝা যাবে না। তবে একটা ছায়ামূর্তি খুব ঢ্যাঙা, একটা মাঝারি লম্বা আর একটা ছোটখাটো। বাবিদা বলল, "আগুনটা জ্বালানো একটু গোলমাল হয়ে গেছে। চল তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলি, তারপর গা ঢাকা দিতে হবে।"

মুড়ি- টুড়ি ফেলে আমি আর বাবিদা তাড়াতাড়ি যে যার ব্যাগ উঠিয়ে পিঠে নিয়ে নিলাম। তারপর দু'জনে দুটো লম্বা গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে আগুনটা নেভানোর চেষ্টা করতে

লাগলাম। কিন্তু যেরকম দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুনটা, অত সহজে নেভে না কি? এদিকে ছায়ামূর্তি তিনটে ততক্ষণে আমাদের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে।

তম্বুটাকে নিয়ে আসা সত্যিই আমাদের ঠিক হয় নি। ও বেচারা এখনও খুবই ছোট। এতক্ষণ ধরে ক্যাবলার মত তম্বু ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। আর তারপর যা করল, বললে বিশ্বাস করা যায় না। হঠাৎ সোজা পড়ি কি মরি করে ছুট লাগাল ওদেরই দিকে। আর আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, ওদের কাছে গিয়ে তম্বু সোজা ছোটখাটো ছায়ামূর্তিটার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওরা আগুনের আরও কাছে আসতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। ধরা পড়ে গেছি। ছায়ামূর্তি তিনজন আসলে ছোড়দা, ছোড়দার এক বন্ধু, আর মা। আমাদের খুঁজে বার করে ফেলেছে। তম্বু এখন মায়ের কোলে। তিনজনই আমাদের দিকে এমন কটমট করে তাকাচ্ছিল যে আমরাও আর কথা না বাড়িয়ে সুড়সুড় করে ওদের পেছন পেছন বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আশ্চর্য, বাড়ি ফেরা অবধি সারা রাস্তা কেউ আমাদের সাথে একটাও কথা বলল না।

* * * * *

সোনারপুরের বাড়ির গ্রিল দেওয়া বাইরের বারান্দা। পাশেই রাস্তা। বারান্দায় তিনটে ছোট ছোট মোড়ায় আমাদের তিনজনকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার বাইরে, বাগানে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে অজস্র লোক। প্রথমে বারান্দার গ্রিল আর কোলাপসিবল গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। এরা সকাল বিকেল আমাদের সঙ্গেই খেলে, অথচ এখন কেউ আমাদের সাথে একটাও কথা বলছে না। কী বিশ্বাসঘাতক! ছোটদের পেছনের সারিটা পাড়ার যত মেয়ে আর বৌদের। তারও পেছনে আর রাস্তায় পুরুষমানুষদের জটলা। আমাদের সবাই অবাক হয়ে একমনে দেখে যাচ্ছে, যেন আমরা চিড়িয়াখানার কোন জন্তু। ভিড়ের থেকে টুকরো টুকরো নানারকম কথা ভেসে আসছে। 'এই ছোঁড়াগুলোই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, না?' 'ধরা পড়ল কী ভাবে? পুলিশের হাতে?' 'এই বয়েসেই কী সাঙ্ঘাতিক বদমাইশ হয়েছে দেখেছিস? বড় হলে তো ডাকাত হবে!' 'এইটুকু ছেলে সব, পালাল কী করে? মা- বাবার জন্য একটু দরদ নেই গো!'

চারদিকের নানারকম কথাবার্তা থেকে যা বোঝা গেল, আমাদের খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে বেশ হুলস্থূল পড়ে গেছিল। প্রথমে বাড়ির চারপাশেই খোঁজাখুঁজি করা হয়। না পেয়ে একেকজন একেকদিকে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ে। বড়দা সেসময় বাড়ি ছিল না, বিকেলে বাড়ি ফিরে সব শুনেই স্কুটার নিয়ে সোজা চলে যায় চম্পাহাটির দিকে। বড়পিসি ছোড়দিকে নিয়ে গেছিল রেল লাইনের ধার অবধি। বড়দি গেছিল বলাকার মাঠের দিকে। ছোড়দারা খোঁজাখুঁজি করছিল পাড়ার স্কুলের আশেপাশে আর বাঁশঝাড়ের দিকে। বড়দা চম্পাহাটি অবধি গিয়েও কোনও হদিশ না পেয়ে চলে যায় থানায় খবর দিতে। বড়পিসি জেলেদের বাড়ি গিয়ে তাদের ধরে আনে পুকুরে জাল ফেলে খুঁজবে বলে। এমনসময় সেই বুড়োদাদু, সেই আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছে, ছোড়দাদের খোঁজাখুঁজি করতে দেখে বলে তিনজনকে সে খালের ধার ধরে খেজুরবাগানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছে। তখন মা আর ছোড়দারা রওনা হয় খালের দিকে আর অনেক দূর থেকেই আগুনটা দেখতে পায়। এই হল গিয়ে এদিককার ঘটনা।

এরপরে বড়দা, বড়দি, ছোড়দা আর ছোড়দির যা কথাবার্তা শুনতে পেলাম, তাতে বুঝতে পারলাম এখন আলোচনার বিষয় হল আমাদের নিয়ে কী করা যায়। ঠিক কেমন শাস্তি দিলে আমাদের এই ভয়ানক বেয়াদবির উপযুক্ত হবে। এই নিয়ে ওদের চারজনের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। কেউ বলছে, 'ওই বারান্দাতেই বসে থাকুক ওরা, তিনদিন খাওয়া বন্ধ।' কেউ বলছে, 'কাল সকালেই তিনজনকে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোক। অনেক হয়েছে।' কেউ আমাদের জলতেষ্টা পেয়েছে কিনা সেটা পর্যন্ত জিগ্যেস করল না।

শেষমেশ কোনও কিছুই ওরা ফাইনাল করতে পারল না। আর তার ফলে যা ঠিক করল সেটা ভয়ংকর। ঠিক হল আমাদের শাস্তি দেবার ভারটা পিসোর ওপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। পিসো কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিস থেকে ফিরবে। আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পিসোকে বলা হবে। তারপর পিসো যা শাস্তি দেয় তাই ফাইনাল। পিসোকে সবাই আমরা ভয়ানক ভয় করি। খুব মেজাজি মানুষ। বিশেষ করে ঠিক অফিসে যাওয়ার সময় আর অফিস থেকে ফেরার পরপরই পিসোর মেজাজ একদম উঁচু তারে বাঁধা থাকে। আমাদের তখন আর করার কিছুই নেই, শুধু নিজেদের বুকের ঢিবঢিব আওয়াজ শোনা ছাড়া।

বাইরের ভিড় পাতলা হয়ে এল। আমাদেরও বারান্দা থেকে উঠিয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। খানিক বাদেই কলিং বেলের আওয়াজ, পিসো চলে এসেছে। আমরা কান পেতে বাইরের ঘরের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছি। পিসো জুতো খোলার সময়ই বড়দি 'জানো, বাবা..' বলে তড়বড় করে আরম্ভ করতে গেছিল, বড়পিসি থামিয়ে দিল, "দাঁড়া দাঁড়া, বাবা আগে হাত- মুখ ধুয়ে নিক, একটু খাওয়াদাওয়া করুক, তারপর যা বলার বলিস।" এই ঘরে আমাদের ঢোকানোর সময় দেখে এসেছি, পিসোর সেই ওয়াকিং স্টিকটা বসার ঘরের একপাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে ঘরে ঢুকেই নজরে পড়ে। রুপো বাঁধানো লাঠিটা কাদায় একদম মাখামাখি, নিচের দিকটা আগুনের আঁচে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ওটা দেখেই তো পিসোর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাবার কথা।

যাই হোক, বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বুঝতে পারলাম, পিসোর জলখাবার খাওয়া হল। তারপর চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরের সোফায় থিতু হবার পর বড়দা, বড়দি এতক্ষণ ধরে মনে মনে রিহার্সাল দেওয়া পার্ট গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল। পিসোর কথা কিছু শোনা গেল না। আধঘণ্টা বাদে আমাদের ডাক পড়ল। তখন প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসার ঘরের মধ্যে সেই তিনটে মোড়া রেখে তার ওপর বসানো হল। চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে বড়দা, বড়দি, ছোড়দা, ছোড়দি, বড়পিসি, মা, এমনকি রান্না করে যে সেই যশোদামাসি অবধি। সবাই মজা দেখতে উদগ্রীব।

পিসো গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, "তোরা ওই খালের ধারে গেছিলি?"

বাবিদা বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

বাবিদা পকেট থেকে সেই ভাঁজ করা খবরের কাগজের কাটিংটা বার করে পিসোর হাতে দিয়ে বলল, "খুনের তদন্ত করতে।" তারপর আমাদের যাবার কারণ, সন্দেহ, ঘটনাবলী এবং প্রায় যে আমরা স্পটে পৌঁছে গেছিলাম সে বৃত্তান্ত কম কথায় নিচু গলায় ব্যাখ্যা করল। আমরা তো অপরাধী ধরতেই গেছিলাম, অথচ এখন কিনা আমাদেরই বিচার হচ্ছে।

পিসো গম্ভীরভাবে সমস্ত শোনার পর বলল, "আমার সামনে লাইন দিয়ে তিনজনে দাঁড়াও।"

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। আমি আর বাবিদা দু'পাশে, মাঝখানে তম্বু।

পিসো প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "ওই ভাবে নয়, লম্বা থেকে বেঁটে, সিরিয়ালি।"

আমরা তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করলাম। এবারে প্রথমে বাবিদা, তার পাশে আমি, সব শেষে তম্বু।

পিসো খানিকক্ষণ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাবিদার দিকে তাকিয়ে বলল, "এইটা পালের গোদা, সবচাইতে লম্বা। এইটা একটু খাটো। আর এইটা তো একদম বাঁটকুল।"

তারপর আবার হুঙ্কার দিয়ে আমাদের পিলে চমকে দিয়ে বলল, "বেশ করেছিস গেছিস। একশবার যাবি। এই তো চাই।" তারপর বড়দা, বড়দি, ছোড়দা, ছোড়দিদের দিকে তাকিয়ে আরেকটা হুঙ্কার, "তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কী দেখছিস? পড়াশোনা নেই? যাও, নিজের কাজে যাও। লজ্জা করে না এইটুকু- টুকু ভাইদের নামে নালিশ করতে?"

ওদের উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে থাকা মুখগুলো হঠাৎ চুপসানো বেলুনের মত হয়ে গেল। বড়রাও সবাই এদিকওদিক সরে পড়ল। আর আমরা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যাপারস্যাপার কী ঘটল তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পিসো গম্ভীরভাবে বলল, "তোরা কনটিকি অভিযানের গল্প শুনেছিস?"

আমরা বললাম, "না।" পিসো বাবিদাকে বইয়ের র‍্যাকের মাঝের তাকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওখান থেকে কমলা রঙের স্পাইনের বইটা বার কর।" বাবিদা বইটা নামাল। দেখলাম থর হেয়ারডালের লেখা একটা বই, 'দ্য কনটিকি এক্সপিডিশন'।

পিসো বলল, "তোদের আজকে কনটিকির গল্পটা বলব। ছোট করে বলব। তারপর বইটা পড়ে নিস। তার আগে চল খেয়ে নি। কই, খেতে দিয়ে দাও আমাদের, খিদে পেয়েছে।"

শেষের কথাটা অবশ্য বড়পিসিকে উদ্দেশ্য করে বলা। আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা তখনও ঠিক কাটে নি। পিসো আমাদের গল্প বলবে? বড়পিসির কাছে ছোটবেলায় অনেক গল্প শুনেছি – ঠাকুরমার ঝুলির গল্প, টুনটুনির বইয়ের গল্প, হ য ব র ল – আরও কত কী। কিন্তু পিসোর কাছে আমরা বড় একটা ঘেঁষতাম না। যা রাশভারী মানুষ! চুপচাপ মুখ গুঁজে রাতের খাওয়া খেতে খেতে ভাবছিলাম, এ তো শাস্তির বদলে পুরস্কার জুটে গেল! কথাবার্তা অবশ্য তখনও কেউই বলছি না, কেননা পিসোর মুডের ওপর আমাদের ভরসা নেই মোটেই, কখন আবার বিগড়ে যাবে। তাছাড়া খিদেও এমন পেয়েছিল যে কথা বলা মানে সময় নষ্ট।

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। বসার ঘরে ফিরে এসে আমরা সেই মোড়া তিনটেতে বসলাম। পিসো সোফায় আধশোওয়া। কনটিকির গল্প আরম্ভ হল। ছ'জন দুঃসাহসী অভিযাত্রী ঠিক করল ভেলায় চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরোবে। পেরুর কালাও বন্দর থেকে সাড়ে চারহাজার মাইল সমুদ্র পেরিয়ে যাবে পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। বড়দা, ছোড়দা, বড়দি, ছোড়দিরা তখন খেতে বসেছে। বালসা গাছের লম্বা লম্বা গুঁড়ি লতার দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি হল ভেলা। নাম দেওয়া হল কনটিকি। ছ'জন বন্ধু, আর সঙ্গে তাদের পোষা টিয়াপাখি লোরিটা, ভেসে পড়ল সমুদ্রে। বড়দাদের খাওয়া হয়ে গিয়ে তখন মা, বড়পিসিদের খাওয়া চলছে। ভেলায় খবর আদানপ্রদানের জন্য একটা রেডিও সেট ছাড়া আর কোনও আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। কেননা, অভিযানের নেতা নরওয়ের থর হেয়ারডালকে প্রমাণ করতে হবে বহুকাল আগে এভাবেই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইনকারা ভেলায় করে সমুদ্র পেরিয়ে পলিনেশিয়ায় সভ্যতা বিস্তার করেছিল। হেয়ারডালের তত্ত্ব শুনে বিজ্ঞানী আর ঐতিহাসিকরা হেসেছিল, "যত সব পাগলের প্রলাপ। ইনকারা সমুদ্র পেরোবে কী করে? তারা তো জাহাজ বা নৌকো বানাতেই জানত না!" হেয়ারডাল বলল, "কেন? বালসা কাঠের ভেলায়?" বললেই তো হল না, প্রমাণ কোথায়? হেয়ারডালের রোখ চেপে গেল। তিনি আর তাঁর বন্ধুরা ঠিক করলেন নিজেরাই ভেলায় চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে প্রমাণ করে দেবেন যে ব্যাপারটা সম্ভব। খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই তখন শুয়ে পড়েছে। বসার ঘর ছাড়া অন্য সব ঘরের আলো নিভে গেছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে – সাড়ে এগারোটা, বারোটা ...। আর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে কনটিকি।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

suchipotro

আমাদের কল্যাণপুর গ্রামে ভূতের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। যেমন এক একটা রাজ্যে জনসংখ্যা কম হয়, আবার এক একটা রাজ্যে বেশি। তেমনি আমাদের গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেশি ছিল বলে আমাদের গ্রামের নাম হয়ে গিয়েছিল 'ভূতগ্রাম'। আমরা ছোটরা এর প্রকৃত কারণ জানতাম না। জানতে চাইওনি কোনও দিন। শুধু ভূতের ভয় পাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। সন্ধেবেলা পাশের ঘর থেকে বই আনতে গিয়ে অন্ধকারে জানালার গ্রিল ধরে ভূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম।বৃষ্টির সন্ধ্যেবেলা এক- একদিন রান্নাঘর থেকে তালের বড়ার গন্ধে যখন নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না, তখন বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘরে যেতে গিয়ে ভূতের মুখোমুখি হয়ে যেতাম। সন্ধ্যের মুখে মাঠ থেকে খেলার পর বাড়ি ফেরার পথ আগলে নিমতলায় অনেকবারই ভূতকে লম্বা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। এর পর আর দন্ডপাটদের পোড়ো বাড়িতে ঘটা করে ভূত দেখতে যাওয়া আমাদের সাহসে কুলোত না। আমরা কখনও সেরকম পরিকল্পনা নিইওনি কোনওদিন। ক্লাস সেভেনে উঠেই নাকি আমাদের পাড়ার নীলমাধব নিজের চোখে ভূত দেখে ফেলেছে দন্ডপাটদের পোড়ো বাড়িতে। আর আমরা এখানে ওখানে যত ভূত দেখেছি, সেসব নাকি মিথ্যে। সেগুলোর কোনওটাই নাকি ভূত নয়। কোনটা সত্যি

আর কোনটা মিথ্যে ভূত এই নিয়ে নীলমাধবের সঙ্গে আমাদের বিস্তর তর্ক হত। সে তর্ক এক একদিন রাগারাগিতেও গড়াত। পাচঁদিন একনাগাড়ে কথা বলাবলি পর্যন্ত বন্ধ থাকত।

কেউ- কেউ দন্ডপাটদের পোড়ো ভূত দেখতে যেত আমাবস্যা রাতে। কিন্তু নাকি পূর্ণিমা রাতে একা বিধুকাকাই ওখানে ভূত দেখতে যেত। যেসব ভূত দেখতে ভাল, তারা নাকি জ্যোৎস্না রাত ছাড়া বেরোয় না। এসব বিধুকাকার মুখ থেকে শোনা।

অনেকদিন আমরা বিধুকাকাকে দেখতে পাইনি। একলা মানুষ বিধুকাকার খোঁজ পেলে খোঁজ, না পেলে না। বড়দের কারও কিছু যায়- আসত না। তবে আমাদের কিন্তু বিধুকাকাকে না হলে চলত না। বিধুকাকা ছাড়া কে বা অমন করে আমাদের ভূতের গল্প বলবে?

আর সত্যি কথা বলতে, ভূতের গল্প সেই তো বলতে পারবে ভাল, যে নিজের চোখে ভূত দেখেছে। বড়রা বলেন, বিধুকাকার নাকি সারাজীবন ভূত নিয়েই কারবার। অনেকের মুখে- মুখে ফেরে, বিধুকাকার নাকি ভূত নিয়ে ঢালাও ব্যাবসা আছে। সত্যি কি মিথ্যে আমরা ছোটরা জানি না। তার হদিশ আমাদের পাওয়ার কথাও নয়। তবে তার ভূতের গল্প আমাদের কাছে ভীষণ প্রিয়।

সেদিন বিকেলবেলা হঠাৎ আমদের মাঠে বিধুকাকা এসে হাজির। আমরা হই হই করে ঘিরে ধরলাম বিধুকাকাকে। অনেকদিন পর খেলার মাঠে আমরা গোল হয়ে ভূতের প্রকার- প্রভেদের গল্প শুনছি বিধুকাকার মুখ থেকে। বিকেল পড়ো- পড়ো। তবু সেদিন খেলার দিকে কারও তেমন গরজ নেই।

বিধুকাকা বলল, "একদিন দন্ডপাটদের পোড়ো বাড়িতে জ্যোৎস্না রাতে একবার একটা রূপসী ভূতকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

আমরা তাজ্জব, ভূত আবার রূপসী হয় নাকি? অহীন্দ্র বলল "বিধুকাকা, ভূত দেখতে ভাল হয় বলে তো কখনও শুনিনি। তায় তুমি বলছ, রূপসী?"

বিধুকাকার কারণে অকারণে হেঁচকি উঠত। লোকে বলে, বিধুকাকা যখন বানিয়ে- বানিয়ে ভূতের গল্প বলে, তখনই নাকি বেশি- বেশি হেঁচকি ওঠে। খিঁচ করে একটা হেঁচকি উঠল বিধুকাকার। সেটা সামলে নিয়ে বিধুকাকা বলল, "কে বলেছে ভূত দেখতে খারাপ? কোনও ভূতই দেখতে খারাপ হয় নয়, এই আমি তোদের বলে রাখলাম। তো সে রূপসীই শুধু নয় রে, একেবারে যেন উর্বশী।"

আমরা কেউ কখনও উর্বশীকে দেখিনি। দেখবই বা কী করে? তিনি তো স্বর্গের মানুষ। আমরা তো কেউ কখনও স্বর্গে যাইনি। ঠাকুরমা একদিন বলেছিল, যে ভাল কাজ করে আর সব সময় সত্যি কথা বলে, একটাও মিথ্যে কথা বলে না, সে নাকি স্বর্গে যায়। আমি ঠাকুরমার মুখে একথা শুনে ঠিক করেছিলাম, চেষ্টা করব স্বর্গে যাওয়ার। কিন্তু এর মধ্যে দিদির কাছে পড়তে বসে হোমটাস্ক নিয়ে দু'দিন মিথ্যে কথা বলে ফেলেছি। সেই থেকে ও কাজ আমার দ্বারা যে হবে না, সে আমি স্থির ভাবে জেনে গেছি। এমনকি, যে অয়ন তার বাবা- মার সঙ্গে আজ হিল্লি- দিল্লি তো কাল টোকিও- হনলুলু ঘুরে বেড়ায়, সেও কখনও স্বর্গে বেড়াতে গেছে, বলেনি। দাদু একদিন মহাভারতের গল্প বলছিলেন। তখন বলেছিলেন, উর্বশী হলেন স্বর্গের একজন অপ্সরা। নারায়ণের উরু থেকে জন্ম হয়েছে বলে তাই তার নাম উর্বশী।"

উর্বশী যে দেখতে কতখানি সুন্দরী ছিলেন, দাদু সেকথা তো বলেননি। তাই আমরা আন্দাজ করতে পারলাম না, জ্যোৎস্না রাতে বিধুকাকার দেখা ভূতটা কতখানি রূপসী। তবে আমাদের পাড়ায় মনোহরজেঠুর মেয়ে শতুদ্রুদিদি খুব সুন্দরী। সকলে তাকে দেখে বলে অপ্সরার মতো দেখতে। সেরমই হবে হয়তো!

দেবাঞ্জন আমাদের মধ্যে বেশ সাহসী। সে ভূতকে ভূত বলে গ্রাহ্যই করে না। বলে, "ও সব মিথ্যে। মানুষের যত সব কল্পনা।" সে বলল, "বিধুকাকা, সেই রূপসী ভূতটা একটা ঝাঁকড়া গাছ থেকে শোঁ শোঁ করে তোমার সামনে নেমে এল তো? নাকি ভূতটা পোড়ো বাড়ির ছাদে তার লম্বা পা ঝুলিয়ে বসে ছিল?"

বিধুকাকা সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, তুই কখনও ভূতের পা দেখেছিস? বড়- বড় কথা বলছিস? ভুত যদি কলকাতার শহিদ মিনারে উঠে বসে, তাহলে তার পা চলে যায় হাওড়া ব্রিজের মাথায়, তা জানিস?"

দেবাঞ্জন অমনি দু'দিকে ঘাড় নেড়ে না বলল। ওর দেখাদেখি ঘাড় নেড়ে আমরাও না বললাম।

আমরা কল্যাণপুর গ্রামের ছেলে। কখনও কলকাতা যাইনি। শহিদ মিনারও দেখিনি। তবে হাওড়া ব্রিজের ছবি আমাদের এক্সারসাইজ খাতার পিছন দিকে আছে। দেখেছি। কিন্তু তা দিয়ে ভূতের পায়ের দৈর্ঘ্য আন্দাজ করা সিঁড়িভাঙা অঙ্কের চেয়েও কঠিন।

ভূত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দেখে খুশি হল বিধুকাকা। ফের একবার হেঁচকি উঠল তার। আমরা মনে- মনে ধরে নিলাম, এবার বিধুকাকা ভূত নিয়ে বানিয়ে- বানিয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলবে।

বিধুকাকা বলল, "সেই রূপসী ভূতটার জ্যোৎস্নার মত গায়ের রং। দুগগা প্রতিমার মতো মুখ। কি টানাটানা দুটো চোখ! গায়ে কত মণিমুক্তোর গয়না।"

আমি বললাম, "বিধুকাকা, তুমি যা বলছ, এ তো ঠাকুরমার মুখে শোনা রূপকথার গল্পের রাজকন্যে গো?"

বিধুকাকা একটু কেশে নিয়ে বলল, "রূপকথার রাজকন্যেকে কি কেউ কোনওদিন চোখে দেখেছে? তবে যে তুই বলছিস? ওসব যারা বই লেখে, তাদের মনের কথা। কিন্তু এই রূপসী ভূত আমার নিজের চোখে দেখা।"

দেবেশ বলল, "কাউকে ভূতে ধরলে, তুমি নাকি ভূত তাড়ানোরও মন্ত্র জানো?"

বিধুকাকা বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বলল, "ওরে, ভূতকে তাড়াব কেন রে? ভূত তো কখনও কারও ক্ষতি করেছে বলে তো শুনিনি। ভূত তাড়ানোর নয় রে, আমি ভূত- আবাহন মন্ত্র জানি।"

আমি বললাম, "বিধুকাকা, 'আবাহন' মানে তো ডাকা? তুমি ভূতকে ডাকতে পারো? মানে, তুমি ডাকলে ভূত চলে আসে? তাহলে সেই রূপসী ভূতটাকে একবার আনিয়ে আমদের দেখাও না।"

চোখ নাচিয়ে বিধুকাকা বলল, "তা আসে বইকি, খুব আসে। এই তো তিন মাস আমি ভূতগ্রামে ছিলাম না। আমি গিয়েছিলাম ভূতখালির চরে।"

দেবাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোথায় বিধুকাকা?"

বিধুকাকা দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, "সে কোথায়, বললে তোরা তার কি বুঝবি? তোদের তো আবার ভূগোলের জ্ঞান ভীষণ কম।"

দেবাঞ্জন বলল, "না বিধুকাকা, আমি এবার পরীক্ষায় ভূগোলে বিরাশি পেয়েছি।"

আমিও তো এবার ভূগোলে তেষট্টি পেয়েছি। বিরাশির চেয়ে কম বটে, তবে বাবা বলেছেন, ভূগোলে আমার জ্ঞান নাকি খারাপ নয়। তবু চুপ করে রইলাম আমি।

বিধুকাকা বলল, "ভূতখালির চর যেতে হয় পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে ঝাড়খণ্ড, তারপর উত্তরাখণ্ড পেরিয়ে তিনটে বড় বড় বন, ছোট- বড় পাঁচটা নদী পেরিয়ে একটা গলাখাঁকারির মাঠ পেরিয়ে তবে ভূতখালির চর। সেখানে যেতে হলে প্রাণ বেরিয়ে যায়।"

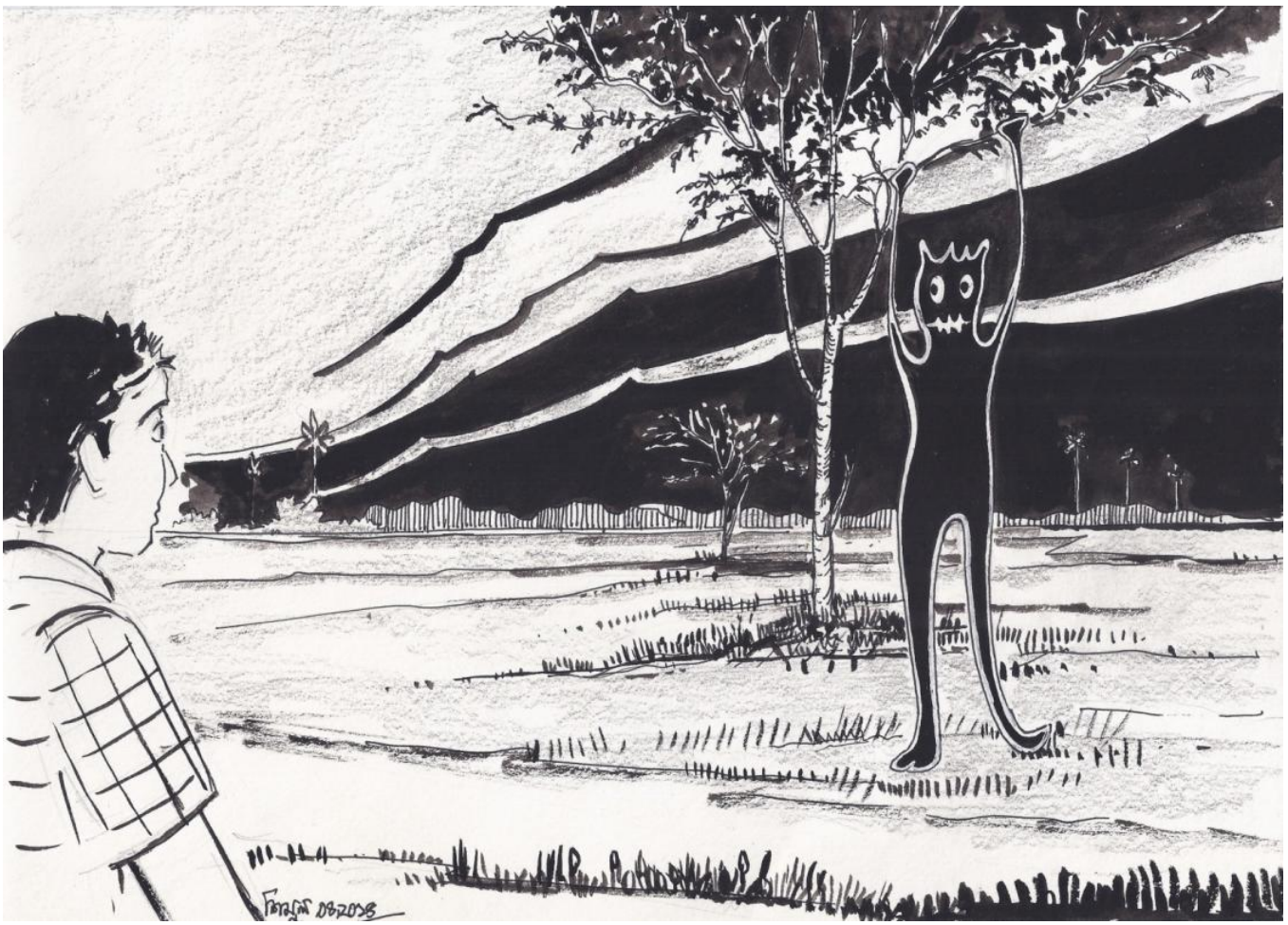

আমি বললাম, “তবে অত কষ্ট করে তুমি সেখানে গেলে কেন? কোনও জরুরি কাজ ছিল কি?”

“খবর পেলাম, সেখানে ভূতেরা নাকি মহা সমস্যায় পড়েছে। ভূতেদের কোনও সমস্যা শুনলে আমি তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না।”

দেবেশ জিজ্ঞেস করল, “কী সমস্যা বিধুকাকা?”

“তারা আমাদের ভূতগ্রামে চলে আসতে চায়। সেখানে নাকি তাদের থাকতে মন আর চাইছে না।”

আমি বললাম, “সে কি গো বিধুকাকা? এমনি তো আমদের গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূতের সংখ্যা নাকি বেশি। তার উপর আরও ভূত এলে তখন তো গ্রামে থাকাই দায় হবে?”

দেবাঞ্জন বলল, “তুমি কী করলে বিধুকাকা?”

বিধুকাকা বলল, “এর আগে আর একবার সুমন্তপুরের ভূতরা আবদার জুড়ল, তারা সব আমাদের গ্রামে চলে আসবে। আমি দিলাম ব্যবস্থা করে। তাই তো আমাদের গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেড়ে গেল।”

আমি বললাম,”তাই তো আমরা অত ভূতের ভয় পাই। আমদের গ্রামে তাদের আসতে দাওনি তো?”

বিধুকাকা ঘাড় দুলিয়ে বলল, “তা অবশ্য দিইনি।”

আজ যে পূর্ণিমা সে কথা আমরা জানতামই না। গল্পে গল্পে কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এসেছে। হঠাৎ দেখলাম, পূব আকাশ জুড়ে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে।

দেবেশ বলল, “ওই দ্যাখো বিধুকাকা, আজ কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ একবার তোমার রূপসী ভূতকে আনো না, আমরা দেখি। তুমি তো বললে, তুমি ডাকলে নাকি ভূত আসে।”

আমি বললাম, “হাঁ বিধুকাকা, তোমার সেই ভূত- আবাহন মন্ত্রটা বলো না। আমরা আজ একবার অন্তত রূপসী ভূতকে দেখতে চাই।”

লোকে যেমন মাঝে- মাঝে নিরুপায় হয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে যায়, এখন বিধুকাকার মুখটা দেখে আমার সেরকমই মনে হল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিধুকাকা বলল, “না, এখন রূপসী ভূতের হাতে অনেক কাজ। সে এখন আসতে পারবে বলে তো মনে হয় না। তবে তোরা যখন সত্যি রূপসী ভূতকে দেখতে চাইছিস, তখন দেখি চেষ্টা করে। তোরা ভয় পাবি না তো?”

দেবাঞ্জন বলল, “না, ভয় পাব না।”

আমি আর দেবেশ চুপ করে গেলাম। এখন মনে হচ্ছে, অনেক মানুষই তো আইফেল টাওয়ার দেখেনি, স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখেনি। টেমস নদীর সেতু দেখেনি, মানস সরোবরে ব্রহ্মকমল দেখেনি। ভূত না দেখলে কি এমন ক্ষতি হবে জীবনে? অনেক মানুষই তো কখনও ভূত দেখেনি। তবে তাদেরই বা জীবন আটকে যাচ্ছে কোথায়? এমন সময় মাঠের পাশের নিমগাছে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো একটা ঝড় উঠল বলে মনে হল। আর কোথাও কিছু নেই। যেন সাইক্লোন এসে ভর করেছে ওই নিমগাছটায়।

আমরা আরও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম সকলে। একটা বাদুড় নিমগাছটা থেকে প্রাণের ভয়ে উড়ে পালাল বলে মনে হল।

তক্ষুনি ওই নিমগাছের মগডালে এক লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ যেন ভিড় করল। গোটা চরাচর যেন জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। নিমগাছের উপর থেকে কেউ যেন বলে উঠল, “তোমাকে যে এতদিন দেখা দিয়ে এলাম, এত কথা শিখিয়ে এলাম, তার কিচ্ছু কি মনে রাখোনি? একটা ভূত কখনও আর একটা ভূতের সামনে হাজির হয় না, একথা কি মনে নেই? তবে খামোখা ডেকে আনলে কেন?”

তক্ষুনি একটা জোর ধুলোঘূর্ণি উঠল আমাদের সামনে। আর আমাদের কিচ্ছু মনে নেই। সেদিন আমাদের বাড়ির লোক অনেকটা রাতে মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তিনজনকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। আজও আমরা কেউ মনে করতে পারি না, অত পূর্ণিমার চাঁদ আর অমন ধুলোঘূর্ণির পর কী ঘটেছিল সেদিন।

ছবিঃ শিমুল

suchipotro

সত্যজিৎ দাশগুপ্ত

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে অবিশ্রান্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে লোকনাথদাদুর গাড়িটা এসে দাঁড়াল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে। শ্যামবাজার, বাগবাজার থেকে শুরু করে গড়পার, রাজাবাজার, মানিকতলা, শিয়ালদা, কলেজস্ট্রীট, আরমহাস্ট্রীট, কোনকিছুই বাকি রাখেনি ওরা। ওরা মানে, লোকনাথদাদু নিজে তো বটেই, ওনার সাথে কিডো, দ্যুতি, রায়ান আর রিবাইরা। বহুদিন ধরেই ওরা লোকনাথদাদুর মুখে উত্তর কলকাতার গল্প শুনে আসছিল। কিন্তু তেমন ভাবে ওদের কারুরই উত্তর বা মধ্য কলকাতা ঘোরার অভিজ্ঞতা হয়নি। লোকনাথদাদু তো বলেন, উত্তর আর মধ্য কলকাতাতেই নাকি পাওয়া যায় আসল কলকাতার গন্ধ। ঘুরতে ঘুরতে এখানকার পুরোনো বাড়িগুলো দেখতে দেখতে সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল কিডোর। রাস্তায় যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, এখানেই একসময় বুক চিতিয়ে রাজত্ব করে গেছেন স্বামীজী থেকে শুরু করে নেতাজী। কলকাতার এই অংশেই জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ। কিছু দূরেই কলকাতার শেষ প্রান্ত দক্ষিণেশ্বর। সেখানেই থাকতেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এর মধ্যে কিডো তো একবার কল্পনার চোখে দেখেই ফেলল, কম করে প্রায় একশ ইংরেজ সৈন্য ভারী বুট জুতো পায়ে বন্দুক হাতে গট গট করে ওদের গাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল! তাতে একবারের জন্য যদিও ও ভয়ে গাড়ির ভেতর সিঁটিয়ে গেছিল, কিন্তু শেষে যখন বুঝতে পারল এটা শুধু ওর কল্পনামাত্র, তখন এমনভাবে গাঝাড়া দিয়ে উঠল, যেন সামনে পেলে ও একাই ইংরেজদের সাবার করে দিত!

"এবার আমরা কোথায় যাব দাদু?" জিজ্ঞাসা করল কিডো।

"লালবাজার," বললেন লোকনাথদাদু।

ড্রাইভার এবার গাড়িটা ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ঢোকাল। তখন লোকনাথদাদু বললেন, "আমরা এবার সেন্ট্রাল এভিনিউতে বা সি আর এভিনিউতে উঠব। এই রাস্তাটা হয়েছিল সি আর দাশের মানে চিত্তঞ্জন দাশের নাম অনুসারে।"

কিডোরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তুলনা মূলক ভাবে সেই রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। লোকজনের আনাগোনাও প্রায় হাতে গোনা। লোকনাথদাদু যেন একেবারে শিশু হয়ে গেছেন উত্তর কলকাতায় এসে। বারবার বলছেন, "শৈশবটা ফিরে পেয়েছি দাদুভাইরা!"

কিডোরাও গাড়ির ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। এমন সময় একটা লাইট পোস্টের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন লোকনাথদাদু। এবার ধীরে ধীরে গাড়ি

থেকে নামলেন। পেছন পেছন নামল কিডোরাও। আস্তে আস্তে লাইটপোস্টটার কাছে গিয়ে সেটা ছুঁলেন লোকনাথদাদু। তারপর সামনের বাড়িটার একতলার মাথায় একটা সিমেন্টের ছাউনি দেখে আপনমনে বলে উঠলেন, "এখনো আছে!" আর তারপরই হো হো করে হেসে উঠলেন উনি।

কিডোরা তখন লোকনাথদাদুর অবস্থা দেখে অবাক। ব্যাপারটা কী? দাদু ওভাবে হাসছে কেন? কী আছে লাইটপোস্টটাতে? নাকি দাদু ওই ছাউনিটা দেখে হাসছে? অবাক হয়ে ওরা তখন একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করল।

লোকনাথদাদু এবার ঘুরে দাঁড়ালেন। মনে হয় ওদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "এই রাস্তায় যতবার আসি, ততবার মনে পড়ে যায় আমার সেই ঘটনাটা। তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না। পাগলের মত হেসে উঠি।"

"কোন ঘটনা?" এই প্রথম প্রশ্ন করার সুযোগ পেল কিডো।

"সে বলতে গেলে তো পুরো ঘটনাই বলতে হয় দাদুভাইরা।"

গল্প! কথাটা শুনে আবার একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করল কিডোরা।

"শুনবে?"

লোকনাথদাদুর প্রশ্নে সবাই প্রায় একসাথে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকাল। দেখে লোকনাথদাদু হেসে বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে তো গল্প হবে না। চল তবে কলেজ স্কোয়ার। জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

হৈ হৈ করতে করতে ওরা এবার এসে হাজির হল কলেজ স্কোয়ার। লম্বা একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল সবাই। পাশে ঘুরতে থাকা চা ওয়ালার থেকে এক কাপ চা নিয়ে এবার গল্প বলতে শুরু করলেন লোকনাথদাদু —

"বহুদিন আগের কথা। বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে তিনটে তারা তখন জ্বলজ্বল করছে — সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন আর ঋত্তিক ঘটক। ওদিকে কমার্শিয়াল সিনেমাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন উত্তম কুমার আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

"বিশা মানে আমাদের বিশ্বনাথ ছিল একজন সিনেমা পাগল মানুষ। তবে আদতে ও সিনেমার জন্য যতটা না পাগল ছিল, তার থেকে বেশি ছিল ওর সিনেমার জন্য পাগল হওয়ার দেখনদারি। ওর ধারণা ছিল, সিনেমার জ্ঞান ওর অসাধারণ। নিজেকে দাবি করত চিত্রনাট্যকার হিসেবে। ওর বক্তব্য ছিল, ওর মত চিত্রনাট্যকার নাকি বাংলাদেশে কমই জন্মেছিলেন! একবার তো ঘনিষ্ঠ মহলে এও বলেছিল যে, হীরক রাজার দেশের চিত্রনাট্য যদি ওকে দিয়ে লেখানো হত, তবে তার গুনগত মান আরও উন্নত হত! যেখানে সেখানে যাকে তাকে ধরে নিজের লেখা গল্প শোনাত বিশা। শেষে গল্প শোনার ভয়ে লোকে ওকে দেখলেই পালিয়ে যেত! এক কথায় লোকের কাছে ও হয়ে উঠেছিল একটা আতঙ্ক।

"এমনই একদিন ঘুরতে ঘুরতে বিশা চলে এসেছিল কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ অন্ধকার। ঘন কালো মেঘে ছেয়ে ছিল চারিদিক। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল ঘন ঘন। তার সাথে বুক কাঁপানো গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। হাঁটতে হাঁটতে এর মধ্যে ইউনিভার্সিটির পাশের রাস্তা মানে প্যারী সরকার রোডে রোডে চলে এল বিশা। ঠিক এই সময় হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল।

এমনিতেই রাস্তাটাতে লোকজন কম। তার ওপর আবার বৃষ্টি নেমে যাওয়াতে রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেছে। শেষে উপায় না দেখে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে দৌড় লাগাল। দৌড়োতে দৌড়োতে একটা বিশাল বাড়ির এর সানশেডের তলায় এসে দাঁড়াল। তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। পুরো রাস্তাটাতে একটাও লোক নেই। এমন সময় বিশার নজর গেল পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বয়স্ক লোকের ওপর। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা পাকা চুল। গায়ের রং ধপধপে সাদা। বয়স আন্দাজ ষাট ছুঁই ছুঁই। অদ্ভুত সুন্দর ব্যক্তিত্বে ভরপুর ছিলেন এই ভদ্রলোক। বার দুয়েক চোখাচোখি হতে প্রতিবারই মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক।

"এর মধ্যে কেটে গেছে আরও পনেরো মিনিট। ভদ্রলোকের সাথে বিশার দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ থেকে প্রায় এক হাতে। এদিকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। অনেকক্ষণ ধরেই বিশা ভাবছিল ভদ্রলোকের সাথে কথা বলবে কি না। শেষে দোনোমনা করতে করতে কথা বলেই ফেলল বিশা।

"এ বৃষ্টি কমবে বলে মনে হয় না।"

"যা বলেছেন," মুচকি হেসে বললেন ভদ্রলোক।

"কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আর ভাল লাগছে না।" কথা এগোনোর চেষ্টা করল বিশা।

"হুঁ," ছোট্ট করে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

"এবার থামলে বাঁচি।"

“এবার আর বিশার কথার কোন উত্তর করলেন না ভদ্রলোক। বিশা তখন বলল, ‘হাতে এত কাজ, এর গুরুত্ব কে বুঝবে?’ তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘ওঃ, বৃষ্টি তো হয়েই চলেছে, কখন যে বাড়ি যাব, কাজ নিয়ে বসব!’

“ভদ্রলোক হয়ত এবার বুঝতে পারলেন যে বিশা ওনাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলছে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কী কাজ কর?’ বলেই জিভ কেটে বললেন, ‘এই রে! তুমি বলে ফেললাম!’

“বিশা এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বলল, ‘না না, আপনি আমার থেকে বয়সে বড়। যা খুশি ডাকতে পারেন।’ তারপর এক মুহূর্ত থেমে বলল, ‘একচুয়ালি, আই অ্যাম আ রাইটার।’

“ ‘রাইটার!’ বিশার কথা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ভদ্রলোকের।

“বিশা তখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘স্ক্রিপ্ট এর ব্যাপারে কোনও আইডিয়া আছে?’

“ ‘স্ক্রিপ্ট?’ মনে হল কথাটা প্রথমবার শুনলেন ভদ্রলোক।

“বিশা এবার ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ‘আই মিন স্ক্রিপ্ট, চিত্রনাট্য — মানে যেমন ড্রামা স্ক্রিপ্ট।’

“ভদ্রলোক তখন বললেন, ‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ, জিনিসটা শুনেছি বটে। মানে যাঁরা নাটক লেখেন আরকি।’

“ ‘কারেক্ট!’ ভদ্রলোকের নাকের সামনে একটা তুড়ি মেরে বিশা বলল, ‘তবে আমি নাটক নয়, সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখি।’

“‘ও বাবা!’ চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোক বললেন, ‘তুমি সিনেমা লেখ?’

“ ‘ওহ নো,’ বিশা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘সিনেমা লিখি না, স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্ক্রিপ্ট।’

“এবার মাথাটা দুবার সামনেরর দিকে ঝুঁকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘আচ্ছা, স্ক্রিপ্ট।’

“ওঁর কথা শুনেই বিশা বুঝতে পারল, ব্যাপারটা এখনো ওঁর কাছে পরিষ্কার নয়। তাই ও ফের ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ‘দেখুন, পরিচালক তো শুটিং করেন। কিন্তু পর্দায় কী দেখানো হবে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা কী কথা বলবেন, তা তো আগে থেকে লিখতে হবে, আমি সেইগুলোই লিখে দিই।’

“ ‘ও — বুঝলাম। তার মানে তোমার লেখা অনুসারে সেগুলো সিনেমায় দেখানো হয়?’

“ ‘এই তো বুঝেছেন! গ্রেট!’ বলল বিশা।

“ ‘বাবা!’ ভদ্রলোক তখন চোখ বড় বড় করে বললেন, ‘তুমি তো তাহলে নামকরা লোক হে!’

“ ‘ওই আর কী।’ লজ্জা পাওয়ার ভান করে বিশা বলল, ‘লোকে আমার লেখা ভালবাসে, এই আমার জন্য ঢের। কত ফ্যান মেইল পাই জানেন? আজ পর্যন্ত আমার লেখা বেশিরভাগ ছবিই হিট।’

“ ‘তুমি বুঝি অনেক ছবি লিখেছ?’ জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

“ ‘অনেক মানে?’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিশা বলল, ‘আজ পর্যন্ত তেত্রিশটা সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখেছি স্যার। এবার রাজ কাপুরের জন্য কাজের অফার এসেছে।’

“ ‘রাজ কাপুর?’ ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বললেন, ‘কিন্তু উনি তো নিজের স্ক্রিপ্ট নিজেই লেখেন বলে শুনেছি!’

“ ‘হ্যাঁ লেখেন,’ আমতা আমতা করে বিশা বলল, ‘কিন্তু ইয়ে মানে, ওনার প্রোডাকশান হাউসের জন্য আরকি। উনি বলেন, আমার লেখায় নাকি আলাদা একটা ফ্লেভার আছে। আর হ্যাঁ, যশ চোপরাও আমাকে নিয়ে কাজ করবেন বলেছেন।’

“ভদ্রলোক তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি বাংলা ছবিতে কাজ কর না?’

“বিশা উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘ওহ নো, আই ডোন্ট লাইক বাংলা ছবি। লেট মি টেল ইউ, আমার টার্গেট হলিউড। তবে গোটা পাঁচেক বাংলা ছবিতে কাজ করেছি বটে। উইথ অল রিনাউনড পরিচালকস্।’

“ ‘তাই নাকি? ওরে বাবা!’ আবার চমকালেন ভদ্রলোক।

“ ‘হুঁ, সবক’টা ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেটেড হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটে তো জিতেওছিল।’

“কথাগুলো শুনে ভদ্রলোক প্রায় নাচতে লাগলেন— ‘আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি এমন একজন লোকের সাথে দাঁড়িয়ে আছি!’

“ ‘তবে আমি যে কোন পরিচালকের সাথে কাজ করি না। আপনি চিরদীপ দাশগুপ্তের নাম শুনেছেন?’

“ ‘হ্যাঁ,’ বিশার প্রশ্নে ঘাড় কাত করলেন ভদ্রলোক।

“ ‘আমি ওর সাথে তিনটে ছবিতে কাজ করেছি। তার মধ্যে দুটো জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ও তো আমার লেখা দেখে একেবারে অভি — অভি — কী যেন কথাটা?’

“ ‘অভিভূত।’

“ ‘রাইট!’ তুড়ি মেরে বিশা বলল, ‘ওটাই হয়েছিল।’

“ ‘বাব্বাঃ! ওনার সাথেও তোমার পরিচয় আছে?’

“ ‘পরিচয় মানে?’ প্রশ্নটা শুনে যেন একবারে আকাশ থেকে পড়ল বিশা। বলল, ‘কোন শট কেমন করে নেওয়া উচিৎ, তা জানতে ও তো মাঝে মাঝে আমাকে ফোনও করে। আসলে বাচ্চা ছেলে তো। আস্তে আস্তে শিখছে।’

“ ‘বাচ্চা ছেলে! কিন্তু আমি তো শুনেছি ওনার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন!’

“ ‘আরে এই লাইনে তো বাচ্চা! অন্তত আমার কাছে।’

“ভদ্রলোক অবাক হয়ে বিশার কথা শুনতে থাকেন। বিশা বলতে থাকল, ‘তবে ছেলেটা, মানে লোকটা কাজ জানে। আই অ্যাম ইম্প্রেসড উইথ হিজ ওয়ার্ক। ও তো বলে যে, আমার চিত্রনাট্যের জন্যই ও জাতীয় পুরস্কারগুলো জিততে পেরেছিল। তাই তো ও আমাকে ওর পরের ছবির জন্যও লিখতে বলেছে।’

“ ‘তুমি লিখবে?’ জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

“ ‘দেখি, টাইম পেলে তো। বললাম না যশ চোপরার জন্যও লিখতে হবে।’

“ ‘খুব ভাল,’ ভদ্রলোক এবার বিশার পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘চালিয়ে যাও। এমন একজনের সাথে পরিচয় হয়েও ভাল লাগছে।’

“কথা বলতে বলতে তখন বৃষ্টিও থেমে গেছে। ভদ্রলোক এবার আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, ‘এই দেখো, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে বৃষ্টি থেমে গেছে।’ সেই সময় একটা দুধসাদা ফিয়াট গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। তা দেখে ভদ্রলোক বললেন, ‘ওহ, আমার গাড়িটাও এসে গেছে।’

“চোখের সামনে এমন একটা ঝাঁ চকচকে গাড়ি দেখে বিশার তখন ভিরমি খাবার যোগার। আচমকাই ও বলে উঠল, ‘বাপরে, কি দারুণ গাড়ি!’

“তা শুনে ভদ্রলোক বললেন, ‘কিছু বললে?’

“ ‘না না কিছু না।’ কোনরকমে সামলে নিল বিশা।

“ভদ্রলোক তখন বললেন, ‘তোমার সাথে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। তোমার কোন কার্ড বা কিছু —’

“ ‘ওহ সিওর,’ বিশা সাথে সাথে নিজের কার্ডটা বের করে ভদ্রলোককে দিল। উনি সেটা দেখে নিয়ে পকেটে রাখলেন। তারপর নিজেরটা বিশাকে দিলেন। বিশা সেটা সটান বুক পকেটে পুরল। ভদ্রলোক এবার গাড়িতে উঠলেন। বিশা তখনো হাঁ করে ওঁর গাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এবার গাড়ি স্টার্ট নিয়ে কয়েক গজ এগোতে বিশা চেঁচিয়ে উঠল, ‘কেউ সিনেমা বানাতে চাইছে বলে দেখলে আমার কথা বলবেন, কনফারমড ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড।’

“গাড়িটা এবার সামনে তিন রাস্তার মোড়টা দিয়ে ডানদিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল বিশা। এবার হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল ওর। আচমকাই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল। ঝট করে এবার বুক পকেট থেকে ভদ্রলোকের দেওয়া কার্ডটা বের করল। ভাল করে সেটা দেখতে দেখতে চোখজোড়া আটকে গেল কার্ডটার ওপর। অজান্তেই মুখটা হাঁ হয়ে গেল। যেন নিঃশ্বাসও নিতে ভুলে গেছিল ও। কার্ডে লেখা নামটা দেখে নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না বিশা —

মিঃ চিরদীপ দাশগুপ্ত
ডাইরেক্টর — বেঙ্গল ফিল্ম এন্ড সিনে মিডিয়া
টালিগঞ্জ। কলকাতা।”

গল্পটা শেষ করেই আবার হো হো করে হাসতে শুরু করলেন লোকনাথদাদু। সাথে সাথে হাসতে শুরু করল কিডোরাও। এক মধ্যে একটা বাদামওয়ালা সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তার থেকে পাঁচ ঠোঙা বাদাম কিনে একটা নিজে রেখে বাকিগুলো একে একে কিডো, দ্যুতি, রিবাই আর রায়ানকে দিয়ে নিজের প্যাকেটটা থেকে একটা বাদাম টুক করে মুখে পুরে লোকনাথদাদু বললেন, কলেজ স্ট্রিটে বসে আড্ডা মারব, আর বাদাম খাব না, এ কখনো হতে পারে!!

ছবিঃ শিমুল

suchipotro

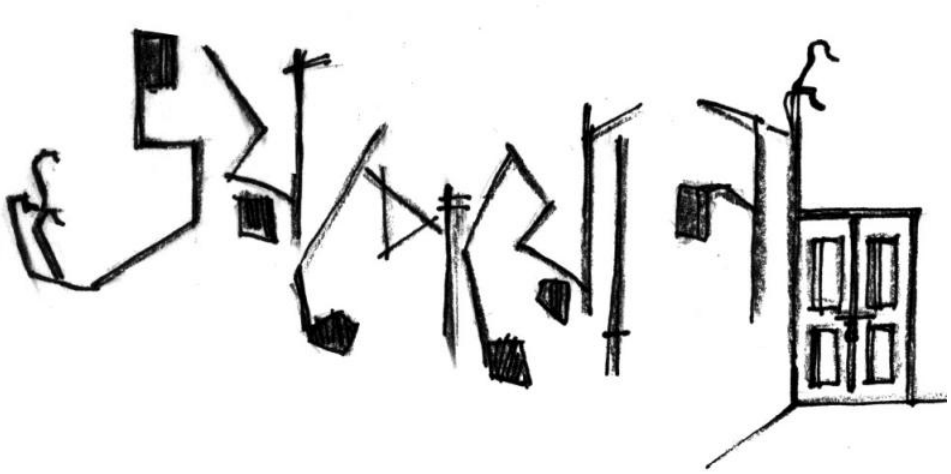

দিলীপ ঘোষ

এই সময়টার জন্যই অয়ন অপেক্ষা করে থাকে সারাটা বছর, কারণ এই শীতের ছুটিতেই ওরা সবাই, অর্থাৎ অয়ন আর ওর বাবা, মা বেরিয়ে পড়ে দেশভ্রমণে। এত অল্প বয়সেই অয়নের দেখা হয়ে গেছে দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য, অভিজ্ঞতা হয়েছে উটের পিঠে চড়ে রাজস্থানের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর, আন্দামানের সমুদ্রে গ্লাস বটম বোটে চড়ে জীবন্ত প্রবাল দেখার, মুসুরিতে রোপওয়ে থেকে রোমাঞ্চকর পাহাড়ের দৃশ্য দেখার, কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ টিলা ইত্যাদি আরও অনেক কিছু দেখার। তাই এবছর ওর বাবা-মা ভেবেছেন যে আর কোন ট্যুরিস্ট প্লেস নয়, এবার নিরিবিলি কোন জায়গায় গিয়ে স্রেফ ছুটি কাটাবেন।

অয়নের ছোটপিসি গত কয়েকবছর ধরেই ওদেরকে মধুপুরের বাড়িতে যাবার জন্য বলে আসছেন, কিন্তু অয়নের বাবা এতদিন কোন আগ্রহই দেখান নি। তবে গতবার অয়নের পিসেমশাইয়ের মুখে ওদের মধুপুরের বাড়ির কিছু ভূতের গল্প শোনার পর থেকে বেশ একটা কৌতূহল জেগেছে। মধুপুরে যাবার প্রস্তাবটা প্রথমে বাবার কাছে থেকেই আসে। যদিও অয়নের এবার ইচ্ছে ছিল কোন জঙ্গলে যাবার, কিন্তু এই সুযোগটাও তো ছাড়ার মত নয়। ছোট থেকেই অয়নের ভূতের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ। বাবার কাছে গল্প শুনতে চাইলেই, বাবা নানারকম ভূতুড়ে গল্প বলে শোনাতেন। গল্প শুনতে শুনতে শুরু হয়ে যেত অয়নের হাজারো প্রশ্ন, ভূতটার ক'টা হাত-পা ছিল? ঘাড়ে মাথা ছিল কিনা? জামাকাপড় কি পরেছিল? হেঁটে এসেছিল না উড়ে? একসময় বাবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন, "ধুর, আমি কি আর দেখেছি নাকি, সবই তো লোকমুখে শোনা। আসলে ওসব ভূতপ্রেত বলে কিছুই নেই, সব ধাপ্পাবাজি।"

বাবা রাজি হলে কি হবে, অয়নের মা কিন্তু বেঁকে বসেছেন, কারণ মা সাংঘাতিক ভয় পান ভূতকে। নাম শুনলেই চোখ বন্ধ করে রামনাম শুরু হয়ে যায়। গত একমাস ধরে অয়ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মা'কে রাজি করানোর, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন আশার আলো দেখা যায় নি। তাই আজ বাবার সাথে কথা বলে ঠিক করেছে যে দু'জনে মিলে মাকে বুঝিয়ে রাজি করাবেই।

বাবা কথাটা শুরু করেন, "শুনছো, এবছর বেড়াতে যাবার তো কিছুই ঠিক করা হল না। এরপর তো আর ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাবে না।"

কিন্তু মা'র সেই একই কথা, "আমি বাপু মধুপুরে ওই ভূতের বাড়িতে যেতে পারবোনা। যা সব অলৌকিক গল্প শুনেছি ওই বাড়ির, ওখানে গেলে আর আমাকে বেঁচে ফিরতে হবে না। এই তো সেদিন টিভিতে ফিয়ার ফাইলসে দেখছিলাম ভূতটা বাড়ির বাচ্চা মেয়েটার ঘাড়ে চেপে সারা বাড়ির লোককে এমন ভয় দেখাল যে শেষে পালাতে গিয়ে সবাই মিলে পুকুরে ঝাঁপ দিল। না বাবা, আমি কিছুতেই যাব না ওখানে।"

মা'র কথা শুনে বাবা অট্টহাস্য জুড়ে দিয়ে বলেন, "আরে বাবা, ভূত বলে কিছু নেই। ভূত হচ্ছে আসলে মানুষের এক অদ্ভুত কল্পনা। মানুষের ঘাড়ে ভূত নয়, ভয় চাপে আর সেটাই মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়। তুমি যদি ভয়কে জয় করতে পার, তাহলেই বুঝতে পারবে যে ভূত প্রেত গল্প আসলে বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।" অয়নও বাবার সাথে সমান তালে বুঝিয়ে চলে যে ভূত হচ্ছে আসলে গল্প কথা। এখনও পর্যন্ত ও যত দেশি ও বিদেশি ভূতের বই পড়েছে তার কিছুই তার বিশ্বাস হয় নি।

শেষ অবধি ওদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে, বহু চেষ্টার পর মাকে রাজি করানো গেছে। ট্রেনের টিকিট, নিজেদের জন্য শীতের জামাকাপড়, পিসিদের জন্য উপহার সব কিছুই কেনা হয়েছে। শুধু সুটকেস গোছানোটা শেষ মুহূর্তের জন্য রাখা আছে। পিসেমশাই জানিয়ে দিয়েছেন উনি ছেলে লাল্টুকে নিয়ে স্টেশনে আসবেন। এখন শুধু দিন গোনা।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়ে যাবার দিন এল। রাত্রের ট্রেনে যাত্রা। ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে সকাল থেকেই গোছানো শুরু করে দিয়েছে নিজের জিনিস। জামা প্যান্ট জুতো ছাড়াও গত বছর জন্মদিনে বাবার দেওয়া ভালো ভিডিও ক্যামেরা, ক্যামেরা স্ট্যান্ড, একটা দূরবীন, বন্দুক, গুলতি ইত্যাদি। যদিও এখন পর্যন্ত ভূতে কোনও বিশ্বাস নেই অয়নের, তবে যদি সত্যি তেমন কোন অস্তিত্ব থাকে তবে দূরবীনটা ওকে সাহায্য করবে ভূত অনুসন্ধানে আর ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ভূতের গতিবিধি রেকর্ড করে নেবে। এছাড়া বন্দুক, গুলতি, লাঠি ইত্যাদি আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। আসলে প্রকাশ্যে এতদিন যতই সাহস দেখিয়ে থাক, এবার কিন্তু একটু একটু করে মনের মধ্যে ভয় জমা হতে শুরু করেছে।

সাতসকালে ট্রেন পৌঁছোল মধুপুর। পিসেমশাই স্টেশনে ছিলেন। বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরেই সকলে বেড়িয়ে পড়ল ঘুরতে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে গ্রামের ছবি দেখবে। তাই এবার আর গাড়ি নয়, ওরা সবাই চড়ে বসেছে বড় একটা সাইকেল ভ্যানে। শহর ছেড়ে যতই দূরে এগিয়ে চলেছে, ততই ছবিটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সরু পিচের রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ ধানখেত, দূরে দেখা যায় চাষিরা আপন মনে চাষের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় না আছে গাড়ি, না আছে কান ফাটানো হর্ন বা ধোঁয়ার অত্যাচার। মাঝে মধ্যে দু'একটা সাইকেলের আনাগোনা অথবা খড় বোঝাই গরুর গাড়ির যাতায়াত। কোথাও ছোট্ট ঘরগুলোর সামনে বসে মেয়েদের রোদ পোয়ানো, আবার কোথাও হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চাদের ছুটোছুটি করে

খেলে বেড়ানো। দু'ধারে যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ এলাকা শুধু সবুজে ভরা, আর মাথার ওপরে ঘন নীলাকাশ। আগে কখনো দূরকে এতো কাছ থেকে দেখেনি অয়ন, আর আকাশ যে এতো সুবিশাল তাও ধারণা ছিল না ওর। মনে হচ্ছে সবুজ কার্পেটে বিছানো জমির ওপর মস্ত এক নীল সামিয়ানা। এ যেন এক অন্য জগত, যার সাথে কোন মিলই খুঁজে পায় না ওর নিজের শহর কলকাতার, যেখানে মানুষ সারাদিন ছুটে বেড়ায় ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে, আর সারাটা দিন কাটে চার দেওয়ালের মধ্যে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার সাথে সাথে উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেশ খানিক ঘোরবার পর পিসেমশাই বলে ওঠেন, "অনেক ঘোরা হল, এবার বাড়ি ফেরা দরকার। আজ মনে হচ্ছে বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। বাড়ি গিয়ে আজ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে। রোদ ঝলমল সকালে সবুজ গাছে ঘেরা বাড়িটা যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখাচ্ছিল, এখন চাঁদের আলোয় সেটা কেমন যেন ম্লান লাগছে। উঁচু উঁচু গাছের ছায়ায় একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সাথে দূর থেকে ভেসে আসা শেয়ালের ডাকে যেন গা ছমছম করা ভাব।

বাড়ি ঢুকে পিসেমশাই বললেন, "সকালে তো তাড়াহুড়োয় আমাদের বাড়িটা তোমাদের দেখানই হয়নি। এইটা আমাদের শোয়ার ঘর আর পাশেরটা লাল্টুর। এই ক'দিন লাল্টু আমাদের ঘরে শোবে, আর তোমরা ওই লাল্টুর ঘরে থাকবে। ওদিকের সিঁড়িটা ছাদে ওঠার, আর এটা হচ্ছে আমাদের বসার ঘর। এখানেই আমাদের বেশির ভাগ সময়টা কেটে যায়, গল্প করে, কাগজ পড়ে অথবা টিভি দেখে।"

উল্টোদিকের দালানটার দিকে চেয়ে অয়ন বলে, "ওইদিকে কী আছে?"

পিসে একটু আমতা আমতা করে বললেন, "ওইদিকে আর একটা ঘর আছে, তবে ওটা বন্ধই থাকে।"

শোনামাত্রই অয়নের কৌতূহলটা অনেকগুণ বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কেন বন্ধ থাকে কেন? আমরা এখন গিয়ে দেখতে পারি?"

পিসে বললেন, "সে অনেক কথা। জমিয়ে না বসলে সেসব গল্প করা যাবে না। তবে ভয় পেলে কিন্তু বলবো না। তোর মা তো ভুতের নাম শুনলেই ভয়ে আধখানা।"

অয়ন সগর্বে জানিয়ে দেয় যে ভূতপ্রেতে ওর কোন ভয় নেই, বরং এইসব অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করতেই ও ভালোবাসে। এক এক করে সবাই বসার ঘরের সোফা সেটে গোল করে ঘিরে বসেছে। ঠাণ্ডাটা ক্রমশ জেঁকে বসছে, তাই সবাই একটা করে মোটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। পিসেমশাই বললেন, "শুনছো, বেশ কড়া করে চা বানাও আর রামুকে বল ভোলার দোকান থেকে গরম গরম সিঙাড়া আর আলুর চপ নিয়ে আসতে। গরম ভাজিয়ে আনে যেন। মনে হচ্ছে আজ সবথেকে বেশি ঠাণ্ডা পড়েছে। আর এদিকে ভোল্টেজের অবস্থাটা দেখো, আলোগুলো মোমবাতির মত টিমটিম করছে।"

এসে গেছে ধূমায়িত গরম চায়ের সাথে সিঙাড়া এবং আলুর চপ। টপাটপ সিঙাড়াগুলো তুলে নেওয়া দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে খিদেটা বেশ ভালই জমেছে, আর গল্পের আসরটাও জমে উঠতে চলেছে।

পিসেমশাই বলতে শুরু করেন, "আজকের ঘোরাটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। ওই যে শিব মন্দিরটা দেখলে, ওটা দেড়শ বছরের পুরনো। আর ওই ভাঙা জমিদার বাড়িটা চারশো, পাঁচশো, কিম্বা আরও বেশি পুরনো হতে পারে। আর ওই যে নদীটা দেখলে, ওটা বর্ষা কালে এমন ফুলে ফেঁপে ওঠে যে. . . "

অয়নের বাবা একমনে আলুর চপে কামড় দিতে দিতে বলে চলেছেন, "আহা, এতো ভালো চপ কতদিন যে খাইনি! কলকাতায় এমন পাওয়াই যায় না!" অয়নের কিন্তু মন পড়ে আছে ওই বন্ধ ঘরের রহস্যের পেছনে। আবার জিজ্ঞেস করে ওঠে, "এবার তাহলে ওই ঘরের গল্পটা শোনা যাক। আর, একবার কি ঢুকে দেখা যাবে

পিসেমশাই চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে বললেন

না?"

পিসেমশাই চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে বললেন, "বেশ, অতই যখন কৌতূহল, না বলে থাকি কী করে? তবে ভয় পেলেই কিন্তু আমাকে বলিস। আমাদের এই বাড়িটা কেনা হয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক আগে। এই বাড়িটা ছিল রমাকান্ত যাদবের। আমরা ওকে রমা বলেই ডাকতাম। রমা ছিল এখানকার এক নামকরা ব্যবসাদার। চালকল, তেলের ঘানি, ইঁটভাটা, সুরকি কল ইত্যাদি নানা ধরনের ব্যবসা ছিল ওর। সারাবছরই নানা কর্মকান্ডে বাড়িটা গমগম করতো। বাদ সাধল ওর অপোগন্ড দুই ছেলে। বাবার

টাকায় ফুর্তি মেরে শুধু যে সমস্ত ব্যবসা লাটে তুলে দিল তাই নয়, দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে উঠল রমা। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় সে আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারাল। অবশেষে ছেলেদের অত্যাচার, মহাজনদের হেনস্থা আর প্রতিবেশীদের অবমাননার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন কাকভোরে গলায় ধুতি জড়িয়ে ঘরের ফ্যানের সাথে বেঁধে ঝুলে পড়ে রমা।

"এরপরই শুরু হয় যত গণ্ডগোল। ওই বাড়িতে টেঁকাই দুষ্কর হয়ে পড়ে সকলের। একের পর এক ঘটতে থাকে সব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা। রাত বাড়ার সাথে সাথে কখনও রমার খড়ম পরে চলার খটমট শব্দ, কখনও বা ওর প্রিয় সামসাদ বেগমের গানের সুর ভেসে আসা, আবার কখনও পান চিবানোর খসখসে শব্দ।

"এই পর্যন্ত তাও সহ্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু এরপর ওই দুটো দুর্ঘটনা ওদের সংসারটাকে ভেঙে ছারখার করে দিল। প্রথমটা ঘটেছিল রমার মৃত্যুর প্রায় আটমাস পর - দেওয়ালির দিন। আগেকার তুলনায় কম হলেও, সেবারও রমার ছেলেরা প্রচুর বাজি কিনেছিল এবং প্রদীপের আলোকমালায় সেজে উঠেছিল এই বাড়িটা। ছোটদের হাতের ফুলঝুরির ঝলকানি, মেয়েদের হাতে রংমশালের আলো আর তার সাথে সাথে বাজির হুংকারে বাড়িটা মনে হচ্ছিল যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু রমার সবথেকে প্রিয় বাজি উড়ন্ত তুবড়িই ডেকে আনল ওই সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা। প্রতি বছরের মতো সেবারও সেই একই দক্ষ কারিগর দিয়ে বানানো হয়েছিল তুবড়িগুলো, অথচ প্রথম তুবড়িটা জ্বালিয়ে আকাশে ওড়ানোর আগেই এক বিকট শব্দে ঘটে যায় সাঙ্ঘাতিক বিস্ফোরণ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রমার বড় ছেলে। ওর ডান হাতটা পুরো ঝলসে গিয়েছিল। শোনা যায়, ওই সময়ে দূরে সাদা ধুতি পরা কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। বহুদিন চিকিৎসা চালিয়েও রমার বড় ছেলের ডান হাতটা রাখা যায়নি। এছাড়া শরীরের আরও অনেক অংশই দগ্ধে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়টা ঘটেছিল আর এক উৎসবের দিন হোলিতে। বড়ছেলের চিকিৎসার খরচের ভারে ওদের আর্থিক অবস্থার তখন আরও অবনতি ঘটেছে, তাই সেবার হোলির অনুষ্ঠান ছিল খুবই সাদামাটা। শুধুমাত্র আবির খেলা। রমার ছোট ছেলে দালানে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাড়ির মেয়েদের আবির খেলা। হঠাত মনে হল দূর থেকে কেউ এক মুঠো আবির ছুঁড়ে দিল ওর চোখে। মনে হল চোখ দুটো জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। নানান চিকিৎসা করেও ঠিক করা যায়নি চোখ দুটোকে, ফলে অন্ধই হয়ে যায় ছেলেটি।

"এছাড়া ছোটখাটো উপদ্রব লেগেই ছিল। কখনও রাতদুপুরে দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, কখনও আচমকা জানালার পাশ দিয়ে দ্রুত কারো সরে যাওয়া, কখনও বা সামনের বাগানে কারো হেঁটে চলার শব্দ এইসব। ভয়ে বাড়ির সমস্ত কাজের লোকেরাও একে একে পালাতে শুরু করে দেয়, ফলে বাড়িতে বাস করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে ওদের।

"শেষে ওরা মনস্থির করে ফেলে যে বাড়িটা বেচেই দেবে। কিন্তু কিনবে কে? ইতিমধ্যে এলাকার সকলেই তো জেনে গেছে যে এই বাড়িতে রমার অশরীরী আত্মার বাস, তাই কেউই রাজি হয় না কিনতে। শেষপর্যন্ত কোন উপায় না দেখে, ওরা যে কোন মূল্যেই বাড়িটা বেচতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমন সুবর্ণ সুযোগ কি হাত ছাড়া করা

যায়, বিশেষত আমি যখন ভূতপ্রেতে কোন বিশ্বাসই করতাম না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা টাকা ছিল তাই দিয়েই বাড়িটা কেনার প্রস্তাব দিই ওদের, আর সাথে সাথেই ওরা রাজি হয়ে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সেই থেকেই আমরা বসবাস করছি এই বাড়িতে, আর নানান রোমাঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী আমি। বেশির ভাগ অলৌকিক ঘটনাই ঘটে ওই ঘরটায়, আর তাই ওটা বন্ধই রাখা থাকে।"

এবার অয়নের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে ওঠেন "কি ভায়া, ভয়টয় পেলে নাকি? তাও তো আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা কিছুই বলিনি। শুনলে পায়ের রোম থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে যাবে। কি? শুনতে চাও নাকি সেসব কথা?"

সত্যিই, গল্প শুনতে শুনতে সারা শরীর যেন শিহরিত হয়ে উঠছিল অয়নের। কিন্তু ভয়ের সাথে কৌতূহলটাও বেড়ে চলেছে সমান তালে। তবে ভয় তো আর প্রকাশ করা যাবে না, তাই জোরের সাথে বলে ওঠে অয়ন, "ধুর, আমি ওইসব ভূতপ্রেতে কোন ভয় পাই না। এ ব্যাপারে প্রচুর বই পড়ে আমার অনেক জ্ঞান আছে, তাই কোন চিন্তা নেই। আজ আমি সব গল্প শুনতে চাই তোমার কাছে।"

পিসেমশাই আবার বলতে শুরু করেন, "ঘটনা তো অনেক আছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি বলো তো? আচ্ছা, ভূতকে কখনও পাত পেড়ে খেতে দেখেছো? এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল প্রায় বছর তিনেক আগে। আগের দিন লাল্টু মায়ের সাথে মামার বাড়ি গেছে দেওঘর। বাড়িতে আমি একা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি অঝোর ধারায় বৃষ্টি। রাস্তাঘাট এক হাঁটু জলের তলায়।

"বাড়ি থেকে বেরোনোর কোন উপায় নেই। তাই সকাল থেকেই জানালার ধারে বসে বর্ষাকেই উপভোগ করা ছাড়া আর অন্য কোন কাজ নেই। বৃষ্টির দাপট দেখে মনে হচ্ছে আকাশটাই হয়তো ভেঙে পড়ে ভাসিয়ে দেবে গোটা দেশটাকে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সামনে বাড়ির টিনের চালে পড়ে একটা বিকট শব্দ করে চলেছে, আর সাথে মেঘের গর্জন। দমকা হাওয়া আর ঝড়ের দাপটে কুঁড়েঘর, গাছ, কারো রেহাই নেই। মনে হচ্ছিল সব কিছুই যেন ওলটপালট হয়ে যাবে। বৃষ্টির জলে রাস্তা, মাঠ, নালা, পুকুর সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রায় কোন মানুষই দেখা যায় না রাস্তায়, কেবল দূরে কয়েকটা বাচ্চা খালি গায়ে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে খেলছে।

"দেখতে দেখতে কখন যে বেলা হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আরও বেড়েই চলেছে। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। বিকেলে ঘুম ভাঙতে দেখি ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, আর মাঝে মধ্যে বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে যাচ্ছে চোখ। আলোর সুইচটা টিপতে দেখি বিদ্যুৎ নেই। নিশ্চয় গাছে চাপা পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে। অগত্যা হ্যারিকেনটাই জ্বালিয়ে নিলাম। দরজা-জানালাগুলো ভাল করে বন্ধ করে ফেলুদার একটা গল্পের বই নিয়ে বসে পড়লাম।

"বইটার মধ্যেই ডুবে ছিলাম, হঠাৎ মনে হল দরজায় খটখট আওয়াজ। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। একটু অবাকই হয়ে গেলাম। এমন সাংঘাতিক আবহাওয়ায় কে আসতে পারে? চুপ করে বসে একটু বোঝার চেষ্টা করছি, আবার সেই খটখট আওয়াজ। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করলাম। বাইরে ঘন

অন্ধকার। বিদ্যুতের ঝলকানিতে বোঝা গেল সাদা ধুতি পরা কেউ দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির বাইরে। জিজ্ঞেস করে জানলাম উনি সমস্তিপুর থেকে এসেছিলেন মধুপুরে মেয়ের বাড়িতে, কিন্তু ফেরার পথে বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে যেতে পারছেন না। বৃষ্টি না কমা পর্যন্ত উনি কিছুক্ষণের আশ্রয়ের অনুরোধ করাতে আমি তাঁকে ফেরাতে পারিনি।

"ঘরে বসে জুড়ে দিলেন নানা গল্প আমার সাথে, আর আমিও কথা বলার লোক পেয়ে খুব খুশি। মধুপুরের কত কথাই না জানেন উনি! কোন বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল, কোন অসাধু আড়তদার পুলিসে ধরা পড়েছিল, কোন স্কুলশিক্ষক পাড়ার গুণ্ডাদের হাতে বেদম মার খেয়েছিলেন ইত্যাদি। একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগছিল, তাই বারবার ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে সত্যি কি চোখের মণিটা সাদা? হ্যারিকেনের আলোয় তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু একি, চোখের পলক তো পড়ছে না! তাছাড়া মাঝেমাঝে চোখের সাদা মণিদুটো ছোট থেকে বড় হচ্ছে আর কখনো মনে হচ্ছে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হয়তো অল্প আলোয় দেখার ভুল, তাই কোন গুরুত্ব দিই নি।

বৃষ্টি কমার কোনও আশা নেই দেখে আমিই ওনাকে বললাম রাতটা আমার বাড়ি কাটিয়ে পরের দিন যাবার জন্য আর উনি রাজি হয়ে গেলেন সাথে সাথে। গল্প করতে করতে যে কখন রাত বেড়েছে, বুঝতেই পারিনি। খিদেটা বেশ জমেছে, ঘরে যে খাবার ছিল ভাগাভাগি করে ওনাকে বললাম খাওয়া শুরু করতে আমার সাথে। নিজে খেতে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম, যে ওঁর খাওয়ার দিকে খেয়ালই হয়নি। আমার যখন খাওয়া শেষ হল, তাকিয়ে দেখি ওঁর প্লেট ঝকঝকে পরিষ্কার। এবার মনে হল, কই ওনাকে তো হাত নেড়ে কখনো খেতে দেখলাম না, তা হলে কখন খেলেন উনি?

ওঁকে বললাম ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! ওঁর শরীরটা হাওয়ার মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল ওই ঘরের দিকে। হেঁটে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই হল না। দেখে বেশ মজা পেলাম, ভাবলাম আমিও যদি পারতাম এমন ভেসে বেড়াতে, তাহলে আর আমাকে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ভাবতে হত না। তাকিয়ে দেখলাম ওই ঘরের দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম আমার ঘরে, আর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া শুরু হয়ে গেল নানা চিন্তা। ভাবতে ভাবতে হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে হল ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে আর সাথে চাপা হাসির আওয়াজ। চোখ খুলতে এবার বেশ ভয় করছে, তবুও সাহস করে চোখ খুলতেই ভয় পেয়ে গেলাম। উনি আমার খাটের ওপর কী করছেন? আর ওঁর শরীরটাই বা দেখতে পাচ্ছি না কেন? সাদা কাপড়ে মাথা ঢাকা শুধু মুখটা কীভাবে এল এই ঘরে? একজোড়া সাদা চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে গিলতে আসছে আমাকে। আমি মাথার বালিশটা ছুঁড়ে মারলাম, আর ওটা গিয়ে ধাক্কা মেরে উলটে দিল টেবিলে রাখা হ্যারিকেনটাকে। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘর, কেবল মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোর আলো এসে পড়ছে ঘরে, আর তাতেই বুঝতে পারলাম যে মুণ্ডুটার নীচে ধড় নেই। তখন বোঝার চেষ্টা করছি যে এটা স্বপ্ন না সত্যি। এবার মনে হচ্ছে খাটটা দুলছে। না, শুধু খাট নয়, সমস্ত বাড়িটাই দুলছে। দেওয়ালে টাঙানো আমার সাধের

বেলজিয়াম গ্লাসের পাঁচ ফুটের আয়নাটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল, কাচের শো কেসটা নিজে থেকে খুলে গেল আর ভেতরের রকমারি বাহারি জিনিস-- কাপ, ডিশ ইত্যাদি হুড়মুড় করে ঝরে পড়ল মাটিতে, মনে হল রান্নাঘরের সমস্ত বাসন কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আচমকা বিদ্যুতের চমকে দেখলাম মাথার ওপরের পাখাটা থেকে একটা সাদা কাপড় ঝুলছে। মুণ্ডুটা ক্রমাগত আমার চারপাশে ঘুরে চলেছে, সাথে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত হাসি। ধীরে ধীরে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে বাড়িটা। যেদিকে তাকাই, মনে হচ্ছে সব কিছুই আমার দিকে চেয়ে হাসছে। দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ি, সিলিং পাখা, জলের জাগ, সবই বিকট শব্দে হেসে চলেছে। সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না, হাত-পা নাড়ানোর কোনও ক্ষমতাই নেই। আচমকা মনে হল আমার শরীরটাকে ধরে কে ওপরের দিকে তুলে দিচ্ছে। মনে হল কোনও কাপড় আমার গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। তারস্বরে চিৎকার করে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপ দিলাম মাটিতে। না, আর কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কোনোমতে বাড়ির দরজা খুলে দৌড় দিলাম রাস্তায়। এরপর আর কিছুই মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম, দেখি গোয়ালপাড়ার কয়েকজন আমাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

"সেযাত্রা কোনমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরপর থেকে ওই ঘরটা আমি বন্ধই রেখেছি, তবে মাঝে মাঝেই নানান অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় ওই ঘর থেকে।"

এই বলে উনি বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি, এখনও কি আগের মত সাহস আছে?"

বাবা অয়নের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আমি আর আমার ছেলে, কেউই তোমাদের মত অতো ভীতু নই। সুতরাং তুমি যতই গল্প শোনাও, আমরা কিন্তু ভয় পাচ্ছি না।"

অবশেষে ঠিক হল অয়ন আর ওর বাবা পরদিন থেকে ওই ঘরেই শোবে। সকালে উঠে ঘর পরিষ্কার করে, বিছানায় ভাল চাদর, খাবার জল, টর্চ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। অয়নের ভিডিও ক্যামেরা সেট করা দেখে পিসেমশাইয়ের কি হাসি! বলেন, "আরে ভূত তো একটা আত্মা, রক্ত মাংসের কোনও শরীর নয়। তার কখনো ছবি ওঠে?"

শুনে অয়ন খুব রেগে বলে ওঠে, "দেখো পিসে, এ ব্যাপারে আমার কিন্তু জ্ঞান অনেক। আমি নিজের চোখে অনেক ভূতের ভিডিও দেখেছি ইউটিউবে। আর বেশিরভাগ ভিডিওই আমার এই একই মডেলের ক্যামেরায় তোলা। এই ক্যামেরাটা অন্ধকারেও দারুণ ছবি তোলে। সুতরাং তোমার কথামতো যদি ভূতপ্রেত এই ঘরে আসে তাহলে আমার এই ক্যামেরাতে ধরা পড়বেই, আর কাল সকালেই তার ভিডিও দেখতে পাবে তোমরা।"

সারাটাদিন পিসেমশাই কেবল অয়নকে নানাভাবে খেপানোর চেষ্টা করে চলেছেন, "কি ভায়া, সব ঠিকঠাক আছে তো? ক্যামেরাটা ঠিকমতো কাজ করবে তো? ভূত যদি প্রথমেই ক্যামেরার সুইচটা বন্ধ করে দেয়? দরজার বাইরে কোনও পাহারাদার লাগবে নাকি? টর্চের ব্যাটারিগুলো পাওয়ারফুল তো?"

অয়নের বাবার সাথেও বেশ মজাই করে চলেছেন, "তুমি তো শুনেছি আরশোলা দেখলে দৌড়ে পালাও, তা ভূতের সাথে পাঞ্জা লড়বে কী করে? ছোটবেলায় চামুণ্ডা কালী দেখে এমন ভয় পেয়েছিলে যে সারাটা রাত মাকে জড়িয়ে শুয়েছিলে। তাই চিন্তা হচ্ছে ভীষণ তোমাদের নিয়ে। ব্লাড প্রেশারটা একবার চেক করিয়ে নেবে নাকি?"

কিন্তু ওরা ওই ঘরটায় শোবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাছাড়া পিসেমশাইয়ের হাসিঠাট্টা ওদের জেদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অদ্ভুত ব্যাপার, এমন একটা সাংঘাতিক ভূতুড়ে ব্যাপার শুনেও অয়নের মায়ের মধ্যে ভয়ের কোনও লক্ষণ নেই, বরং উনি পিসেমশাইয়ের কথায় মিটিমিটি হাসছেন।

খাওয়া শেষ করে অয়ন আর ওর বাবা বীরদর্পে ঢুকে গেল ওই ঘরটায়। অয়ন ঝটপট সাজিয়ে নিল ওর সরঞ্জাম। ওদেরকে ঘরে শুইয়ে, অয়নের মা, পিসি, পিসেমশাই, লাল্টু ফিরে আসে নিজেদের ঘরে। আজ ওঁরা ঠিক করেছেন সবাই মিলে রাত্রে জমিয়ে গল্প করবেন। তাছাড়া অয়নদের ওপর একটু লক্ষ রাখা উচিৎ, যদি কোনও দরকার পড়ে।

পিসেমশাইয়ের গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। একটার পর একটা মজার গল্প বলেই চলেছেন, আর শুনে সকলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। একবার তো হাসতে হাসতে লাল্টু খাট থেকে দড়াম করে পড়েই গেল। মাঝে মধ্যে পিসেমশাই অয়নদেরকে দেখে এসে বলছেন, "চিন্তার কিছু নেই, ওরা দুজনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে।"

ভোরের দিকে ঘুমে ঢলে পড়ে একে একে সবাই। হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল সকলের, মনে হল আওয়াজটা এসেছে অয়নদের ঘর থেকে। দৌড়ে গিয়ে সবাই দেখে সকলে পিসের বালিশটা পড়ে আছে জানালার পাশে, অয়নের লাঠিটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। ওদের দুজনের বিছানা অবিন্যস্ত, মনে হয় খুব ছটফট করেছে সারা রাত। ঘুম থেকে ডাকতেই ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে ওঠে দুজনে। চোখেমুখে সাঙ্ঘাতিক ভয়ের ছাপ। অয়ন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমার বন্দুকটা কোথায় গেল? ফায়ার, ফায়ার।"

অয়নের বাবা এখনও অদ্ভুত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। মনে হয় কিছু খুঁজছেন।

অবস্থা একটু সামলাতে, অয়নের বাবা বলতে শুরু করেন, "সত্যি, তোমাদের বাড়িতে না এলে জীবনের এত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতাম। যে আমি ভূতের অস্তিত্বকে বিশ্বাসই করতাম না, আজ আমিই তাকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি ঠিক যেমন বর্ণনা দিয়েছিলে, ঠিক তেমনই এক অশরীরী আত্মা গতকাল এসেছিল আমাদের ঘরে। পরনে সেই সাদা কাপড়, আর সঙ্গে এক অদ্ভুত হাসি। সারা রাত ধরে তাণ্ডব চালিয়েছে আমাদের ঘরে। কখনও আমার গলা চেপে ধরছে আর আমি এক ঝটকায় সরিয়ে দিচ্ছি তাকে, কখনো অয়নের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। একবার তো অয়নকে খাট থেকে ছুঁড়ে ফেলেই দিল। হ্যাঁরে, লাগে নি তো তোর? এর সাথে সেই বীভৎস ভূতুড়ে হাসি আমার কান ঝালাপালা করে দিয়েছে।

তোমরা শুনতে পাওনি কিছু? তবে, শেষমেশ ওই বালিশটাই কাজ দিয়েছে। ওটা দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারতেই তো পালালো ভূতটা!"

পরণে সেই সাদা কাপড় আর সঙ্গে এক অদ্ভুত হাসি

এবার অয়ন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "না বাবা ওটা বালিশের ঘায়ে নয়, ভূতটা পালিয়েছে আমার এই লাঠির ঘায়ে। তবে বন্দুকটা যদি খুঁজে পেতাম, অনেক আগেই গুলি করে শেষ করে দিতাম ওকে। ভয় একটু পেয়েছিলাম ঠিকই, তবে এ যা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল আমার - এটা আমার ভূত অনুসন্ধানে বেশ কাজে আসবে। ঠিক করেছি, এবার একটা ব্লগ বানাব, আর তাতে থাকবে আমার সব অভিজ্ঞতার কথা। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটাও দিয়ে দেব ইউটিউবে, যাতে দেশবিদেশের সবাই দেখতে পায় ভূতের আসল ভিডিও।"

শুনে পিসেমশাই হেসে বলেন, "আগে চালিয়ে দেখ কেমন ছবি উঠল তোর স্পেশাল ক্যামেরায়!"

অয়ন তড়িঘড়ি ভিডিও ক্যামেরাটা প্লে করতে শুরু করে অবাক হয়ে বলে, "কী ব্যাপার, এ তো শুধুমাত্র আমাদের ঘুমোনোর ছবি। না, আর কোনও ছবিই তো ওঠে নি, তা হলে ভূতের ছবিটা গেল কোথায়? তাহলে কি ভূতের ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ল না?"

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "এইতো, বাবা ছটফট করছে বিছানায়, আর এই যে বাবা বলিশটা ছুঁড়ল। আর এই যে, আমি কিরকম ঘুসি আর লাঠি চালাচ্ছি দেখো, আর এবার লাঠিটা ছুঁড়ে মারলাম।"

পিসেমশাই ছবি দেখতে দেখতে হেসেই চলেছেন, সাথে অন্যরাও কিছু কম যায় না। শেষে পিসে বলে ওঠেন, "তা ভায়া এই ভিডিওটা ইউটিউবে দিলে তার টাইটেল কী হবে? ঘোস্ট ভিডিও না হরর ড্রিম?"

একে তো ছবি না ওঠার দুঃখ, তার ওপর পিসের কথায় রেগে অভিমানে ফেটে পড়ে অয়ন। অয়নের বাবাও এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনার পর সকলকে এভাবে হাসতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত। শেষে পিসে সকলকে শান্ত করে বলেন, "শোনো ভায়া, ভূত প্রেত বলে কিছু আছে কিনা আমার অতো জ্ঞান নেই, তবে কাল রাত্রে তোমরা যে স্বপ্ন দেখেছো তা কিন্তু আমার আগের দিনের গল্পের প্রতিফলন। গল্পটা এমনই সাজিয়েছিলাম যে সেটা তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল এবং অবশ্যই তোমাদের এক অজানা ভয়ে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তোমাদের ঘুমন্ত অচেতন মনে ওই গল্পটাই আবার জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে।"

অত্যন্ত রেগে গিয়ে অয়নের বাবা বলে ওঠেন, "স্বপ্নই যদি হবে, তাহলে অমন অট্টহাসি এলো কোথা থেকে, আর অয়নকেই বা দড়াম করে খাট থেকে ফেলল কে?"

এবার হাসির রোল ওঠে বাড়িতে, সবাই যত হাসছে অয়নরা ততই রেগে ওঠে। শেষে পিসে বলেন, "মানুষের কান স্বপ্নের মধ্যেও পারিপার্শ্বিক কিছু শব্দ অনুভব করতে পারে। তাই, স্বপ্নের ঘোরে তোমরা আমাদের হাসিঠাট্টা, গল্পের আওয়াজ শুনে থাকবে। আর তোমাদেরকে বোকা বানানোর এই গল্পটা রসিয়ে ওদেরকে বলতে, লাল্টু এমন হাসতে শুরু করে যে খাট থেকে উলটে বিকট শব্দে একেবারে পপাতধরণীতলে।"

জীবনে কখনো এমনভাবে তাকে কেউ বোকা বানাতে পারেনি, তাই অয়নের বাবা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন এবং পারলে এখনই কলকাতা ফিরে যাবেন। অয়ন ভেতর ভেতর ফুঁসছে, আর লাল্টুর দিকে চেয়ে চোখ রাঙাচ্ছে। অবশেষে পরিস্থিতি সামলাতে অয়নের ছোটপিসি এগিয়ে এসে বলেন, "প্ল্যানটা তো আমারই তৈরি। পাঁচ বছর আগে আমরা এই বাড়িটা কিনেছি। এখনও পর্যন্ত যত লোক আমাদের বাড়িতে এসেছে, প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করেছে বাড়িটা সুন্দর, আর চারপাশটা এতো অপূর্ব যে সচরাচর দেখা যায় না। তার সাথে আছে এখানকার জল-হাওয়া। অসুস্থ মানুষ পর্যন্ত এখানে এসে সুস্থ হয়ে যায়। তাই সকলেই চায় আমাদের বাড়িতে এসে ছুটি কাটানোর সাথে শরীর ভাল করতে। অথচ গত পাঁচ বছর ধরে এত অনুরোধ করা সত্ত্বেও তোমরা কিছুতেই আসতে চাওনি আমাদের বাড়িতে, যদিও ঘুরে বেরিয়েছ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তাই যখন শুনলাম যে তোমাদের ভূত-প্রেতে এতো আগ্রহ, তখন আমিই মতলবটা ফাঁদি। তবে সমস্ত কৃতিত্ব লাল্টুর বাবার, কারণ ভূতের গল্পের পুরোটাই ওঁর মস্তিষ্কপ্রসূত।"

এতো রাগের মধ্যেও অয়নের বাবা হেসে ফেলে বলেন, "আমাকে তোমরা বোকা বানিয়েছ ঠিকই, তবে এটা জেনে রাখ যে আমি কিন্তু ভূতে ভয় পাই না।"

অয়ন বলে, "আমিও মোটেই ভয় পাই না, তাই তো স্বপ্নে দেখা ভূতকেও লাঠি দিয়ে কম পেটাই নি।"

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

অদিতি ভট্টাচার্য্য

গৌরাঙ্গবাবু খুব খুঁতখুঁতে লোক। কোনোকিছুই তাঁর পছন্দ হয় না, সব কিছুতেই তিনি খুঁত বের করেন। তাঁর এই স্বভাবের জন্যে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী – সবাই অতিষ্ঠ। আত্মীয়স্বজনেরা তো তাঁকে একটু এড়িয়েই চলেন। বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই, এই স্বভাবের জন্যেই। তাদের দোষও দেওয়া যায় না। কেউ হয়তো কিছু একটা বলেছেন, গৌরাঙ্গবাবু অমনি তার ভুলত্রুটি বার করতে বসবেন। এই যেমন সেদিন রাস্তায় বহুদিনের পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কথা বলতে বলতে বন্ধুটি বললেন, "তুই তো নতুন বাড়ি করে অন্য পাড়ায় চলে গেছিস। তোর ঠিকানাটা দে।"

গৌরাঙ্গবাবু নিজের ঠিকানা দিলেন। পাছে ভুলে যান এই ভয়ে বন্ধুটি ঠিকানাটা লিখে নিতে চাইলেন। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বেরলো, কিন্তু কলম ছিল না কাছে। গৌরাঙ্গবাবুই দিলেন। বন্ধুটি ঠিকানাটা লিখে কাগজটা পকেটে পুরে, কলমটা ফেরত দিয়ে বললেন, "বেশ, একটা রবিবার দেখে চলে যাব, গল্প করা যাবে। এখন চলি।"

গৌরাঙ্গবাবু মুখটাকে বাংলার পাঁচের মতো করে বললেন, "পেনটা ফেরত দিয়ে যে একটা ধন্যবাদ দিতে হয় সেটা পর্যন্ত জানা নেই দেখছি।"

বন্ধুটির মুখে কোনো কথা জোগাল না, এতটা বোধহয় আশা করেন নি। বলা বাহুল্য বার্তালাপের এখানেই ইতি আর বন্ধুটিও গৌরাঙ্গবাবুর বাড়িতে আর যান নি কোনোদিন।

অফিসে তো গৌরাঙ্গবাবুর নামই খুঁতখুঁতেবাবু। বিনোদ রোজ সকালে অফিসে সবার টেবিল, চেয়ার ঝেড়ে পরিষ্কার করে রাখে। বিনোদ ছেলেটি বেশ চটপটে, চালাকচতুর। সবাই পছন্দ করে। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবুর হাত থেকে তারও নিস্তার নেই। একদিন অফিসে আসার পরই বিনোদের সঙ্গে তাঁর লেগে গেল। যারা ততক্ষণে এসে গেছিল তারা সব ভিড় করে এল ব্যাপার দেখতে।

বিনোদ তো বুঝতেই পারছে না কী হয়েছে। খালি বলছে, "আমি তো চেয়ারটা ঝাড়ছিলাম, গৌরাঙ্গবাবুই রেগে গেলেন।"

"রেগে তো যাবই, রেগে যাওয়ারই কথা এরকম উলটোপালটা কাজ করলে," বললেন গৌরাঙ্গবাবু, "তুমি আগে চেয়ারের বসার জায়গাটা ঝেড়ে তারপর ঝটাস ঝটাস করে চেয়ারটার হ্যাণ্ডেলদুটো ঝাড়লে। ধুলোটা তো আবার বসার জায়গাতেই পড়ল, সেটা কে পরিষ্কার করবে?"

সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাল। এরকম অদ্ভুত কথা কেউ কোনোদিন শুনেছে কিনা সন্দেহ। একজন বেশ কপট গাম্ভীর্য মাখা গলায় বলল, "বাবা বিনোদ, এটা গৌরাঙ্গবাবুর চেয়ার বাবা। ভালো করে ঝাড়পোঁছ করো।"

সবাই হোহো করে হেসে উঠল। বিনোদও। গৌরাঙ্গবাবু আরও চটে গেলেন, "এই করে দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে, কেউ কোনো কাজ ঠিক করে করে না।"

কিন্তু এই স্বভাবের জন্যেই গৌরাঙ্গবাবু সম্প্রতি বেশ মুশকিলে পড়েছেন। একা মানুষ, থাকেনও একা একটা ছোটো বাড়িতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো চাকর পাচ্ছেন না। কেউ তাঁর বাড়িতে কাজ করতে চাইছে না। যারা ঢুকেছিল কেউ এক মাসের বেশি টিঁকতে পারে নি। কেউ রান্নায় নুন কম দেয় তো, কেউ জল খরচ বেশি করে, কারুর কথা বলার ধরণ গৌরাঙ্গবাবুর ভালো লাগে না। একজন তো বাতিল হয়েছে বেশি তাড়াতাড়ি চলাফেরা করার জন্যে। তার বয়স কম ছিল, সে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে সারা বাড়ি ঘুরত, কাজকর্মও চটপট শেষ করে ফেলত। এটাও গৌরাঙ্গবাবুর ঠিক ভালো লাগত না। শেষের জনের মোটামুটি সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু ঘুমোলে তার বেজায় নাক ডাকত, পাশের ঘর থেকেও গৌরাঙ্গবাবু আওয়াজ পেতেন। তাই সে- ও বরখাস্ত হল। আপাতত কোনো চাকর নেই, আশেপাশের কেউ কাজ করবে বলেও মনে হয় না। গৌরাঙ্গবাবুর খুবই অসুবিধে হচ্ছে। তিনি একজন নিখুঁত চাকরের সন্ধানে আছেন।

এহেন সময়ে একদিন অফিস থেকে ফেরার সময় গৌরাঙ্গবাবুর পুরোনো পাড়ার প্রতিবেশী শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা। সব শুনেটুনে শশধরবাবু বললেন, "আমার সন্ধানে একজন আছে। আমাদের গ্রামের লোক। খুবই বিশ্বাসী, কাজও ভালো করে। কিন্তু দেখতে ভালো নয় একেবারে। আপনি তো আবার খুব খুঁতখুঁতে মানুষ।"

শশধরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বললেন, "দেখতে খারাপ মানে? কীরকম খারাপ, কতটা খারাপ সেসব বলুন।"

"খারাপ মানে কী আর! একেবারে কুচকুচে কালো আর বেশ ঢ্যাঙা, সামনে একটু ঝুঁকে চলে," বললেন শশধরবাবু।

"সামনে ঝুঁকে চলে মানে কুঁজ টুঁজ--- "

"না না কুঁজ না, কুঁজ না। বেশ লম্বা তো, তাই একটু সামনে ঝোঁকা। তবে কাজ খুব ভালো। কথাবার্তাও সুন্দর। এখন আপনি যদি এতে মানিয়ে নিতে পারেন তো বলুন। আমার এক ভাইপো এসেছে, কাল গ্রামে ফিরে যাবে। তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দিন। কুঁজ না হলে ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে তাহলে খবর পাঠিয়ে দেব। আমি কিছুদিন থাকব না। এর মধ্যে যদি ও চলে আসে তাহলে সোজা আপনার কাছেই চলে যাবে। আপনার ঠিকানা আমি ভাইপোর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ওর নাম শম্ভু। গ্রামে আমাকে সবাই ছোটোদাদাবাবু বলে ডাকে। ও- ও তাই বলবে। আপনার চিনতে অসুবিধে হবে না।"

আজ্ঞে আমি শ্রী শম্ভুচরণ দাস

গৌরাঙ্গবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

দিন তিনেকের মাথায় একটা ফুলকাটা ট্রাঙ্ক হাতে নিয়ে শম্ভু এসে হাজির। গৌরাঙ্গবাবু দেখলেন, একদম শশধরবাবুর বর্ণনা মতো। তাও তিনি একটু বাজিয়ে নিলেন, নামধাম সব জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আমি শ্রী শম্ভুচরণ দাস। চৌগাছা থেকে আসছি। ছোটোদাদাবাবু মানে শশধরবাবু পাঠিয়েছেন। ওনার ভাইপোকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন, বললেন খুব দরকার, তাই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।"

গৌরাঙ্গবাবু বেশ খুশি হলেন। বাঃ! এর কথাবার্তা তো বেশ ভালো!

বেশ সভ্য ভদ্র মনে হচ্ছে!

শম্ভু তখন থেকেই কাজে বহাল হয়ে গেল। শশধরবাবু ঠিকই বলেছিলেন, কাজেও খুব পরিপাটি। গৌরাঙ্গবাবু চেষ্টা করেও কোনো খুঁত বার করতে পারছিলেন না। সেদিন ছুটির দিন। অল্প অল্প ঠান্ডা পড়েছে। গৌরাঙ্গবাবুর গলাটা খুশখুশ করছে। ভাবলেন স্নানের জলটা একটু গরম করে দিতে বলবেন শম্ভুকে। ডাকামাত্রই এসে হাজির।

কিছু বলার আগেই বেশ বিনীতভাবে বলল, "সকালে দেখলাম কাশছেন। চানের জলটা তাই গরম করতে দিয়েছি। আমাকে বলবেন বাথরুমে দিয়ে দেব। এত রোদ বাইরে, গ্যাস পোড়ানোর কী দরকার?"

গৌরাঙ্গবাবু তো মুগ্ধ। উনি যে ঘুম থেকে উঠে কেশেছেন সেটাও খেয়াল করেছে! বিচক্ষণও বলতে হবে। তা সত্যি শম্ভুর কাজ যেমন নিখুঁত, চোখ কানও তেমন খোলা। গৌরাঙ্গবাবুর বাড়িতে খুব বেড়ালের উপদ্রব। আগেকার চাকরগুলোর কোনো হুঁশ ছিল না। বেড়াল প্রায়ই দুধ, মাছ খেয়ে যেত, বিছানায় উঠে বসে থাকত, সোফার গদি অবধি আঁচড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল।

শম্ভুকে সে কথা বলতেই সে বলেছিল, "বাবু আপনি কাজের মানুষ। এসব ছোটোখাটো ব্যাপার যদি আপনাকে দেখতে হয় তাহলে আমাকে কী করতে রেখেছেন? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যান, আমি সব খেয়াল রাখব।"

ওর কথা বলার ধরণই এমন যে নিশ্চিন্ত না হয়ে পারা যায় না। গৌরাঙ্গবাবুর মতো খুঁতখুঁতে মানুষও হয়েছিলেন। শম্ভু আসার পর থেকে বেড়ালের উপদ্রব একদম বন্ধ, বলা ভালো একটা বেড়ালকেও বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখেননি গৌরাঙ্গবাবু।

"শশধরবাবু ফিরলে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হবে, এই যুগে এরকম একজন চাকর পাওয়া ভাগ্যের কথা," ভাবলেন তিনি।

*****

শশধরবাবু অনেকদিন বাইরে ছিলেন, সবে ফিরেছেন। সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছেন দোকানে যাবেন বলে এমন সময় মোড়ের মাথায় গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখামাত্রই গৌরাঙ্গবাবু বলে উঠলেন, "আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শম্ভুর কোনো তুলনা হয় না। ওকে আমি আর ছাড়ছি না।"

শশধরবাবু তো অবাক, কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু বলতে দিলে তো! শম্ভুর অজস্র প্রশংসা আর শশধরবাবুকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি হনহন করে চলে গেলেন।

"আরে ও মশাই, কোথায় গেলেন? আমার কথাটা শুনুন, শম্ভুকে কোথায় পেলেন আপনি?" শশধরবাবু ডাকলেন কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু ততক্ষণে হাওয়া।

সেই সময় ওখান দিয়ে শশধরবাবুর প্রতিবেশীর ছেলে সুশান্ত যাচ্ছিল। শশধরবাবুকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার কাকু? কী হয়েছে? কাকে ডাকছেন?"

"খুব গণ্ডগোল হয়ে গেছে বাবা, খুব বিপদ।"

“কী হয়েছে? আমাকে বলুন।”

“আমি গ্রাম থেকে চাকরের ব্যবস্থা করে দেব বলেছিলাম গৌরাঙ্গবাবুকে। সেই মতো খবরও পাঠিয়েছিলাম গ্রামে। শম্ভু বলে আমাদের চেনা একজন ছিল, খুব বিশ্বাসী লোক। কিন্তু আমার ভাইপো শম্ভুর বাড়িতে খবর দিতে গিয়ে শুনল আগের দিনই শম্ভু মারা গেছে। ডেঙ্গি হয়েছিল। মশার উপদ্রব ওখানে খুব বেশি। এদিকে আমিও বেড়াতে চলে গেলাম। গৌরাঙ্গবাবুকে আর এ খবরটা দিতে পারি নি। একটু আগে গৌরাঙ্গবাবু আমাকে বলে গেলেন শম্ভু নাকি ওনার কাছে কাজ করছে। আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই হনহন করে চলে গেলেন। নিশ্চয়ই কোনো বাজে লোক কিছু মতলবে শম্ভু সেজে ঢুকেছে। যা দিনকাল, চতুর্দিকে তো শুধু চুরিডাকাতির খবর। একা মানুষ থাকেন, কোনদিন বিপদে পড়বেন। তুমি চলো আমার সঙ্গে, ওনাকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি কোন গৌরাঙ্গবাবুর কথা বলছেন? ওই খুঁতখুঁতে ভদ্রলোক তো? উনি তো আজ সকালে মারা গেছেন। আপনি শোনেন নি? কিন্তু বাড়িতে তো উনি একাই থাকতেন, আর কেউ তো ছিল না। কাকু, কাকু আরে আপনার কী হল?”

ভাগ্যিস সুশান্ত ছিল কাছে, তাই ধরে ফেলল, নাহলে শশধরবাবু মাথা ঘুরে রাস্তাতেই পড়ে যাচ্ছিলেন। সুশান্তই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

বাড়িতে কাউকে কিছুই বললেন না শশধরবাবু, শুধু বললেন, “শরীরটা ভালো লাগছিল না। এতক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম তো, হয়তো তারই ধকল।”

পরে ধাতস্থ হয়ে ভাবতে বসলেন ব্যাপারটা কী হতে পারে। তবে কি শম্ভু নয়, শম্ভুর ভূত কাজ করছিল গৌরাঙ্গবাবুর বাড়িতে, কিন্তু উনি কিছুই বুঝতে পারেন নি? বরং বেশ সন্তুষ্টই ছিলেন মনে হয়। এদিকে ওনার সঙ্গে এতদিন দেখা হয় নি, ধন্যবাদ জানাতে পারেন নি। খুঁতখুঁতে মানুষ তো, নিজের কাজে খুঁত রাখেন কি করে! তাই উনি ফিরতেই---

--- শশধরবাবুর মাথাটা আবার যেন কীরকম করল।

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

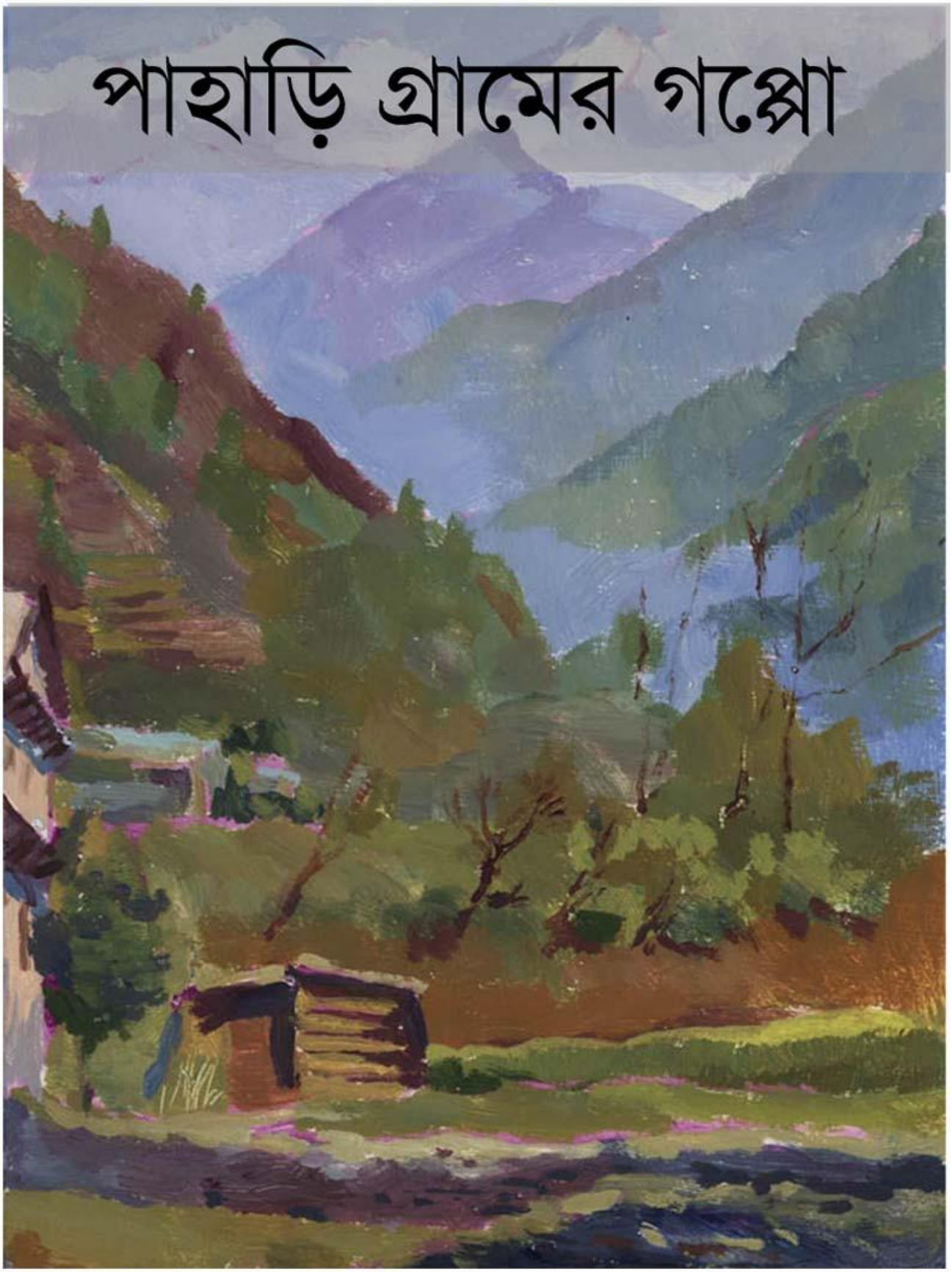

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, '' জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর.....''

খাইবগড়

আলাদা করে এই গ্রামটা কেউ নজরই করে না, অথচ বহু লোক এর ওপর দিয়ে যে গিয়েছেন সেকথা আমি হলফ করে বলতে পারি। ছোট্ট জনপদ, আলাদা করে তার অস্তিত্ব কে- ই বা লক্ষ্ করবে যদি তার লাগোয়া বেশ বড়সড় একটা জায়গা থাকে। বড় জায়গাটার মধ্যে ছোট জায়গাটা গুটিশুটি মেরে এক কোণ ঘেঁষে পড়ে থাকে। সত্যি বলতে কি আমাদেরও চোখ সে এড়িয়েই যেত যদি না গোপালদার বাড়ি ওই খাইবগড় গ্রামে হত।

পিন্ডারি গ্লেসিয়ারের নাম তো সকলেই শুনেছে। যেখান থেকে পিন্ডারি নদীর উৎপত্তি। সেই গ্লেসিয়ারে যাবার জন্য গাড়িপথ গেছে কাপকোট ভারারি হয়ে সরযূ নদীর পাশে পাশে। ভারারি বেশ বড় জনপদ আর তার প্রায় লাগোয়া এই খাইবগড়। যেখানে আমাদের গোপালদার বাড়ি। গোপালদা, মানে গোপালরাম দেখতে বেশ শক্তপোক্ত, তবে মনটা বেশ নরম। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয় প্রায় পনের বছর আগে। আমরা আমাদের বন্ধুরা বহুবার তার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গেছি। আমাদের অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছে গোপালদা। একবার স্রেফ গোপালদার বাড়ি যাবো বলেই হাজির হলাম খাইবগড়ে। সরযূর পাড়ে আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই খাইবগড়। ভারারির লাগোয়া বলে যেকোনো কাজেই লোকে দৌড়ে ভারারি চলে যায়, মাত্র দু কিলোমিটার বই তো নয়।

পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। রাতে মাংস রান্না করবে বলে আমার এক বন্ধু ভারারি বাজার থেকেই খাসির মাংস কিনে নিয়ে চলল। সে মাংস রান্না নিয়ে সে এক বিপত্তি। প্রেশার কুকারে সিটির পর সিটি দিয়েও সে মাংস যথেষ্ট শক্ত রয়ে গেল।

পাহাড়ে যাবার জন্য লোক উপস্থিত হলেই গোপালদা সব ছেড়েছুড়ে চলল তাদের সাথে। সেসময় বৌদি বেচারার ওপর খুব চাপ পড়ে যায়। ঘরের কাজ, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা তারপর মাঠে চাষের কাজ। একবার ফসল কাটবার সময় আমরা সদলবলে গিয়ে উপস্থিত। পরদিন ভোরেই বেরোতে হবে। বৌদি খুব রাগ করতে লাগল ফসল ওকে একলাই কেটে আনতে হবে বলে। সে ভারি পরিশ্রমের কাজ। সব সামলে একলা করা চাট্টিখানি কথা? গোপালদা মুখে রা কাড়ল না, মুচকি হেসে শুয়ে পড়ল। যথারীতি সকালে বেরিয়েও পড়ল। রাতে খাবার সময় সেবারের কথা মনে করানোতে বৌদি আঁচলের তলায় মুখ ঢেকে নিঃশব্দে হাসতে লাগল, আর গোপালদা হা হা করে। বোঝা গেল রাগ করলেও তার প্রশ্রয়ও ছিল।

বাড়ির পেছন দিয়েই সরযূ নদী বয়ে গেছে। রাতে তার স্রোতের আওয়াজ সারাক্ষণ কানে এসেছে। সকালে তার রূপ দেখা গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে এসেছে পাহাড়ি নদী। প্রবল তার স্রোত পাথরে পাথরে ধাক্কা লেগে ছিটকে ছিটকে উঠছে জল। আমরা একেবারে নদীর কিনারে গিয়ে বসে রইলাম। এক ভদ্রলোক মাছ ধরছিলেন। নদীর মধ্যে নেমে স্রোতের বিরুদ্ধে জল ঠেলে জল ঠেলে এগোচ্ছেন আর হাতের সুতো বাঁধা বঁড়শি ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন মাঝ নদী বরাবর। কখোনো- সখোনো তাতে মাছ উঠছিল। কাঁধের সাদা রঙের ঝোলাতে মাছগুলি জমাচ্ছিলেন তিনি। আমাদের কাছাকাছি এসে নদীর জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এলেন। গায়ের পোশাক ভিজে শপশপ করছে। ওই ঠান্ডায়। আমরা তার কাছে গিয়ে দেখি ট্রাউট মাছ। বিঘৎ খানেক। গোটা পনেরো ষোলো।

সারাদিন গ্রামের বাড়িতে শুয়ে বসে কাটল আমাদের। গোপালদার ছোট ছেলে অমিত স্কুল ফেরৎ হই হই করে তার বন্ধুদের নিয়ে এসে পড়ল। বাড়িতে আমরা অতিথি মেহমান। ক্লাস ফোর এর বন্ধুদের কাছে তার কদর বেড়ে গেছে অনেক। “আও দেখো ইয়ে হামারা দাদালোগ।” অজয়, করণ, বশির, বিক্রম আর অমিত। আমাদের সঙ্গে গল্প হল খুউব। মাঝে মাঝে বৌদি চা করে দিয়ে গেলেন। গোপালদা পাশের ক্ষেতে কাজ করতে করতে আওয়াজ দিলো হো হো ও ও ও ও ও করে। তখন ধান পেকে ওঠার সময়। সবজি ক্ষেতে তদারকির সময়। দূরে একচিলতে বরফে মোড়া চূড়া। আঙ্গুল দিয়ে ওইদিক দেখাতে হাতে রোদ আড়াল করে গোপালদার বৃদ্ধ বাবা বললেন উয়ো কাফনি সাইড কা হ্যায় বেটা।

রাতে খাবার সময় চমক। ট্রাউট মাছ। যিনি মাছ ধরছিলেন তাঁর বাড়ি এ বাড়ির পাশেই। মেহমান বলে কথা, অতিথি দেবো ভব। সুতরাং সকালে ধরা মাছ এবাড়িতে চলে এসেছে। আর সে মাছের ঝোল আমাদের পাতে। খাওয়া দাওয়ার পর ছাতে চাদর মুড়ি দিয়ে এক আকাশ তারার নীচে বসে বসে গপ্প করতে করতে ঠিক করা হল সকালে মূল শিখর নারায়ণ মন্দির যাওয়া হবে। সেখান থেকে হিমালয়ের অসংখ্য বরফচূড়া দেখা যায় দিগন্তের প্রায় ১৮০ ডিগ্রি জুড়ে।

অমিতের স্কুল ছুটি। সেও চলল আমাদের সাথে। সারাদিনের শিখর মন্দিরের ঘোরাঘুরি আমার চিরকাল মনে থাকবে। মনে থাকবে কারণ ছোট্ট অমিতের খুশি ও আনন্দের ভাগীদার ছিলাম আমরা। সারাটা দিন আমাদের পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির চত্বরেই কাটল। পরদিন ফিরে আসবার সময় অমিতের চোখ ছলোছলো। অল্পেতেই তার নরম মন আমাদের সঙ্গে বেশি বেশি জড়িয়ে পড়েছে। ফিরে আসার পুরো পথটাই মন ভার হয়ে রইল অমিতের মুখখানা মনে করে। সেও প্রায় সাত আট বচ্ছর হবে। এখন বোধকরি অমিত বেশ বড়সড় হয়েছে তার বাবার মতো। বাবার পাশে পাশে কাজ করার জন্য সবল হয়ে উঠেছে তার কাঁধ। আবার একবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয়ই। একদিন। পাহাড়ের কোলে।

ছবিঃ অর্ণব

suchipotro

ভূতের বাড়ি

রাইটার্স বিল্ডিং এর ভূত

পিকলু

রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণ আমাদের কলকাতার একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ইমারত। প্রায় তিনশ কুড়ি বছর ধরে কলকাতার বুকে বিভিন্ন সরকারের উত্থানপতনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আগেরই মতই । আজকের দিনেও বহু সরকারি চাকুরের দশটা থেকে ছটার কর্মস্থল এই রাইটার্স বিল্ডিং। উপস্থিত তার সারাইয়ের কাজ চলছে। সে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস বর্তমানে নবান্নে স্থানান্তরিত হলেও তা আগে এই মহাকরণেই ছিল সুতরাং স্পষ্টতই কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাড়িগুলোর মধ্যে এটা একটা। তাও আবার সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকেই।

ষোলশো নব্বই সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম এই জায়গার অধিকারে আসে তখনি সেন্ট অ্যান চার্চের নির্মাণ হয় এখানে যদিও তা এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। পরে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর থাকাকালীন টমাস ল্যিন নামে এক ইংরেজ সেন্ট অ্যান চার্চের ধ্বংসস্তূপের উপর তৈরি করেন কলকাতার প্রথম তিনতলা একটি ইমারত। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি ও চাকরদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রাইটার বলতে তখন সেই সকল কেরানি ও চাকরদের বোঝানো হত, (রাইটার মানে এক্ষেত্রে ছিল যিনি নথি লেখেন অর্থাৎ যিনি কেরানির কাজে নিযুক্ত।) সেখান থেকেই এর নাম হয় রাইটার্স বিল্ডিং।

এ বাড়ির পুরানো দেয়াল অনেক ইতিহাসের ছায়াসঙ্গী। ষোলশো পঁচানব্বইতে সেন্ট অ্যান চার্চ এক ভয়াবহ ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, প্রাণ হারান বহু মানুষ। উনিশশো তিরিশ সালে বিনয় বাদল দিনেশের রাইটার্স এ হানা ও ক্যাপ্টেন সিম্পসনের হত্যা। তারপর বাদল সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন এখানে। বিনয় হাসপাতালে মারা যান। দীনেশের ফাঁসী হয়। প্রাণ হারান বেশ কিছু ইংরেজও। আজকের রাইটার্স বিল্ডিং নিঃশব্দে দেখেছে সবই।

ইতিহাস আর রক্তে আঁকা দেয়ালগুলো তাই হয়তো রাতে যেন জেগে ওঠে, বহুদিন ধরেই এখানে ভূতুরে নানান ঘটনার কথা শোনা যায়। অফিস টাইমের পর অনেকেরই এখানে ছায়ামূর্তি দেখার অভিজ্ঞতা আছে। বিল্ডিং এর ফিফথ ব্লকে রাতের বেলায় ক্যাপ্টেন সিম্পসনের ছায়া নাকি আজও ঘুরে বেড়ায়, হয়তো সেই বিপ্লবীদের অপেক্ষায়। তাই সন্ধে সাতটার পর বিল্ডিংএর ব্যস্ততম অফিসেও মানুষ দেখা যায় না। নাইটগার্ডেরাও রাত বাড়লে একা পাহারা দেন না এখানে। রাইটার্সের পাশ দিয়ে বেশ রাত করে যাতায়াতের সময় অনেকেই এখানে পায়ের শব্দ, পুরানো ইংরেজিতে কথোপকথন ও কখনো চিৎকারেরও শব্দ পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে “একদিন” নামে এক খবরের কাগজে এই নিয়ে একটি লেখাও বেরোয়, যেখানে একজন মন্ত্রী ভূতে অবিশ্বাসীদের সাহস থাকলে রাইটার্স বিল্ডিং- এ একরাত

কাটিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি নাকি নিজে চোখে দেখেছেন একদল ছায়া তাঁকে তাড়া করে আসতে।

উপস্থিত মহাকরণ স্থানান্তরিত হয়েছে হাওড়ার নবান্নে। রাইটার্স বিল্ডিং- এ সারাইয়ের কাজ চলছে। এবারে যখন তা ফের নতুন চেহারায় ঝকমকে হয়ে দেখা দেবে, কে জানে ভূতগুলো আর থাকতে পাবে কি না! আলো- আঁধারি নির্জন করিডোর, সিম্পসনের মৃত্যুর সেই ফিফথ ব্লক—যা যা তাদের প্রিয় সেইসবই তো বিদেয় হবে নতুনের ছোঁয়ায়। ভূতগুলো কোথায় যাবে বলো তো?

suchipotro

শলকেনের ছবি

জোসেফ শেরিডান লে ফানু
অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

তৃতীয় পর্ব

সন্ধে নামতেই জেরার্ড শলকেনকে ডেকে পাঠালেন। শলকেন তখন জিনিসপত্র গুছিয়ে তার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছিল। যখন জেরার্ড তাকে রোজ ও ভ্যান্ডারহাউজেনের সাথে নৈশভোজ করার নেমন্তন্ন করলেন তখন সে না বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গিয়ে হাজির হল বাড়ির পুরোন বৈঠকখানায়। সেটা সেই বিশেষ উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছিল, তার পাশেই রাখা ছিল একটা সেকেলে টেবিল। আগুনের আভায় টেবিলের পালিশ করা কাঠ সোনার মত উজ্জ্বল লাগছিল। তার ওপরেই খাবার পরিবেশন করা হবে আর তার তোড়জোড় চলছিল জোরকদমে। সোজা লাইন করে লম্বা লম্বা কাঠের চেয়ার সাজানো হয়েছিল। দেখতে বনেদি না হলেও সেগুলো ছিল দারুণ আরামদায়ক। আর এই ঘরেই রোজ, তার কাকা ও শলকেন বসেছিল ভ্যান্ডারহাউজেনের অপেক্ষায়। তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

ন'টা বাজল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজায় আওয়াজ হল। অতিথি উপস্থিত। দরজা খোলার শব্দ, তারপর বাড়ির ভেতরেই ধীর অথচ জোরালো পদক্ষেপের শব্দ কানে এলো তাদের। তারপর তাদের বৈঠকখানার দরজাটা খুলে গেল আস্তে আস্তে আর ঘরে যে মূর্তি প্রবেশ করল তাকে দেখে সংযমী শিল্পী আঁতকে উঠলেন। রোজ তো প্রায় চিৎকারই করে উঠল ভয়ে। মূর্তিটির চেহারা ও পোশাক মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেনের মতো হলেও তার মুখের চেহারা আজ একেবারেই আলাদা। তার গায়ে আজ একটা ছোট কালচে রঙের ক্লোক। পায়ে গাঢ় বেগুনি রঙের মোজা। জুতোর ওপরে ওই একই বেগুনি রঙের গোলাপ লাগানো। ক্লোকের নিচেও তার পোশাক আশাক ফায়ারপ্লেসের আলোয় দেখে মনে হল ঘোর কালো। হাতে ভারী চামড়ার দস্তানা। এক হাতে লাঠি ও টুপি, ও অন্য হাত খালি। মাথা থেকে নেমে আসছিল সিংহের কেশরের মত একরাশ কোঁকড়া চুল, আর একটা শক্ত গলবন্ধের আড়ালে তার গলা ছিল পুরোপুরি ঢাকা।

এই অবধি ঠিকই ছিল, কিন্তু তার মুখখানা! কেমন যেন একটা নীলচে, সীসের মত রঙ ছিল সেটার, যেমনটা অতিমাত্রায় ধাতব ওষুধ খেলে দেখা যায়। তার চোখগুলোর ভেতরে ময়লা সাদাটে ভাগই বেশি ছিল আর তার ভেতর থেকে তার চরিত্রের এক অতীব হিংস্রতা ফুটে উঠছিল।

তার সম্পূর্ণ মুখটাতেই ছিল একটা দুর্দান্ত ও ক্রূর ভাব

তার মুখের রঙের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঠোঁটগুলোও ছিল প্রায় কালো। সম্পূর্ণ মুখটাতেই একটা দুর্দান্ত ও ক্রূর ভাব।

তবে খটকা লাগার ব্যাপার ছিল এই যে মানুষটি যতটা সম্ভব নিজেকে ঢেকেঢুকে রাখছিল, শরীরের যতটা কম অংশ দেখানো যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছিল। ঘরের ভেতরে আগুনের সান্নিধ্যে আসার পরেও সে তার দস্তানা খুলল না।

কিছুক্ষণ সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার পর জেরার্ড ডাউয়ের চমক ভাঙলো। উঠে দাঁড়িয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করে ভেতরে আনলেন তিনি। অতিথি নীরবে ঘরে পদার্পণ করল। তার নড়াচড়াটাও বেশ অস্বাভাবিক- হাত পা গুলোকে এমনভাবে চালাচ্ছিল যেন অনেককাল সেগুলোর

কোন ব্যবহার ঘটেনি। আধঘন্টার বেশি সে থাকল না আর গোটা সময়টাতে দু- একটার বেশি শব্দ উচ্চারণ করল না সে। আর ডাউও কয়েকটা আবশ্যক শিষ্টাচারের বাইরে গেল না। ভ্যান্ডারহাউজেনের উপস্থিতিটা ছিল এতই প্রচন্ড ভীতিকর যে সে আরেকটু এগোলে হয়তো বাড়ির লোকেদের ভয়ে পালানোর উপক্রম হত। কিন্তু এত আতঙ্ক সত্ত্বেও তারা দুটো জিনিস খেয়াল করল। এক, এই আধ ঘন্টায় অতিথির একবারও চোখের পলক পড়েনি আর দুই, তার গোটা শরীরটাই ছিল একটা মূর্তির মত স্থির। কোন নড়াচড়ার আভাস ছিল না কোথাও। এমনকি নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে বুকের ওঠা নামাটা পর্যন্ত নয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথি, ভয়ার্ত শিল্পী ও বাকিদের থেকে বিদায় নিল। তার চলে যাওয়ার পর সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল।

রোজ বলল, "কাকাবাবু, কি ভয়ঙ্কর লোকটা! আমি আর কখনো ওনাকে দেখতে চাইনা, পৃথিবীর সমস্ত সোনাদানা দিয়ে লোভ দেখালেও নয়।"

"চুপ! বোকা মেয়ে!", ডাউ বলে উঠলেন। তাঁর নিজের মনোভাবও যে খুব স্বস্তিকারক ছিল তা নয় কিন্তু তবুও তিনি বলে চললেন, "একথা বোলো না। মানুষকে দেখতে খারাপ হতেই পারে। কিন্তু মনের দিক থেকে ভাল হওয়াটাই জরুরি। সেটা হলে সে আজকালকার এই ছেলেছোকরাদের থেকে দশগুণ ভালো। রোজ, মানুষটি দেখতে সুন্দর নন, কিন্তু ইনি যে শুধু ধনীই নন, দয়ালুও বটে, তার পরিচয় আমি পেয়েছি। তার বদলে ইনি যদি এর দশগুণ বিশ্রিও হতেন, তবুও এই দুটো জিনিসের জন্য তার অসৌন্দর্য আমি ক্ষমা করে দিতে তৈরি থাকতাম।"

"কিন্তু কাকাবাবু, ওনাকে যখন আমি ওরকমভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তখন আমার কীসের কথা মনে হল জানেন? রটারড্যামের সেইন্ট লরেন্স গির্জায় ওই কাঠের মূর্তিটার কথা, যেটাকে দেখে আমি প্রতিবার আঁৎকে উঠতাম। কেন জানিনা বারংবার আমার শুধু সেই মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।"

জেরার্ড হেসে উঠলেন, কিন্তু মনে মনে রোজের মতে সায় দিলেন। হ্যাঁ, সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু তিনি মনে মনে এটাও ঠিক করে নিয়েছিলেন যে তাঁর ভাইঝির মনে লোকটির অসৌন্দর্য সম্বন্ধে যদি কোন বিদ্বেষ জন্মে থাকে তাহলে সেটাকে তিনি তাড়াবেন। কিন্তু একটা জিনিস দেখে তিনি মনে মনে খুশি হয়েছিলেন যে ভ্যান্ডের্হাউজেনকে দেখে তার ও শলকেনের মধ্যে যে অনির্দিষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার আভাসমাত্র রোজের মধ্যে হয়নি।

পরদিন সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে রোজের জন্য দামি দামি উপহার আসতে লাগল। রেশম, মখমল, গয়নাগাঁটি আরও কত কিছু। জেরার্ডদের নামেও একটা প্যাকেট এল। সেটা খুলে জেরার্ড পেলেন একটা আইনি বিয়ের চুক্তি। রটারড্যামের ভিলকেন ভ্যান্ডারহাউজেন ও লেডেনের শিল্পী জেরার্ড ডাউয়ের ভাইঝি, রোজ ভেল্ডারকস্টের বিয়ের চুক্তি। তাতে আরও ছিল ভ্যান্ডারহাউজেনের তরফ থেকে রোজের নামে একটা মোটা টাকার অঙ্কের সেটেলমেন্টের প্রতিশ্রুতি, যেটা পরবর্তীকালে জেরার্ড ডাউয়ের হাতে এসে পড়বে।

পাত্র ও পাত্রীর প্রথম দেখার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল, আর শলকেনের চোখের সামনে তার এত সাধের রোজকে তার বড়লোক স্বামী ঘটা করে নিয়ে চলে গেল। তারপর দুই কি তিনদিন সে শিল্পশালায় এল না, তারপর ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করল। হয়তো আগের মত অত আনন্দের সাথে নয়, কিন্তু আগের চাইতে অনেক বেশি জেদ নিয়ে। আগের ভালবাসার জায়গায় এখন তার মনে শুধুই উচ্চাশা। বেশ কয়েকটা মাস চলে গেল,

কিন্তু তাদের হাজার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভাইঝি ও জামাইয়ের কাছ থেকে কোন খবরই পেলেন না ডাউ। তাঁকে দেওয়া ভ্যান্ডারহাউজেনের কাগজপত্র তার হাতেই পড়ে রইল, টাকাগুলো আর গিয়ে আদায় করা হল না।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন ডাউ। রটারড্যামে মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেনের ঠিকানা তাঁর জানাই ছিল। তাই কিছুদিন দোনামোনা করার পর ঠিক করলেন সেখানে গিয়েই দেখা করবেন আদরের ভাইঝির সাথে। রটারডাম যাওয়া কোনও বিশাল ব্যাপার নয়, একটুখানি রাস্তা। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান ব্যর্থ হল। রটারড্যামে কেউ কস্মিনকালে মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেনের নাম শোনে নি। ডাউ সেখানকার প্রত্যেকটা বাড়িতে খুঁজে দেখলেন, একটাও বাদ দিলেন না, তবুও রোজ অথবা মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন- কারুর কোন খোঁজ পেলেন না। আর কেউ তাঁকে কোনও খবরও দিতে পারল না তাদের সম্বন্ধে। ফলে তিনি লিডেন ফিরে এলেন আগের চেয়ে অনেক উদ্বিগ্ন অবস্থায়। বাড়ি ফিরে এসে একটুও অপেক্ষা না করে তিনি ভ্যান্ডারহাউজেন যে দোকান থেকে রোজকে রটারড্যাম নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই বিলাসবহুল ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলেন সেখানে হানা দিলেন। তাদের গাড়ির চালক তাঁকে একটু একটু করে তাদের সেই যাত্রার কথা অনেকটা বলল। বেশ ধীরে ধীরেই যাচ্ছিল তারা। রটারড্যাম পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেশ অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। কিন্তু শহরে ঢোকার প্রায় এক মাইল আগে তাদের থেমে যেতে হল। ছুঁচলো দাড়িগোঁফওয়ালা ও সেকেলে পোশাক পরিহিত কয়েকটা লোক একটা ছোট জটলা করে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল। চালক বেশ ভয় ভয়েই ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে ধরল। চারিদিকে কোনধরণের জনবসতির চিহ্ন মাত্র ছিল না, সময়টাও খুব একটা ভাল ছিল না। সে মনে মনে ধরেই নিয়েছিল যে লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভাল নয়। অবশ্য লোকগুলোর সাথে ছিল একটা বিরাট, পুরোন ধরণের ডুলি আর তাই দেখে তার সেই দুশ্চিন্তা কিছুটা কমল।

তাদের ঘোড়ার গাড়ি দেখেই তারা সঙ্গে সঙ্গে ডুলিটা রাস্তার পাশে নামিয়ে রাখল। তখন বর গাড়ি থেকে নেমে এল ও কনের হাত ধরে নামিয়ে আনল। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছিল, কিন্তু বরের তাতে কিছু এসে গেল না। সে তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে চাপিয়ে দিল সেই ডুলিতে আর তার পেছন পেছন নিজেও চড়ে বসল। তারা উঠে গেলে লোকগুলো সেই ডুলি কাঁধে তুলে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল। কিছু দূর যেতে চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসা রাত্রের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পরে তার গাড়ির মধ্যে সে একটা থলি খুঁজে পেয়েছিল, তাতে আগে ঠিক করা ভাড়ার প্রায় তিনগুণ টাকা ছিল। কিন্তু মিনহির ভ্যান্ডেরহাউজেন আর তার সুন্দরী বউয়ের তারপর কি হল তা সে জানতে পারেনি।

এই রহস্যময় কাহিনী শোনার পর ডাউ দুশ্চিন্তা ও দুঃখে প্রায় ভেঙেই পড়লেন। ভ্যান্ডারহাউজেন যে তাঁর সাথে বিশাল এক প্রতারণা করেছে এতে আর তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু কেন, তিনি তা ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হতে লাগল যে যার ওইরকম চেহারা সে শয়তান ছাড়া আর কী হতে পারে। ভাইঝি নিরুদ্দেশ, যত দিন যেতে লাগল, তাঁর দুশ্চিন্তা কিছুই কমল না, বরং বেড়েই চলল। তাঁর এত আদরের ফুটফুটে মেয়েটির সঙ্গ না পেয়ে মনমরা হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। এই প্রবল বিষণ্নতা কাটানোর জন্য তিনি মাঝেমাঝেই শলকেনকে নিজের বাড়িতে ডেকে আনতেন, তার সাথে গল্প করতেন অথবা নৈশভোজ সারতেন এক টেবিলে।

এরকমই এক সন্ধেয় ডাউ ও শলকেন খাওয়াদাওয়ার পর আগুনের ধারে চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ সদর দরজায় একটা জোরাল শব্দ হওয়ায় দুজনে চমকে উঠল। কে যেন প্রাণপণে সেটার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে যাচ্ছে আর গা ঘষে যাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন চাকর সেখানে দৌড়ে দেখতে গেল কী হচ্ছে। এরপর তারা তার গলার আওয়াজ শুনতে পেল। সে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকা ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করছিল। তার উত্তরে ব্যক্তিটি কী বলল সেটা অবশ্য খুব অস্পষ্ট বলে বোঝা গেল না। তার পর হলঘরের দরজা খোলার শব্দ হল, আর মোমবাতির আলো দেখা গেল। একটা দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। শলকেন উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দিতে গেল কিন্তু তাকে সেটা করার সুযোগ না দিয়েই দরজাটা ধড়াম করে খুলে রোজ হুটোপাটি করে ঢুকে পড়ল।

রোজ হুটোপাটি করে ঢুকে পড়ল। তার চেহারাপত্র একেবারে অগোছালো

তার চেহারাপত্র একেবারে অগোছালো, মুখে গভীর ক্লান্তি ও আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক তারা হল তার পোশাক আশাক দেখে। গায়ে তার ছিল একটা মলিন উলের র‍্যাপার, তার গলার কাছ থেকে পা অবধি তাতে ঢাকা। দেখে বড়ই ছেঁড়াখোঁড়া ও পুরোন মনে হল। রোজ কোনরকমে ঘরে ঢুকেই অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনেক কষ্ট করে ডাউ ও শলকেন তার চেতনা ফিরিয়ে আনল। জ্ঞান ফিরতেই সেই ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "আমায় একটু কিছু খেতে দাও তোমরা, একটু পানীয়। তাড়াতাড়ি! নয়তো আমি আর বাঁচবো না!"

তারপর?? অপেক্ষা করো। জানা যাবে পরের সংখ্যায়

ছবিঃ মৌসুমী

দেশবিদেশের ভূত

সংহিতা

পেত্নী শব্দটা সম্ভবত প্রেতিনী থেকে এসেছে। প্রেতিনী আবার পুরুষবাচক শব্দ "প্রেত"- এর স্ত্রী- লিঙ্গ। পেত্নী বলতে সাধারণত সেই সব ভূতকে বোঝায় যারা মৃত্যুর আগে অবিবাহিত ছিল। অনূঢ়া মহিলা অতৃপ্ত আশা নিয়ে মরে গেলে পেত্নী হয়। তার সাথে আবার এরা মৃত্যুর আগে থেকেই কোনো একটা অপরাধ করতে প্রতিশ্রুত থাকে। অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি বা প্রতিশ্রুতি পূরণের অতৃপ্ত আশা এদেরকে মৃত্যুর পরেও মানুষের জগৎ থেকে মুক্তি পেতে দেয় না। তাই মৃত্যুর পর পেত্নী হয়ে এরা সেই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করে যায়। তার জন্য তারা ছলেরও আশ্রয় নেয়। নারী বা পুরুষের রূপে জীবিত মানুষের সাথে বসবাস করে। প্রতিশ্রুতি পালনের আগে এরা কিছুতেই নিজেদের রূপে ধরা দেয় না। কিন্তু রূপ লুকোতেও পারে না। যেহেতু এদের পায়ের পাতা মানুষের পায়ের পাতার উল্টো এবং কোনো রূপ ধরেই তা এরা বদলাতে পারে না। আবার এরা আশা অতৃপ্ত থাকায় মানে এরা হতাশ থাকায় সাধারণত বদমেজাজী আর খিটখিটে হয়।

Revenant বা র‍্যাভেন্যান্ট শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ reveniens থেকে, যার মানে "ফেরা"। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে র‍্যাভেন্যান্ট হলো সেই ভূত যা কবর থেকে উঠে এসে মানুষকে ভয় দেখায়। বলাবাহুল্য এই ভুতকে চোখে দেখা যায়। এদেরও উদ্দেশ্য প্রতিশোধ। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যযুগীয় নানান কাহিনীতে এরা উদয় হতো নিজের হত্যার প্রতিশোধ নিতে, এরা প্রাণ নিত এদের হন্তার। আবার এরা নিজের পরিবার- পরিজন আর প্রতিবেশীদের নাকাল করেছে শুধুই এমন উদাহরণও কম নয়।

suchipotro

বিচিত্র দুনিয়া

মরুভূমির লেকে মাছ ধরা

সাহারা মরুভূমির মাঝে অবস্থিত একটি লেক , বছরের একটি দিন এই লেকে মাছ ধরতে উপস্থিত হন প্রচুর মানুষ। জানাচ্ছেন – অরিন্দম দেবনাথ

আফ্রিকার একটা ছোট দেশ মালি। সাহারা মরুভূমির মাঝে আলজেরিয়া , গায়ানা, সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, নাইজার ইত্যাদি অনেকগুলো দেশ দিয়ে ঘেরা এই মালি। আমি অন্তত এসব অনেক দেশেরই নাম আগে শুনিনি। প্রায় ১২,৪০,০০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটা, আফ্রিকা মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম সোনা উত্তোলক দেশ। তবুও সাহারা মরুভূমির মাঝের এই দেশটির অর্ধেকেরও বেশি বাসিন্দা দারিদ্রসীমার অনেক নিচে বাস করে। প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস মালি নামক দেশটায়। সোনা ছাড়াও এই দেশটিতে পাওয়া যায় প্রচুর খনিজ নুন। তুলোও প্রচুর উৎপন্ন হয় মালিতে।

মালির রাজধানী হল বামাকো। নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত এই রাজধানী শহরটি ২০০৬ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর দ্রুতহারে বাড়তে থাকা শহরগুলোর মধ্যে ষষ্ঠস্থানে থাকা শহর। এই শহর হল সাহারা মরু অঞ্চলে ইউরোপের ব্যবসার অন্যতম প্রবেশ দ্বার। বামাকো নামটি এসেছে বাম্বারা ভাষার একটা শব্দ থেকে। এর অর্থ কুমীর ভরা নদী। নাইজার নদী আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম নদী। সারা বছর জল থাকে এই নদীতে। কোন কোন বছর বন্যাও হয়। এই নদীর দু পাশের জমি পলিসমৃদ্ধ হওয়ায় খুব ভাল ফসল হয় এই নদী উপত্যকায়। প্রাচীনকালে এই নদীপথ ধরে ইউরোপে চালান যেত সোনা, হাতির দাঁত, কোলা নাট (বাদাম) ।

মালি দেশটা ৮ টা প্রদেশে বিভক্ত। উত্তরাংশ পুরোটাই সাহারা মরুভূমির মাঝে। অধিকাংশ মানুষ বাস করে দেশের দক্ষিণাংশে। এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে নাইজার আর সেনেগাল নদী। মাছ ধরা আর চাষবাস এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা।

মালির প্রাচীন ইতিহাস বলে একটা সময় অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার আফ্রিকান পীঠস্থান ছিল মালি। ডোগোন সংস্কৃতি, তাদের উপকথা, তাদের তৈরি মুখোশ, শিল্পকলা, তাদের জীবনযাত্রা এই সব মিলিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের টেনে নিয়ে আসে মালিতে।

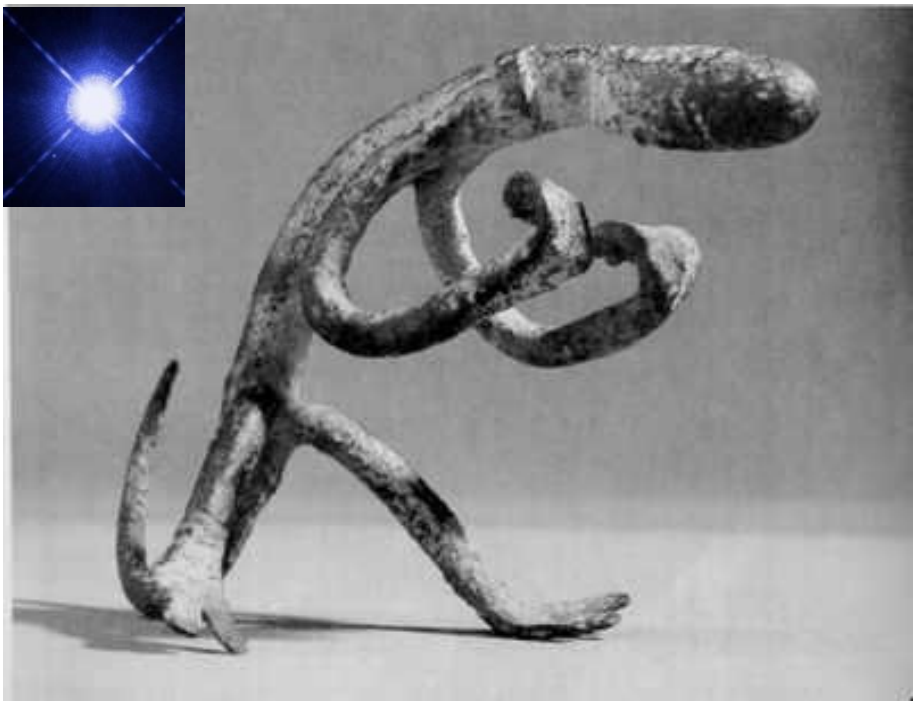

উত্তর মালির সাহারা মরুভূমির মাঝে একটা গ্রাম হল বাম্বা। বহু হাজার বছর আগে নাকি পৃথিবী থেকে প্রায় ৮.৬ আলোকবর্ষ দূর নক্ষত্র সিরিয়াস (লুব্ধক বা স্বাতী) থেকে গ্রহান্তরের নমস নামের কিছু প্রাণী এই বাম্বাগ্রামের কাছে একটি জলাশয়ে এসে নামে এবং ডোগোনদের মহাকাশ সম্পর্কিত অনেক তথ্য জানায়।

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে জয়ঢাকের দ্বাদশ আন্তর্জাল সংখ্যা (৩৫ নং মূল সংখ্যা)তে প্রকাশিত ডোগোন ও তারার দেশের দেবদূত লেখাটি পড়। লিংক দেয়া আছে এই পাতার ওপরে।)

ডোগোনরা নিজেদের নমস নামের গ্রহান্তরের প্রাণীদের উত্তরসূরি বলেই মনে করে। সিরিয়াস নক্ষত্রকে ১৯৭০ সালে প্রথম একটি মহা শক্তিশালী দুরবীণ দিয়ে দেখতে পান মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। অথচ তার অনেক আগে থেকে আফ্রিকার মরুভূমির মাঝে বসবাসকারী কিছু উপজাতীয় মানুষ জানত এই নক্ষত্রর কথা এবং এটা এদের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে খোদিত হয়েছে বহু শত বছর আগে!

এই বাম্বা গ্রামের এক প্রান্তে আছে ছোট্ট একটি লেক। এই লেকটি ডোগোনদের কাছে অতি পবিত্র। বছর ভর সামান্য হলেও জল থাকে এই লেকটিতে।

রুক্ষ, শুষ্ক, পাহাড়ি মরু অঞ্চল বাম্বাতে জলের কষ্ট সারা বছরই থাকে। খাওয়ার জল সংগ্রহ করতে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়। এমন জায়গায় এই লেকটি প্রকৃতির একটি বিস্ময়।

ডোগোনরা এমনিতে জলকে প্রচণ্ড ভয় পায়। ওরা নাইজার নদী উপত্যকার আশপাশে যেতেও পছন্দ করে না। ওরা ভালবাসে পাহাড়ি শুষ্ক মরু অঞ্চল। অথচ একটা সময় নাকি এই অঞ্চলটি ছিল সবুজ বনানীতে ঢাকা! লতা, গুল্ম, গাছপালা কোন কিছুর অভাব ছিল না। বাম্বা গ্রামের এই লেকটি জলে টইটম্বুর থাকত নাকি সারা বছর। প্রচুর মাছও পাওয়া যেত এই লেকটিতে। প্রচলিত বিশ্বাস, এই লেকটিতে এসে নেমেছিল গ্রহান্তরের মহাকাশযান। পরবর্তী সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে এই অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়।

এই লেকটি ডোগোনদের কাছে এত পবিত্র যে মাছ ধরা ত দূরের কথা, লেকটিতে নামা পর্যন্ত বারণ। শুধু একটি দিন ছাড়া। ওই বিশেষ একটি দিন মালির প্রায় সমস্ত ডোগোন উপজাতির গ্রামের লোকেরা উপস্থিত হয় এই লেকটিতে মাছ ধরতে। অনুষ্ঠানটা বুড়ো থেকে বাচ্চা সমস্ত পুরুষের জন্য। মহিলারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না। মহিলাদের জন্য এই লেকটি নিষিদ্ধ। বছরের এই এক দিনের পবিত্র মাছ ধরার উৎসবের নাম আন্তগো।

সাধারণত মে মাসে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানটির দিন নির্ধারণ করেন বাম্বা গ্রামের জ্ঞানী পুরুষদের একটি সমিতি। তারপর সেই দিনটি জানিয়ে দেওয়া হয় ডোগোন উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে। সাধারণত বিকেলবেলায় অনুষ্ঠিত হয় এই মাছ ধরা অনুষ্ঠান আন্তগো। তাপমান এই সময় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ ঘোরা ফেরা করে। অনুষ্ঠানের তারিখ নির্দিষ্ট হলে বিভিন্ন গ্রামের বাজারের মাঝে তিনটে করে বড় লাঠি পুঁতে দেওয়া হয়। এটা একটা ঘোষণা বা সঙ্কেত যে আন্তগোর দিন ঘনিয়ে আসছে। বাম্বা গ্রামের পবিত্র লেকের ঠিক মাঝখানে অনুরূপ তিনটে লাঠি পোঁতা থাকে, তারপর নির্দিষ্ট দিন ঘনিয়ে এলে লাঠিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।

এমনিতে ডোগোনরা স্বভাব জলভীরু, পাহাড়ে মরুতে থাকা ডোগোনদের কাছে জলের জীবন একটা আতঙ্কের জীবন। অথচ, এই আন্তগো এলে তাদের রূপটা পালটে যায় একেবারে। কিছুতেই মেলানো যায়না ডোগোনদের চরিত্রের এই বৈপরীত্য।

আন্তগোর দিন শয়ে শয়ে ডোগোন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জড় হয় বাম্বা লেকের ধারে। থিক থিক করতে থাকে কালো মানুষের ভিড় লেকের আশপাশে । অনেকটা আমাদের সাগরস্নান বা কুম্ভ স্নানের মত ঘটনা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই নিজেদের শরীরে কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে নেয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকেই শুরু হয় প্রার্থনা, চলে পূজাপাঠ, গানবাজনা । অবশেষে আসে বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। হাজার হাজার মানুষ একদম মৌন হয়ে যান , অপেক্ষা করেন কখন আদেশ করবেন বাম্বার জ্ঞানি ব্যক্তিটি আর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন লেকের জলে।

আদেশ পেতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে লেকের জলে , কালো মাথা আর কালো শরীর লেকের ঘোলা জলে যে ভাবে তোলপাড় করতে থাকে তা দেখে কে বলবে ডোগোনরা জলকে ভয় পায়! হাতে তৈরি ঝুড়ি আর মাছ রাখার জন্যে একটা চামড়ার থলি এই হল মাছ ধরার সরঞ্জাম।

শুরুর ঠিক আধ ঘণ্টা পরে বন্দুক দাগা হয়। অনুষ্ঠান শেষ। লেক থেকে ধরা সব মাছ জমা পড়ে বাম্বা গ্রামের মোড়লের কাছে। মোড়ল মহাশয় জমা পড়া মাছ সমান ভাবে ভাগ করেন অংশগ্রহণকারী সব গ্রামের মধ্যে। বর্তমান ডোগোনরা সব কিছু ভাগ করে নিতে

জানে, এরা যে মহাকাশ থেকে আগত গ্রহান্তরের প্রাণীদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া মানুষদের বংশধর!

suchipotro

.

আগের সংখ্যার ঘোড়া আর উটের অংকটার যে সমাধান বাকশালির পুঁথিতে রয়েছে সেটাকে আজকালকার চিহ্নটিহ্ন দিয়ে অনুবাদ করলে উত্তরটা এইরকম দাঁড়াবেঃ

ধরো সাদা ঘোড়ার দাম ‘ক’, লাল ঘোড়ার দাম ‘খ’ আর উটের দাম ‘গ’, আর প্রত্যেকে তার জন্তু থেকে দুটো করে দান করতে প্রত্যেকের কাছের জন্তুদের মোট দাম হল ‘ঘ’।

তাহলে আমরা পাব ৫ক+খ+গ = ক+৭খ+গ=ক+খ+৮গ= ঘ

- ➔ ৪ক=৬খ=৭গ=ঘ –(ক+খ+গ)
- ➔ সঠিক উত্তর পেতে হলে [ঘ –(ক+খ+গ)] কে ৪,৬,৭ এর লসাগুর দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হতে হবে, অর্থাৎ ওই লসাগুর গুণিতক হতে হবে। একেকটি গুণিতকের জন্য একেকটি সমাধান হবে।
- ➔ বাকশালির পুঁথিতে এই মানটা ধরা হয়েছে ৪,৬,৭ এর গুণফলটিকে অর্থাৎ ৪, ৬, ৭ এর গুণফলকে, যা হল গিয়ে ১৬৮।
- ➔ সেক্ষেত্রে ক=৪২, খ=২৮ আর গ=২৪।

অবশ্য এই যে সমীকরণগুচ্ছ এর অসংখ্য সমাধান হতে পারে। ঘ –(ক+খ+গ)- এর মান ১৬৮র যেকোন গুণিতক ধরলেই একএকটা ধরণের উত্তর বের হয়ে আসবে।

বাকশালির পুঁথিতে যে উত্তর দেয়া আছে তার চেয়ে ছোট উত্তরটা হবে ঘ –(ক+খ+গ) এর মান যদি ৪,৬,৭ এর লসাগু অর্থাৎ ৮৪। সেক্ষেত্রে সাদা ঘোড়া, লাল ঘোড়া আর উটের সংখ্যাটা কত হবে সেটা তোমরাই বের করে দেখে নাও।

প্রমাণ- ফল- ইচ্ছার ফরমুলা

বাকশালির পুঁথিতে আর একটা মজাদার অংকের সমাধান করতে গিয়ে এই বিচিত্র কায়দাটা কাজে লাগানো হয়েছিল।

অংকটা এইরকমঃ এক রাজার দুই চাকর। একজন রোজ ১৩/৬ দিনার মাইনে পায় আর অন্যজন পায় ৩/২ দিনার। প্রথমজনের কাছে দ্বিতীয়জন ১০ দিনার পায়। ধার শোধ করে কত দিনের মাথায় দুজনের মোট আয় সমান হবে।

কোন কৌশল ব্যবহার না করে সরল প্রাথমিক যুক্তিতে অংকটা করতে গেলে এইভাবে হবে→

প্রথমজন প্রতিদিন পায় ১৩/৬- ৩/২= ২/৩ দিনার বেশি মাইনে। তাহলে ধারের ১০ দিনার অতিরিক্ত রোজগার করতে তার লাগবে ১৫ দিন।

১৫ দিনের পর তাহলে প্রথমজন আয় করবে ৬৫/২ দিনার, শোধ দেবে ১০ দিনার, হাতে থাকবে ৪৫/২ দিনার।

১৫ দিনের পর দ্বিতীয়জন আয় করবে ৪৫/২ দিনার, ধারশোধ বাবদ পাবে ১০ দিনার, ফলে হাতে থাকবে ৬৫/২ দিনার।

অর্থাৎ পনেরোদিন বাদে প্রথমজনের কাছে দ্বিতীয়জনের থেকে (৬৫/২- ৪৫/২)= ১০ দিনার কম থাকবে।

এরপর প্রতিদিন প্রথমজনের আয় দ্বিতীয়জনের থেকে বাড়তে থাকবে ২/৩ দিনার করে।

১০ দিনারের তফাৎ ঘুচতে সময় নেবে ১০/(২/৩)=১৫ দিন।

এই পরের ১৫ দিন বাদে অর্থাৎ মোট ৩০ দিন বাদে ধারশোধটোধ করে প্রথমজনের মোট আয় দাঁড়াবে (৪৫/২)+(৬৫/২)=৫৫ দিনার।

এই পরের ১৫ দিন বাদে অর্থাৎ মোট ৩০ দিন বাদে ধারশোধটোধ পেয়ে দ্বিতীয়জনের মোট আয় দাঁড়াবে (৬৫/২)+(৪৫/২)=৫৫ দিনার।

সোজা কথায় যতদিনে প্রথমজনের মোট আয় দ্বিতীয়জনের মোট আয়ের চেয়ে ধারের পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০ দিনার বেশি হবে সেই দিনের সংখ্যাটাই হবে উত্তর।

কায়দাটা বেশ জটিল। বাকশালির পুঁথিতে একে সরল করে কীভাবে একটা কৌশলী সমাধান করেছে দেখো—

কোন লোক যদি ৮ দিনে ৫০ দিনার রোজগার করে তাহলে ১২ দিনে তার রোজগার কত হবে? চেনা ঠেকছে, তাই না? একে বলি ঐকিক নিয়মের অংক। রাজার চাকরের অংকের সমাধান করবার মাধ্যমে বাকশালির পুঁথি পাটিগণিতের এই অসম্ভব সরল অথচ শক্তিশালী সূত্রের সন্ধান দেয়

অংকটাকে বাকশালির বই লিখল এইভাবে→

৮ ৫০ ১২

৮কে সে নাম দিল ‘প্রমাণ’, ৫০কে সে নাম দিল ‘ফল’ আর ১২কে নাম দিল ‘ইচ্ছা’।

অংকটার উত্তর পাবার ফরমুলা সে বানাল এইভাবে→১২ দিনের রোজগার হবেঃ→ ‘ফল’ **X** ‘ইচ্ছা’ / ‘প্রমাণ’ = ৫০ **X ১২/ ৮ = ৭৫ দিনার**

এবার এসো এই সূত্রকে ব্যবহার করে রাজার চাকরের অংকটা করা যাকঃ

ধরো “প” দিনে তাদের আয় সমান হবে।

তাহলে “প” দিনে প্রথম চাকরের মোট আয় দ্বিতীয়জনের চেয়ে ২০ দিনার বেশি হবে। তাহলে প্রমাণ- ফল- ইচ্ছার সূত্র কাজে লাগালে পাব ১৩× প/৬ =৩ × (প/২)+২০

অর্থাৎ প=৩০ এবং তখন প্রত্যেকের রোজগার হবে ৫৫ দিনার।

দু লাইনে অংক ধরাশায়ী।

ঐকিক নিয়মের এমন সুচারুব্যবহার অংকশাস্ত্রকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। এই পথে অনেক জটিল অংকের উত্তর বের করবার একটা সহজ পথ দেখিয়েছিল বাকশালির পুঁথি। আজকের যুগে ঐকিক নিয়মটাকে অত্যন্ত সাধারণ একটা নিয়ম মনে হলেও প্রথমবার তার আবিষ্কারটা কিন্তু সাধারণ মাপের ছিল না। সে ছিল একটা বিরাট পদক্ষেপ।

বাকশালির পুঁথি নিয়ে আরো কিছু খবর থাকবে পরের সংখ্যাতে।

ক্রমশ

suchipotro

বয়স কত?

সোমনাথ

শিরীনা নতুন নতুন অঙ্ক শিখছে। করতে অনেকদিন আগেই শিখে গেছে "যোগ", এখন নতুন শিখেছে গুণ করতে। " একদিন বাবার দুই অফিসের সহকর্মী বাড়িতে এসেছে। তো সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাত পা নেড়ে তাদের বলতে থাকলো, " জানো, আমি আজকে একটা যোগ করেছি। আর একটা গুণ করেছি। আমার আর বোনের বয়সটাকে যোগ করেছি আর ' গুণ' করেছি। এই দেখো তার উত্তরগুলো," বলে দুটো কাগজ তাদের দুজনের হাতে দিল।

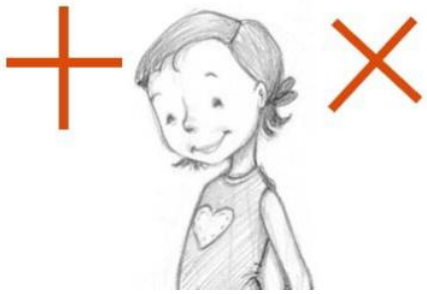

এই সময় মা ভিতর থেকে ডাক দিলো, " শিরীনা কাকুদের বিরক্ত কোরো না। শুনে শিরীনা এক দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এখন দুই কাকু তো হাতে দুই কাগজ নিয়ে বসে আছে। শিরীনার বাবারও আসতে দেরি হচ্ছে। তাই দুজনে আর কী করে, বসে বসে নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে শুরু করল।

" তা ওদের দুজনের বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না।"

" শিরীনা' র বোন কত বড় হল?"

" জানি না ঠিক, তবে এক বছরের তো বেশি হবেই।"

" হুমম, আমাকে নিশ্চয় তাহলে যোগফল টা দিয়েছে।"

" ও তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি ওদের বয়স কত।"

" ও তাহলে আমিও বুঝতে পেরেছি ওদের বয়স কত।"

গল্পটা এখানেই শেষ করছি। তোমরাও কি বুঝতে পেরেছ ওদের বয়স কত?

suchipotro

প্রফেসর ট্যানজেন্টের গল্প (পর্ব ২)

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

স্কুলের মাঠে পোঁতা পতাকাদন্ডের উচ্চতা নির্ধারণ করছে একদল শ্রমিক। তাদের কাছে রয়েছে শুধু গজ ফিতে। কিন্তু কিভাবে দন্ডের আগায় ফিতেটা ধরা যায় সেটা কেউ বুঝে উঠছে না।

প্রফেসর ট্যানজেন্ট কাছেই ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, "মূর্খের দল, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির সাহায্যে খুব সহজেই এর উচ্চতা বার করা যায়।"

দন্ড ও তার ছায়া নিয়ে সমকোণী ত্রিভুজটি ঠিক কিভাবে গঠন করা যায়, আকাশের দিকে চেয়ে সেটাই ভাবছিলেন প্রফেসর। কোথা থেকে বাংলার শিক্ষক অবিনাশবাবু এসে বললেন, "এতো কান্ড করেন কেন?"

এই বলে লাঠিটা মাটি থেকে তুলে জমিতে শুইয়ে দিলেন। গজফিতেয় সহজেই মাপ করে বলে দিলেন, তিরিশ ফুট!

অবিনাশবাবুকে হাত-টাত ঝেড়ে চলে যেতে দেখে প্রফেসর ট্যানজেন্ট গর্জে উঠলেন, "এটা কী হল অবিনাশবাবু? ওরা মাপছিল উচ্চতা। আর আপনি দৈর্ঘ্য মেপে দিয়ে খুব বাহাদুরি দেখালেন?"

* * *

প্রফেসর ট্যানজেন্ট তাঁর দুই বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে আফ্রিকা সফরে গেছেন। কেনিয়ার তৃণভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে একটা সাদা ছাগল দেখতে পেলেন তাঁরা। এক বন্ধু বলে উঠলেন, "আরে, কেনিয়ার ছাগলগুলো দেখছি সাদা হয়! "

অপর বন্ধু বললেন, "উঁহু, ঠিক বললে না। বল, কেনিয়ার কিছু কিছু ছাগল সাদাও হয়! "

প্রফেসর ট্যানজেন্ট তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "আর যে কবে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে? এই ছাগলটা দেখে আমরা যা বুঝতে পারি তা হল, কেনিয়ায় অন্তত একটি ছাগল আছে, যার অন্তত একটা দিক সাদা! "

* * *

প্রফেসর ট্যানজেন্ট কখনো বিমানযাত্রা করেন না। কেননা সারা বিশ্বের উড্ডয়ন পরিসংখ্যান ঘেঁটে তিনি আবিষ্কার করেছেন, যেকোনো বিমানে একটি বোমা থাকার সম্ভাবনা এক লক্ষে এক। প্রফেসরের মতো বিচক্ষণ মানুষ সব জেনেশুনে এতোটা জীবনের ঝুঁকি কখনও নিতে পারেন!

একবার এক গণিত সম্মেলনে তাঁর এক পুরনো সহকর্মীর সাথে দেখা। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি প্রফেসর, কোন ট্রেনে এলে?"

প্রফেসর ট্যানজেন্ট স্মিত হেসে বললেন, "এবার আমি প্লেনে এসেছি।"

বন্ধুটি তো অবাক। বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তোমার ঐ বোমার থিওরিটা?"

"সে থিওরিতে কোনও ভুল নেই," প্রফেসর ব্যাখ্যা করে বললেন, "প্লেনে একটি বোমা থাকার সম্ভাবনা এক লক্ষে একই। তাহলে দু' টি বোমা থাকার সম্ভাবনা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে মাত্র দশ বিলিয়নে এক। এটা এতোই কম যে অনায়াসে আমি তাকে ইগনোর করতে পারি, তাই না?"

"তা নাহয় পারো," বন্ধুটির চোখ গোল, "কিন্তু দু' টো বোমার কথা আসছে কেন?"

"প্রিয় বন্ধু, এটা আমার মাথায় এতদিন আসেনি, প্রফেসর ট্যানজেন্টের সহাস্য উত্তর, ঝুঁকি কমাতে এবার এইটা আমিই সঙ্গে করে এনেছি।" পকেট থেকে সন্তর্পণে একটা বোমা বার করে দেখান প্রফেসর ট্যানজেন্ট!

* * *

সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারদের এক সেমিনারে প্রফেসর ট্যানজেন্ট প্রোব্যাবিলিটি নিয়ে বক্তৃতা করছেন। আকাশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, "খোলা আকাশে একটিমাত্র বোমারু বিমানের নিশানায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে সেটি বিমানকে আঘাত করার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ।"

একজন ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষানবিশ জানতে চাইলেন, "ক্ষেপণাস্ত্রটি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়? মানে যদি এমনভাবে ছুঁড়ি যে সেটা বিমানের গায়ে না লেগে শুধু পাশ দিয়ে যায়?"

"সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা বিমানে লাগবার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বই ভাগ," প্রফেসর ট্যানজেন্টের নির্লিপ্ত উত্তর!

* * *

সম্প্রতি কোনও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজে প্রফেসর ট্যানজেন্ট কিছুদিন হল গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর আরও কোনও খবর পেলে জানাবো' খন।

suchipotro

বিচিত্র জীবজগত

হোরাফ (নাকি জিরিন?)

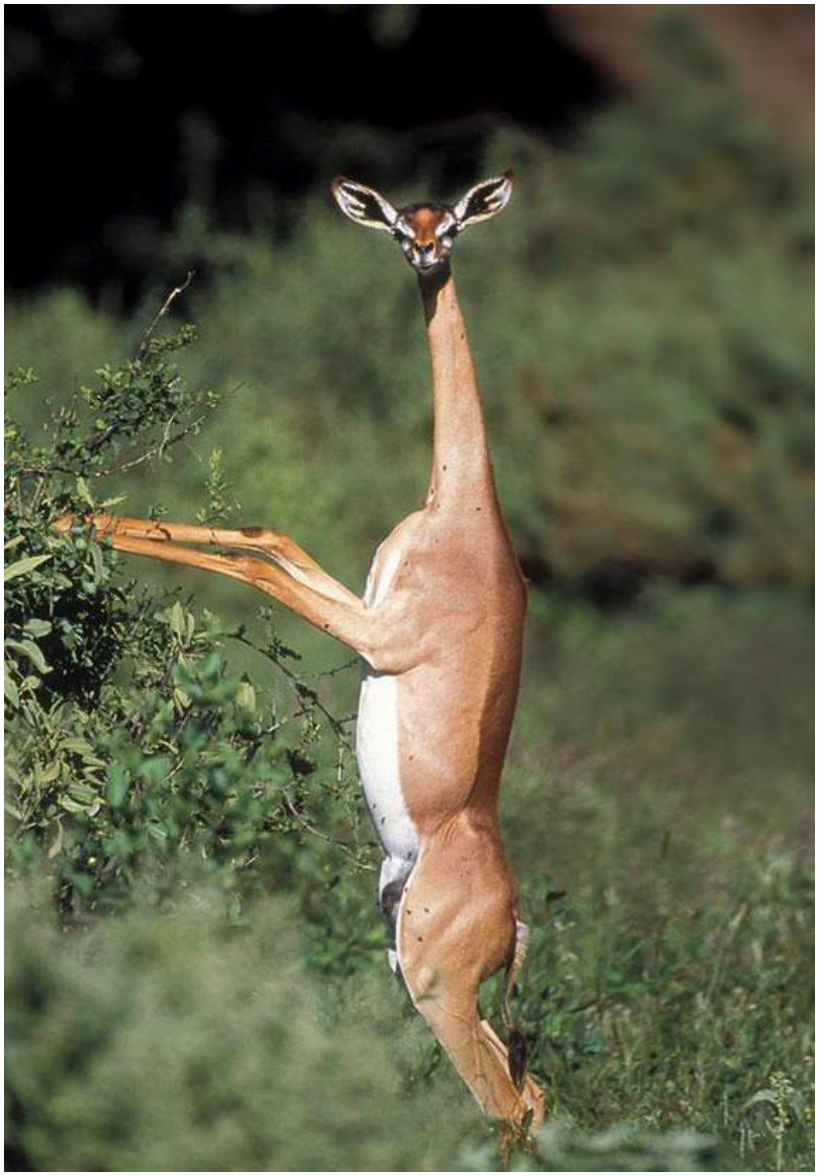

আফ্রিকার গ্রেট লেক এলাকায় শুকনো জঙ্গলে এই বিচিত্র হরিণের বাস।

মাথাটা এইটুকুনি, আর গলাটা জিরাফের মতন সরু আর লম্বা। তাদের স্থানীয় নাম তাই জেরেনুক মানে জিরাফগলা হরিণ। এদের পা- ও আশ্চর্যরকম লম্বা। দৌড়োতে পারে মোটরগাড়ির গতিতে। কিন্তু হলে কী হয়, ওই লম্বা শিড়িঙ্গে পায়ের জন্য দৌড়োতে গিয়ে ঠ্যাঙও ভেঙে বসে প্রায়শ।

লম্বায় দেড় মিটার ছাড়িয়ে যায় এরা, কিন্তু ওজন মাত্র ৪৫ কিলোগ্রাম। মেয়েদের ওজন তো আরও কম । মাত্র ত্রিশ কিলো।

খেতে ভালোবাসে কাঁটাঝোপ আর গাছের পাতা। মাটিতে মুখ দিয়ে ঘাস এরা কমই খায়। মজার খবর হল এরা আলাদা করে কখনো জল খায় না। যা পাতালতা খায় ওর মধ্যের জল দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়।ফলে কঠোরতম প্রকৃতিতেও এই সুন্দর প্রাণীটা দিব্যি সুন্দর হয়েই বেঁচে থাকতে পারে।

বড় বড় চোখ, দীঘল গলা আর ব্যালেরিনাদের মত লম্বা লম্বা পায়ের এই প্রাণীটির শরীরে রাগ গোঁসার গন্ধটুকুও নেই। বড় বিনয়ী জীব এরা। শুধু তাই নয় প্রাণীজগতের মধ্যে এদেরই দেখা যায় সবচেয়ে বেশি অন্য স্বজাতীয় প্রাণীকে বিপদের সময় সাহায্য করতে। প্রাচীন আফ্রিকান উপকথায় তাই এদের ডাকা হত ‘বিনয়ের রানি’ নামে।

suchipotro

চেনা পাখির অচেনা পরিচয়

মৌটুসী

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট আকারের এই পাখিটি প্রধানত ফুল থেকে মধু খেয়ে বেড়ায়। এছাড়া ফলমূল ও পোকামাকড়ও খায়। মাকড়সার জাল ও খড়কুটো দিয়ে বাসা বানায়। বড় বড় পাতা বা সরু ডালপালায় পাউচ ব্যাগের মতো বাসাগুলি ঝুলতে থাকে। মধু সংগ্রহের সময় খুব দ্রুত ডানা ঝাপটানোর সাহায্যে বাতাসে ভেসে থাকে।

suchipotro

প্রতিবেশী গাছ

আতা আর নোনা গাছ

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ
এত ডাকি তবু কথা
কয় না কেন বৌ

যে গাছটি সম্বন্ধে এত সুন্দর ছড়া রয়েছে সেই গাছটির নাম যে সব বাঙালি ছেলেবেলা থেকেই জানে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই গাছটি শহরাঞ্চলে বিশেষ আর দেখা যায় না। তবে গ্রামের খামার বাড়িতে বা বাগানে আম, কাঁঠাল , নারকেল গাছের সঙ্গে এর দেখা মেলে আজও।

এই গাছটি আম,জাম গাছের মত বৃক্ষ শ্রেণীর নয়। বরং জবা গাছের মত গুল্ম জাতীয় গাছ। আতা গাছের পাকা ফল খুবই সুস্বাদু। ইংরাজিতে তাই এই গাছটিকে সুগার অ্যাপল বলে। আর বিজ্ঞানীরা ডাকেন অন্য নামে—অ্যানোনা স্কুয়ামোসা।

এই গাছ আট থেকে চোদ্দো- পনেরো ফুটের মত লম্বা হয়, তবে সঠিক পরিচর্যা করলে আরও বড় হতে পারে। সবুজ পাতাগুলি দুই থেকে ছ ইঞ্চি লম্বা, বর্শার ফলার মত আকৃতি, তবে অগ্রভাগ সামান্য ভোঁতা। পত্রবৃন্ত রোমশ। পাতাগুলি মুঠির মধ্যে রেখে ডললে একটি উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়। ডালের অগ্রভাগে এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা সুগন্ধযুক্ত ফুল ফোটে। ফুল সবুজাভ হলুদ রঙের।

আতা ফল আকারে ডিম্বাকৃতি, গোলাকার বা কতকটা মোচাকৃতি। সাধারণত আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা। কাঁচা অবস্থায় সবুজ। পাকলে রঙের পরিবর্তন ঘটে হলদেটে সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। এই অবস্থায় হালকা সুগন্ধ বের হয়। ফলটির বহিঃত্বক অমসৃণ, অনেকগুলি আয়তাকার গাঁটের মতন দেখা যায়। পাকা ফলের স্বাদ মিষ্টি, খানিকটা ক্ষীরের মত। তাই পাকা ফলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বাজারে। পাকা ফলের মধ্যে ঘনকৃষ্ণবর্ণের অনেকগুলি করে বীজ থাকে। বীজগুলি লম্বাটে (আধ ইঞ্চি) এবং শক্ত। ফল পাকলে নরম হয়ে যায় এবং দিনদুয়েকের বেশি রাখা যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় রাখলে চার- পাঁচদিন পর্যন্ত থাকতে পারে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়দেশে পাকা আতাফলের মিষ্ট শাঁসটি ছাঁকনিতে ছেঁকে নেয়া হয় ও দুশ বা আইসক্রিমের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

আতা গাছ দক্ষিণ আমেরিকার বিষুব অঞ্চলের গাছ বলেই অনেকে মনে করেন। আজ থেকে চারশো বছরেরও আগে আতা গাছের বীজ দক্ষিণ ভারতে নিয়ে আসে পর্তুগিজরা। সেখান থেকে সারা ভারতে এই গাছটি ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের মতন সারা পৃথিবীতেই প্রায় আতা গাছ কমবেশি দেখা যায়। তবে উষ্ণপ্রধান অঞ্চলেই এই গাছ বেশি চোখে পড়ে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আতা গাছের নাম বিভিন্ন। এর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল—আর্টিকাম, সারিকা, সীতাফল, আথা চাক্কা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে আতা গাছের ডাকনামের মধ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। নেপাল এবং পাকিস্তানে আতা গাছের নাম সারিকা। ইন্দোনেশিয়ায় জনসাধারণ একে শ্রীকায়া বলে ডাকেন। অপরদিকে তাইওয়ানের মানুষেরা ডাকেন শাক্য নামে। কন একজন চাষি আতাফলের সঙ্গে শাক্যমুনির মাথার সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। তাই এর নাম হয়েছে শাক্য। ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) এর নাম আজা থি। আর ফিলিপাইনসের মানুষরা বলেন আতিস।

আতাফলের নানা গুণ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। পাকা ফলে ভিটামিন সি, বিভিন্ন শ্রেণীর ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। ফিলিপিন দেশের একটি কোম্পানি আতা ফল থেকে মাদক দ্রব্য তৈরি করে ব্যবসা করে। তাছাড়া কাঁচা ফল কোষ্ঠবদ্ধতা সারাবার জন্য কাজে লাগে। বীজচূর্ণ মাথার উকুন মারবার কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই চূর্ণ চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক।

আতা গাছের কথা উঠলেই একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় নোনা আতার নাম। এই গাছটি আতা গাছের আত্মীয়, কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যানোনা রেটিকুলাটা। ইংরিজিভাষীরা একে ডাকেন কাস্টার্ড অ্যাপল বলে। তাছাড়া ফলটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে, যেমন বুলস্ হার্ট, বুলক্স্ হার্ট বা অক্স হার্ট।

আতা গাছের মত নোনা আতা গাছ গ্রামাঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়। তবে আতা গাছের সঙ্গে এই গাছের সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই গাছের পাতার ডগাটি আতা গাছের তুলনায় বেশি ছুঁচালো। পত্রবৃন্তে কোন রোম থাকে না। ফলটি ত্রিকোণাকৃতি হৃৎপিন্ডের মত অথবা গোলাকৃতি বা আয়তাকার। ফল পাকলে পরে হলুদ বা বাদামি বর্ণের সঙ্গে লাল ছাপ দেখা যায়।

নোনা আতা গাছের ছাল ডায়েরিয়া বা উদরাময় প্রতিরোধকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের মানুষেরা নোনা আতা ফল কেশবর্ধনকারী হিসেবে ব্যবহার করেন। এছাড়া বীজচূর্ণ চুলে উকুন হলে মাথায় লাগানো হয়। কোন স্থান পুড়ে গেলে জ্বালা- যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আতা ফল ব্যবহার করা হয়।

আতা এবং নোনা আতা গাছের ফল সুস্বাদু হওয়ার সুবাদে মানুষের প্রিয়। তাছাড়া এর ভেষজ গুণও অনস্বীকার্য।

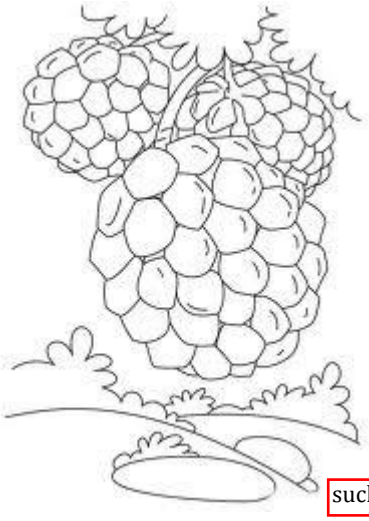

suchipotro

মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

সংহিতা

মধ্যযুগে ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন কোনো উদ্ভাবনী দেখা দেয় নি। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মেলবন্ধন ঘটেছিল। কয়েকটা বই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন বঙ্গসেন সংহিতা বা চিকিৎসাসার সংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, সার্ঙ্গধর সংহিতা, যাগারাতবাজার, মাজিনে- ই- দিয়ায়ে, তিব্বে আওরঙ্গজেবি, তিব্বি ফিরোজশাহি, ফিরদাউসু- হিকমত, মুসালাজাতি- দারশিকোহি।

বঙ্গসেন সংহিতা বা চিকিৎসাসার সংগ্রহ প্রণেতা বঙ্গসেন ছিলেন চিকিৎসক গদাধরের সন্তান। বঙ্গসেনের বইটি মূলত সুশ্রুত সংহিতার পুণর্গ্রন্থন। বইটা দু খন্ডে সম্পূর্ণ। প্রথমখন্ডে আছে নিদানাধিকার থেকে স্লিপদরোগাধিকার। দ্বিতীয়খন্ডের বিস্তার বিদ্রাধি থেকে দীপন- প্রচন্দ্রব্য- লক্ষণাধিকারা।

ভাবপ্রকাশের প্রণেতা ভাবমিশ্র। ত্রয়োদশ শতকে গ্রন্থিত সার্ঙ্গধর সংহিতা প্রথম চিকিৎসায় আফিম এবং পারদের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে। স্পষ্টত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় এই দুই দ্রব্যের ব্যবহারের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই দ্রব্য দুটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে ভারতে আসা মুসলমান চিকিৎসকদের সঙ্গে এসেছিল। এই সঙ্গে এসেছিল দেহরসের পরিস্থিতি নিরূপণের প্রক্রিয়া। রোগনির্ণয়ে মূত্র পরীক্ষার ব্যবহার।

সেই সঙ্গে এসেছিল ইউনানি তিব চিকিৎসা পদ্ধতি। আওরঙ্গজেবকে উৎসর্গ করে লেখা হয়েছিল তিব্বে আওরঙ্গজেবি, আবার ফিরোজ শাহ তুঘলক নিজেই লিখে ফেলেছিলেন তিব্বি ফিরোজশাহি।

গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে ভারতীয় আয়ুর্বেদের সামগ্রিক সংকলনটি প্রথমে করেছিলেন আলি- বান- রাব্বান। সেই সংকলনটি ফিরদাউসু- হিকমত নামে খ্যাত। পরে এরকমই আরেকটি সংকলন করেছিলেন নুরুদ্দিন মহম্মদ শাহজাদা দারাশিকোকে উৎসর্গ করে। তার নাম মুসালাজাতি- দারশিকোহি। হাকিম দিয়া মহম্মদ গ্রন্থিত করেছিলেন আরবি, ফারসি আর আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁর মাজিনে- ই- দিয়ায়ে সংকলনে।

suchipotro

সেতু

কিশোর ঘোষাল

ভারতবর্ষের সেতুর ইতিহাস বেশ পুরোনো। সেই রামায়ণের যুগেই, শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সেতুটি তৈরি করেছিলেন তাঁর বানর সেনার সাহায্যে। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম থেকে শ্রীলংকার উত্তর- পশ্চিমে মান্নার দ্বীপ পর্যন্ত সেই সেতুর ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ৩০ কিলোমিটার। রামেশ্বরম মন্দিরের নথি থেকে জানা যায় ১৪৮০ সাল পর্যন্ত নাকি এই সেতুতে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যেত শ্রীলঙ্কার ওই দ্বীপে। ওই বছর এক ভয়ংকর ঘূর্ণি ঝড়ে ওই সেতু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের পর ভারতবর্ষে সেতু নিয়ে খুব একটা ভাবনা চিন্তার আর তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে ভারতে আধুনিক সেতু গড়ার সূত্রপাত ইংরেজ সরকারের হাত ধরে মোটামুটি ১৮৫৭ সালের পর। ১৮৫৭ সাল শুনেই তোমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে সিপাহী বিদ্রোহের তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। ঠিক তাই। তার আগে ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল, বম্বে (এখনকার মুম্বাই) থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেল চলাচল শুরু হলেও, রেলপথ প্রসারের ব্যাপারে ইংরেজদের সে সময় তেমন গা ছিল না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ধাক্কা, ইংরেজদের নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য করেছিল।

সেই সময় ইংরেজ সরকার অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে হবে রেলপথ। তোমারা কি ভাবছো আমাদের যাওয়া আসার সুবিধের জন্যে? মোটেই তা নয়। সারা ভারতে রেলপথ ছড়িয়ে দিতে পারলে, ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সৈন্যবাহিনীর যাতায়াত অনেক সহজ হবে। ভবিষ্যতে আবার কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ হলে, চট করে পৌঁছে দেওয়া যাবে একসঙ্গে অনেক সৈন্যবাহিনী। আরও একটা বিশাল স্বার্থ ছিল, ভারতের যত সেরা পণ্য, সে শস্যই হোক আর খনিজ সম্পদ, প্রচুর পরিমাণে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া যাবে ভারতের তিনটি বন্দর শহরে – কলকাতা, বম্বে আর মাদ্রাজ (এখনকার চেন্নাই)। এরপর যাত্রীপরিবহন হল বাড়তি পাওনা।

তাই হলো। ১৮৮০ সাল মানে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে ইংরেজ সরকার প্রায় ১৪৫০০ কিলোমিটার রেলপথ বিছিয়ে জুড়ে দিল ভারতের চারটে প্রধান শহর, কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বম্বে।

আর এই রেলপথ আর তার সঙ্গে উন্নত স্থলপথ বানাতে গিয়েই নদীমাতৃক ভারতবর্ষের অজস্র বড়ো, মেজ, ছোট নদীর ওপর বানিয়ে তুলতে হল অজস্র সেতু। শুরু হল ভারতের সেতু বানানোর প্রক্রিয়া। আজ পর্যন্ত নির্মাণ হওয়া হাজার হাজার সেতুর মধ্যে কয়েকটি সেতুর কথা এখানে বলছিঃ–

১. বান্দ্রা-ওরলি সী লিংকঃ বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ এই সাগরসেতুপথের নির্মাণ ২০০০ সালে শুরু করেছিল, ভারতবর্ষের অন্যতম বড়ো নির্মাণ সংস্থা হিন্দুস্থান কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানি। এটির নির্মাণ শেষ হয়েছিল

২৪শে মার্চ ২০১০ সালে, যদিও আংশিকভাবে সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছিল ৩০শে জুন ২০০৯। দৈর্ঘ্যে এটি ৫.৬ কিলোমিটার। দুটি ৪ লেনের রাস্তা নিয়ে এই সেতু ৪০ মিটার চওড়া এবং সমুদ্রতল থেকে সর্বোচ্চ উচ্চতা ১২৬ মিটার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে কংক্রিট (চলিত কথায় যাকে আমরা ঢালাই বলি) আর স্টিল দিয়ে তৈরি এই ব্রিজটির প্রধান কাঠামোটি কেব্‌ল্‌ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উঁচু স্টিলের টাওয়ার থেকে। কেব্‌ল্‌ হল ভীষণ শক্তিশালী সূক্ষ্ম স্টিলের তারের অনেকগুলি গুছি, ভীষণ স্থিতিস্থাপক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের ঢাকনায় ঢাকা থাকে। সেতুর ভার, তার ওপরে ছুটে চলা অজস্র গাড়ির ভার এই কেব্‌ল্‌গুলো ধরে রেখেছে। সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় এই স্টিলের তার যাতে ক্ষয়ে না যায় তাই ওই ঢাকনার ব্যবস্থা। রোদ, জল ঝড় সব কিছুর থেকে বাঁচিয়ে রাখা ঢাকনার প্লাস্টিক সাধারণ প্লাস্টিক নয় বুঝতেই পারছো।

২. মহাত্মা গান্ধী সেতুঃ ভারতবর্ষতো বটেই এশিয়ার মধ্যে এটি দীর্ঘতম নদী পথসেতু। গঙ্গার দুই পাড়ের দুই শহর পাটনা আর হাজিপুরের সংযোগকারী এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৫.৫৭৫ কিলোমিটার। ৪ লেনের এই ব্রিজটি চওড়ায় ২৫ মিটার। ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ দশবছর ধরে এই সেতুটি নির্মাণ করেছিল ভারতের বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা গ্যামন ইন্ডিয়া লিমিটেড।
বিশাল এই সেতু পাটনা ও হাজিপুর শহরের বর্তমান যান পরিবহনের পক্ষে আর যথেষ্ট না হওয়ায়, এর পাশাপাশি আরো একটি সেতু বানানোর পরিকল্পনা চলছে।

৩. বিদ্যাসাগর সেতুঃ এই সেতুটি আমাদের কলকাতা শহরের সঙ্গে হাওড়ার নতুন যোগসূত্র। দৈর্ঘ্যে মাত্র ৮২২.৯৬ মিটার হলেও এই সেতুর বিশেষত্ব এর প্রযুক্তির জন্যে। গঙ্গার জলতল থেকে এর উচ্চতা ২৬ মিটার, বড়ো বড়ো জাহাজ অনায়াসে এই সেতুর নীচে দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে। তেসরা জুলাই ১৯৭৯ এর নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ১০ই অক্টোবর ১৯৯২। এত ছোট দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণে প্রায় তের বছর সময় লাগাও এক অনন্য উদাহরণ। এই বিলম্বের কারণ কিছুটা প্রযুক্তিগত জটিলতা হলেও, সেতু নির্মাণের জন্য যথেষ্ট জায়গা ও জমি পাওয়ার ব্যাপারে আইনি জটিলতাই ছিল প্রধান কারণ। এই সেতুটি পুরোটাই মাত্র দুটি উঁচু টাওয়ারের মাথা থেকে কেব্‌লে ঝুলে আছে। কেব্‌ল্‌ ব্যাপারটা কি সেটা তো তোমরা আগেই মোটামুটি জেনে গেছ বান্দ্রা -ওরলি সি লিংক থেকে। ভারতে বিদ্যাসাগর সেতুই দীর্ঘতম কেব্‌ল্‌ সেতু এবং এশিয়ার মধ্যেও অন্যতম।
দেশের প্রধান তিনটে সেতুর কথা তো শুনলে এবার চলো একটু বিদেশে যাই। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ দুটি সেতুই আছে চিন দেশে।

১. দাংয়িয়াং- কিউনশান মহা সেতুঃ চিনের ইয়াংসি নদীর ব- দ্বীপ অঞ্চলের নদী, নালা, নীচু জলা জমি আর অনেক সরোবরের ওপর দিয়ে বানানো এই সেতুর দৈর্ঘ্য ১৬৪.৮ কিলোমিটার। ২০০৬ সালে নির্মাণ শুরু হয়ে, ২০১০ সালে এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ৩০শে জুন ২০১১ পরিবহনের জন্যে এই সেতু খুলে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত এই সেতুটিই বিশ্বের দীর্ঘতম।

চিনের সাংহাই শহর থেকে পূর্ব চিনের জিয়াংসু প্রদেশের নানজিং পর্যন্ত এই সেতুর ব্যাপ্তি। পশ্চিম থেকে ইয়াংসি নদীর ৫ থেকে ৫০ মাইল দূরত্ব বরাবর দাংয়িয়াং, চাংঝাউ, উক্সি, সুঝাউ শহর হয়ে একদম পূর্বের শহর কিউনশানকে জুড়ে দিয়েছে এই দ্রুতগামী রেল সেতু। ওপরের ছবিটি প্রায় ৯.০০ কিলোমিটার লম্বা ইয়াংশেং লেকের ওপরে সেতুর একটি অংশের ছবি।

২. তিয়াংজিং মহা সেতুঃ চিনের ১১৩.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতু। বেজিং থেকে সাংহাই দ্রুতগামী রেলপথের একটা অংশ এই রেলসেতু। চিনের লাংফাং শহরের সঙ্গে কিংজিয়ান শহরকে যুক্ত করেছে এই সেতু। এই সেতুটিরও নির্মাণ মোটামুটি ২০০৬ সালে শুরু হয়ে ২০১০ সালে সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং ৩০শে জুন ২০১১ থেকে চালু হয়ে যায় রেল পরিষেবা।

দৈর্ঘ্যে আর প্রযুক্তিতে বড়োসড়ো দেশ বিদেশের অনেক সেতুর কথা তোমরা শুনলে এবার বলি আমার পছন্দের সুন্দর দুটি সেতুর কথা, যারা দৈর্ঘ্যে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু ট্রেনে বা বাসে সেই সেতুগুলি পার হতে খুব ভাল লাগে।

পম্বন সেতুঃ মূল ভারত ভূখন্ডের সঙ্গে রামেশ্বরমের পম্বন দ্বীপের যোগসূত্র এই সেতু লম্বায় ২.৩৪ কিলোমিটার। পাশাপাশি দুটি সেতু একটি রাস্তা আর অন্যটি রেলপথ, বরাবর পার করে দিয়েছে পক প্রণালী। রেলসেতুর নির্মাণ ১৯১৩ সালে শুরু হয়ে ১৯১৪ সালে শেষ হয়ে জনগণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত এই সেতুই ছিল ভারতের দীর্ঘতম সাগরসেতু। দুপাশে নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে এই ট্রেনযাত্রায় যারা গিয়েছ, তারা নিশ্চয়ই কোনদিন ভুলতে পারবে না সেই যাত্রা।

করোনেশন সেতুঃ সিকিম বা কালিম্পং যাবার পথে এই সেতুটি অনেকেই দেখে থাকবে। তিস্তা নদীর উপর খুব সুন্দর ছোট্ট সেতুটি প্রযুক্তিগতভাবে একটু পুরানো হলেও খুব কাজের। তিস্তা পার করে এই সেতু দার্জিলিং জেলার সঙ্গে জলপাইগুড়িকে জুড়ে দিয়েছে। ১৯৩৭ সালে শুরু হয়ে এই সেতু সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৪১ সালে। ইংরিজি করোনেশন মানে রাজা বা রানির অভিষেক, ইংল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রানি এলিজাবেথের অভিষেকের স্মৃতিতে নির্মিত এই সেতুর অন্য নাম সেবক ব্রিজ। দুপাশে পাহাড়ের সবুজ জঙ্গল, নিচে প্রবল স্রোতে বয়ে চলা তিস্তা, পায়ে হেঁটে এই সেতু পার হওয়ার সময়, এর স্থাপত্যকে প্রকৃতির থেকে খুব আলাদা মনে হয় না, এতই সহজ আর সুন্দর।

suchipotro

মণিপুরের জীববৈচিত্র

মণিপুরের বন ইন্দো- বার্মা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের অন্তর্গত কিনা তার কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারত- মায়ানমার –চীনের অন্তর্বর্তী বন হিসেবে মণিপুরের বনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তার কারণ ব্রো- অ্যান্টলার্ড ডিয়ার বা সাঙ্গাই – এর অস্তিত্ব কেবলমাত্র মণিপুরেই সীমাবদ্ধ।

মণিপুরের সামগ্রিক ভূভাগের শতকরা আটাত্তর ভাগের অল্প বেশি এলাকা জুড়ে বনভূমি বিস্তৃত। এর মধ্যে রিজার্ভ ফরেস্ট মাত্র শতকরা ৮. ৪২ ভাগ ও সংরক্ষিত বন ২৩. ৯৫%। বাকি ৬৭. ৬৩ শতাংশ বনভূমি বিশেষ কোনো পর্যায়ভুক্ত নয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে একটি জাতীয় উদ্যান, কেইবুল লামাজো ন্যাশনাল পার্ক এবং একমাত্র অভয়ারণ্য ইয়াংগাও লাকচাও স্যাংচুয়ারি। এই দুটি এলাকা মিলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট দুশো চব্বিশ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়াও রয়েছে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত এলাকা যেমন সিরোই জাতীয় উদ্যান। এছাড়াও কৈলাম, জিরি মাকরু, জেইলাদ এবং বুনিং – এই চারটি এলাকায় অভয়ারণ্য প্রকল্পেরও প্রস্তাব আছে।

মণিপুর রাজ্যের প্রায় সতের হাজার নব্বই বর্গ কিলোমিটার এলাকা বনে ঢাকা। এর মধ্যে অতি ঘন বন যদিও আছে মাত্র ৭৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়, তবে মাঝারি ঘনত্বের বন দেখা যায় ৬,১৫১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। উন্মুক্ত বন আছে ১০, ২০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের হিসেবে এখানে মূলত দশ ধরনের বন দেখা যায় যেগুলোকে পাঁচটা গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছে। সেগুলো হলো ক্রান্তীয় প্রায় চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন,

উপক্রান্তীয় দীর্ঘপত্রী পাহাড়ি বন, উপক্রান্তীয় পাইন বন এবং পার্বত্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বন। এর থেকেই বোঝা যায় যে সংখ্যা বিচারে অনেক প্রজাতির গাছ মণিপুরে পাওয়া যায়। কারণ এই বনের এই গোষ্ঠীবিভাগ মূলত বৃক্ষ জাতীয় গাছের ভিত্তিতে করা হয়। এই সব বৃক্ষ যে আবহাওয়া, মৃত্তিকা এবং ভূ- প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তার পরিপোষণে অনেক গুল্ম এবং লতাও পাওয়া যায়। এই বিচিত্র উদ্ভিদ জগৎ থেকে রসদ পায় বিভিন্ন প্রাণীও।

তেমনই প্রাণী সাঙ্গাই বা ব্রো- অ্যান্টলার্ড ডিয়ার। কিন্তু এরা সীমাবদ্ধ কেইবুল লামাজো ন্যাশনাল পার্ক এলাকাতে। কেইবুল লামাজো ন্যাশনাল পার্কের উত্তর- পশ্চিমে রয়েছে লোকতাক হ্রদ। মিষ্টি জলের এই বিচিত্র হ্রদে দেখা যায় ভাসমান ঘাস, পচনশীল জৈব আর মাটির গুচ্ছ।

এগুলোকে ফিউমিড বলে। কোনো কোনো গুচ্ছ এতো বড়ো যে তার ওপর বাসাও বানানো যায়। এইসব বাসায় থাকে ফুমশংগ জেলেরা।

লোকতাক মানে বদ্ধ জলধারা। জীববৈচিত্র আর প্রাকৃতিক বৈচিত্রের জন্য লোকতাক হ্রদ তকমা পেয়েছে রামসর সাইটের। পুরো মণিপুরের জলবিদ্যুতের উৎস হলেও এই হ্রদের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্বও অপরিসীম।

suchipotro

অথ হনুমান কথা

স্বপ্না লাহিড়ী

জানুয়ারি মাস শেষ হতে চলেছে, কিন্তু এখনো কনকনে ঠান্ডা এখানে। সপ্তাহখানেকের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিলো একটা কাজে। সেদিন ফিরে এসে কলেজে কয়েকটা ক্লাস নিয়ে আর কিছু কাজ সেরে আমার স্কুলে পৌঁছতে পৌঁছতে শীতের বেলা প্রায় ঢলে পড়ে.ছিল। ছুটি হব হব করছে তখন। স্কুল অফিসের সামনে স্কুটারটা দাঁড় করাতেই ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের বাচ্চারা দৌড়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরল | চাপা উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল ওদের। অভিমান ঝরা কন্ঠে অনুযোগ, "এত দেরি করতে হয়? ল্যাবে তোমার জন্যে কী রেখেছি দেখবে চল।" আমি আমার স্কুলের ছেলেমেয়েদের খুব আপনজন, তাই দূরত্বের কোন বালাই নেই। এদের বেশির ভাগই আমাদের স্কুলে সেই কেজি ক্লাস থেকে পড়ছে। আর যারা পরে এসেছে, তারা এদের তালেই তাল দিয়েছে। এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

এরা এমনিতে খুবই নিয়ম মানা ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু হঠাৎ এত উত্তেজনা কীসের! মনে মনে ভাবলাম, গিয়েই দেখি কী কান্ডটি ঘটিয়েছে এরা! দূর থেকে দেখলাম আমাদের বায়োলজির টিচার মৌসুমী ও পদার্থবিদ্যার দেবাশীষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। ল্যাবে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার তো চশমাশুদ্ধু চোখ কপালে। হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটা তেলের টিনে ফরমালিনে চোবানো আস্ত একটা হনুমান !!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কার কীর্তি?"

দেবাশীষ মাথা চুলকিয়ে বলল, "স্কুলে আসার রাস্তায় এটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম, তাই-- "

আমি বললাম "তাই তুই তুলে নিয়ে এলি এটাকে?"

দেবাশীষ বলল, "ম্যাডাম এদেরকে সেই ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে দেখেছি জ্যামের, হরলিকসের শিশিতে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, ফড়িং, আরশোলা, টিকটিকি যা পাচ্ছে সব ফরমালিন এ চুবিয়ে রেখে দিয়েছে, সেগুলো এখনো মিউজিয়ামে রাখাও আছে। তাই ভাবলাম এটাও থাকবে।"

আমি আর কী বলি? নেশাটা তো আমিই ধরিয়েছি! এখনকার ক্লাস টুয়েলভের ছাত্র ছাত্রীরা যখন ক্লাস সিক্স- এ ছিলো তখনো আমাদের স্কুলে ল্যাব তৈরি হয়ে ওঠে নি। বারান্দা কিম্বা মাঠেই আমরা গাছপালা , জন্তুজানোয়ার বা পাথর টাথর নিয়ে কাজ করতাম। সে এক মজার ল্যাবরেটরি ছিল আমাদের! ততক্ষণে ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে। বললাম, "তোমরা যাও, যা করার কালই করা যাবে।"

পরের দিন সকালে, কলেজে একটা প্র্যাকটিকাল ক্লাস নেবার পর, দুটো পিরিয়ড খালি ছিল, ভাবলাম স্কুলে ঘুরে আসি একবার। দেখে আসি হনুমানটার কী অবস্থা। স্কুলে গিয়ে

শুনলাম, বাচ্চারা আজ একটু বেশিই চঞ্চল, তাদের ঘন ঘন জল তেষ্টা পাচ্ছে। স্যার ম্যাডামরা পিছন ফিরলেই তাদের চাপা স্বরে কথাবার্তা চলছে। আমি আর দেরি না করে মৌসুমী আর কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে গেলাম ল্যাবে। হনুমানটার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু তো একটা ভাবতে হবে ! সবাইকার কপালে চিন্তার রেখা, সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যেন আমার ওপরেই হনুমানটার ইহকাল পরকাল নির্ভর করছে ! সবাইকার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, "হনুমানটাকে প্রিজার্ভ করে রাখার মতন অত বড় জার আমাদের কাছে নেই আর ওটাকে তেলের টিনেও ফেলে রাখা যায় না।"

মৌসুমী বলল, "ম্যাম ওটার ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলো প্রিজার্ভ করলেই তো হয়!"

আমি বললাম, "তা হয়, তবে আমাদের ছুরিকাঁচি দিয়ে ওটাকে কাটা যাবে না।" বীরেন্দ্র বলে একটি ছেলে (সে এখন নিজেই একজন ডাক্তার) লাফিয়ে উঠে বলল, "ম্যাম, কোলিয়ারির লাশ কাটা ঘর থেকে ওদের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি?" আমি বললাম, "তার থেকে ওটার হাড়গোড় বের করলে কেমন হয়?"

সমস্বরে প্রশ্ন, " কী করে ম্যাম? কী করে?"

আমি বললাম, " সোজা। কিছু নুন সহযোগে ওটাকে মাটির নিচে কবর দিয়ে দিলেই হল। দিনদশেক পরে ওটার কংকাল পেয়ে যাব আমরা।"

এরপর হইহই করে কোদাল, শাবল, গাঁইতি নিয়ে কবর খোঁড়া হল। আমাদের স্কুলের চারপাশে বেশ ঘন জঙ্গল ছিল তখন। রাত্তিরবেলায় ভালুক, হায়না, শেয়াল কখনো কখনো

লেপার্ডও হানা দিত, তাই গর্তটা গভীর করে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে বেশ কিছু ভারি ভারি পাথর চাপানো হল। বলাই বাহুল্য, সেদিন আমার আর কলেজে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।
দিন দশেক পরে কবর থেকে হনুমানের অবশেষটুকু তুলে তাকে স্নান করিয়ে একটা বড় কাচের ট্রাউ বা বাটিতে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের হালকা ঘোলে ডুবিয়ে রাখা হল ছোটখাট মাংসের টুকরো গলিয়ে ফেলার জন্য। এরপর হাড়গুলোকে হাইড্রোজেনপারক্সাইডে ব্লিচ করে সেগুলোকে একটা বড় কার্ডবোর্ডে সেঁটে লেবেল লাগিয়ে কাচের বাক্সে পুরে ফাইনাল টাচ দিতে প্রায় চারদিন লেগে গিয়েছিল।

সব কিছুই নির্বিঘ্নে হয়েছিল, শুধু হনুমানটাকে মাটি পাথর চাপা দেবার পর, আমাদের চৌকিদার রামাধীন আমার সামনে হাত জোড় করে বলল, "মা জি, হনুমানজি হিন্দু ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁকে আপনি কবর দিলেন, পাপ হবে যে!"

সেদিন তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, হনুমানজি নিজে একজন বিদ্বান পুরুষ, তাঁর হাড় নিয়ে পড়াশোনা করলে তিনি পাপ দেবেন না। কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে কিছু ফুল ভগবানের পায়ে দিয়ে দিতে বলল। আমি তার নিষ্ঠা আর বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করতে পারিনি, ফুলগুলো সযত্নে ছড়িয়ে দিয়ে দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম ।

ছবি ঃ অর্ণব

suchipotro

নয়ন দাশের মেজাজ

তরুণকুমার সরখেল

দাশনগরের নয়ন দাশের মেজাজ ভীষণ কড়া
রেগে গেলে ভেঙে ফেলেন নিজের দাঁতের গোড়া
ছিঁড়ে ফেলেন টপটপাটপ মাথার যত চুল
রেগে গেলে ঠান্ডা ঘিলু থাকে না বিলকুল
এই তো সেদিন বাজার গিয়ে যেই না দুটো ষাঁড়ে
টান মেরেছে থলিতে তার অমনি তাদের ঘাড়ে
পড়ল নয়ন সটান গিয়ে ধরল তাদের ঠেসে
লোকজন সব ভয়েই মরে কেউ বা ওঠে হেসে
অবশেষে ফিরল নয়ন রিকশা চেপে বাড়ি
হাত ভাঙল, পা ভাঙল মুখ হল তার হাঁড়ি

বৃষ্টি হবে

সংহিতা

বর্ষা মানেই বৃষ্টি হবে
টিপটিপিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হবে

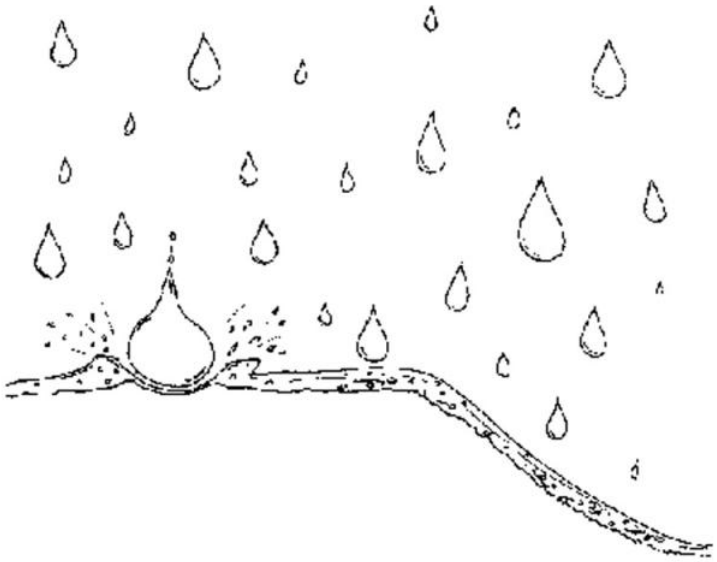

ঝমঝমিয়ে কনকনিয়ে বৃষ্টি হবে
বৃষ্টি হলেই ভরবে পুকুর
মাঠ ছাপিয়ে ছপছপিয়ে হবেই পুকুর
ঘাট ভরিয়ে পথ মাখিয়ে কাদার পুকুর
ফের মেঘ কাটলেই ফর্সা হবে
তো টাক ফাটিয়ে কটকটিয়ে রোদ উঠবে
তো ঘাম ঝরিয়ে গলগলিয়ে রোদ উঠবে
তো রোদ উঠলেই গুমোট হবে
বিনবিনিয়ে তিরতিরিয়ে গুমোট ছোঁবে
গুড়গুড়িয়ে রঙ চড়িয়ে মেঘলা হবে
মেঘলা হলেই ঝড় আসবে
শনশনিয়ে বনবনিয়ে হাওয়া ছুটবে
কড়কড়িয়ে হুড়মুড়িয়ে বাজ পড়বে

বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হবে
টিপটিপিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হবে
কনকনিয়ে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হবে

ছোটবেলা ফিরে পাওয়া

ইন্দ্রাণী সরকার

খেলতে যে চাই পুতুল খেলা আবার নতুন করে
ভিজতে যে চাই বৃষ্টিধারায় সব প্রাণ মন ভরে
জলের উপর নৌকা ভাসাই বৃষ্টিধারায় ভিজে
শিউলি বনে হারিয়ে গিয়ে পাই না আমায় খুঁজে
প্রজাপতির পিছন ছুটি গোলাপ বনের মাঝে
রাত বিরেতে জোনাক জ্বলে মন লাগে না কাজে
তাকিয়ে থাকি আকাশ পানে অবাক চোখটি মেলে
ধুমকেতুটা ছুটলো বুঝি ঘর বাড়ি সব ফেলে
বেলি ফুলের মালা গাঁথি পুতুল সোনার তরে
শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে আনব জামাই ঘরে
ছোট্ট হয়ে মায়ের কোলে রাখবো মাথা আজ
বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ভুলব যত কাজ

তিন বুড়োর গান

আবু হোসেন

এপার নদী, ওপার নদী মধ্যিখানে চর
চরের ওপর বালির পাহাড় তিনটে বুড়োর ঘর
বড়কা বুড়ো সকালবেলায় বালির পাহাড় খোঁড়ে
মেজকা বুড়ো গর্ত বোজায় সমস্তদিন ধরে
ছোটকা বুড়ো, তিন নম্বর, সন্ধেবেলায় বসে
বালির ওপর ধপধপাধপ বাজনা বাজায় কষে
বালির ঢাকের শব্দ পেয়ে নদীর ভাঙে ঘুম
কলকলিয়ে ছলছলিয়ে ছুটে চলার ধুম
হাজার লাখো টুকরো চাঁদের গয়না মেখে গায়
হাসতে হাসতে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যায়
জলের বুকে নৌকো তাতে তিনটে বুড়ো ভাসে
চাঁদের আলোয় ফোকলা দাঁতে খিলখিলিয়ে হাসে

হাসতে হাসতে ভাসতে ভাসতে রাত হলে নিঝঝুম
তিনটে বুড়ো বাজনা বাজায় ধিনতাকা পিন টুম
কাশ ধবধব তিনটে মাথায় চাঁদের অঢেল চুমো
রাত হল যে, তিনটে বুড়ো এবার তোরা ঘুমো
ঘুম আসে না, সকাল আসে ফিরবে ওরা বাড়ি
ধু ধু নদীর বুকের ওপর একলা বালিয়াড়ি
এপার নদী ওপার নদী মধ্যিখানে চর
চরের ওপর বালির পাহাড় তিনটে বুড়োর ঘর

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

খয়েরিটোলা

কৌশিক ভাদুড়ী

খয়েরিটোলার ফিস দোপাটি
খাওনি এ মা? ফাটাফাটি।
শাঁখের ভেতর অক্টোপাস
তাও খাওনি? চাখতে চাস?
আজ চলে আয় ভর দুপুরে
শহর থেকে একটু দূরে
যেইখানে এক বাঁশের বনে

ভোমরা বকুল সবাই চেনে
থাকব ত্যাঁদর গাঁটের খাঁজে
শেয়াল ডাকে ঝিঁঝিও বাজে।
দঙ্গলে নয় একলা এসো
নক কোরো না হালকা কেশো
বিলের কথায় ঘাবড়ে গেলে?
ঝিলের পাশের একটি ছেলে-
দাওয়াত দিলো- বিল মেটাবে

নইলে কেমন লোক জোটাবে?
কষ্ট উশুল চিজটা দ্যাখার
খেয়েই দ্যাখ্ না আরএকটা বার।
খবর রেয়ার- এসব খাবার!
তোফা কী বল্ এমনি অফার?
সুযোগ তো নয় কৃষ্ণচুড়ো-
দিলেই হাওয়া ঝরবে ঝুরো।

প্রণাম

আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
রবিঠাকুর আজ নিরালায় গাইছি তোমার গান।।
তোমার গানে সুর দেবে আজ এ.আর.রহমান
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে নদে এলো বান।।
শিমুল পলাশ রং ছড়ালো আজ ফাগুনের বনে
স্মৃতির খাতায় অনেক কথা পড়বে কি আজ মনে-
কেয়াপাতার নৌকা চড়ে দূর দেশে কোনখানে
আজ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও সবার প্রাণে
পাখির গানে ঘুম ভেঙেছে আনন্দ ভরপুর-
বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর।।
সেলফোনে আর রবিঠাকুর খুব জমেছে জুটি
আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি
তুমি আছ বিজ্ঞাপনে, মেসেজ-এ রিং টোনে
আয় দেখে যা, রং লেগেছে শিমুল পলাশ বনে-
কান্না-হাসির দোলদোলানো গভীর অভিমান
দুঃখে-সুখে রবিঠাকুর গাইছি তোমার গান।।

প্রণতঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

মামার চন্দ্রযাত্রা

চারটেয় ঘুম থেকে উঠে ঘেঁটু মামা
চটপট নিল পরে প্যান্ট, কোট, জামা।
আমি বলি, ও কী করো, রাত আছে বাকি!
বলে মামা, ধূমকেতু তবে দেবে ফাঁকি।
শুনে এনু সেমিনারে, আসবে সে আজ,
এই নিয়ে দুনিয়াতে রব সাজো সাজ।
মাথা আছে, দাড়ি আছে, আর দুটো লেজ
বেড়ে চলে ক্রমে পেলে রবিকর- তেজ।
একবার সেই লেজ যায় যদি ধরা,
ঝুলে ঠিক যাব চলে চাঁদ- পিঠে ত্বরা।
কাটাকাটি, হানাহানি হিংসায় ভরা
পৃথিবীর থেকে ভালো শশী মনোহরা।
কালি- ধুলি, ধোঁয়া ভরা, এর সাথে আড়ি,
চাঁদে যদি চাস যেতে আয় তাড়াতাড়ি।

সৌম্যকান্তি জানা

বৃষ্টি

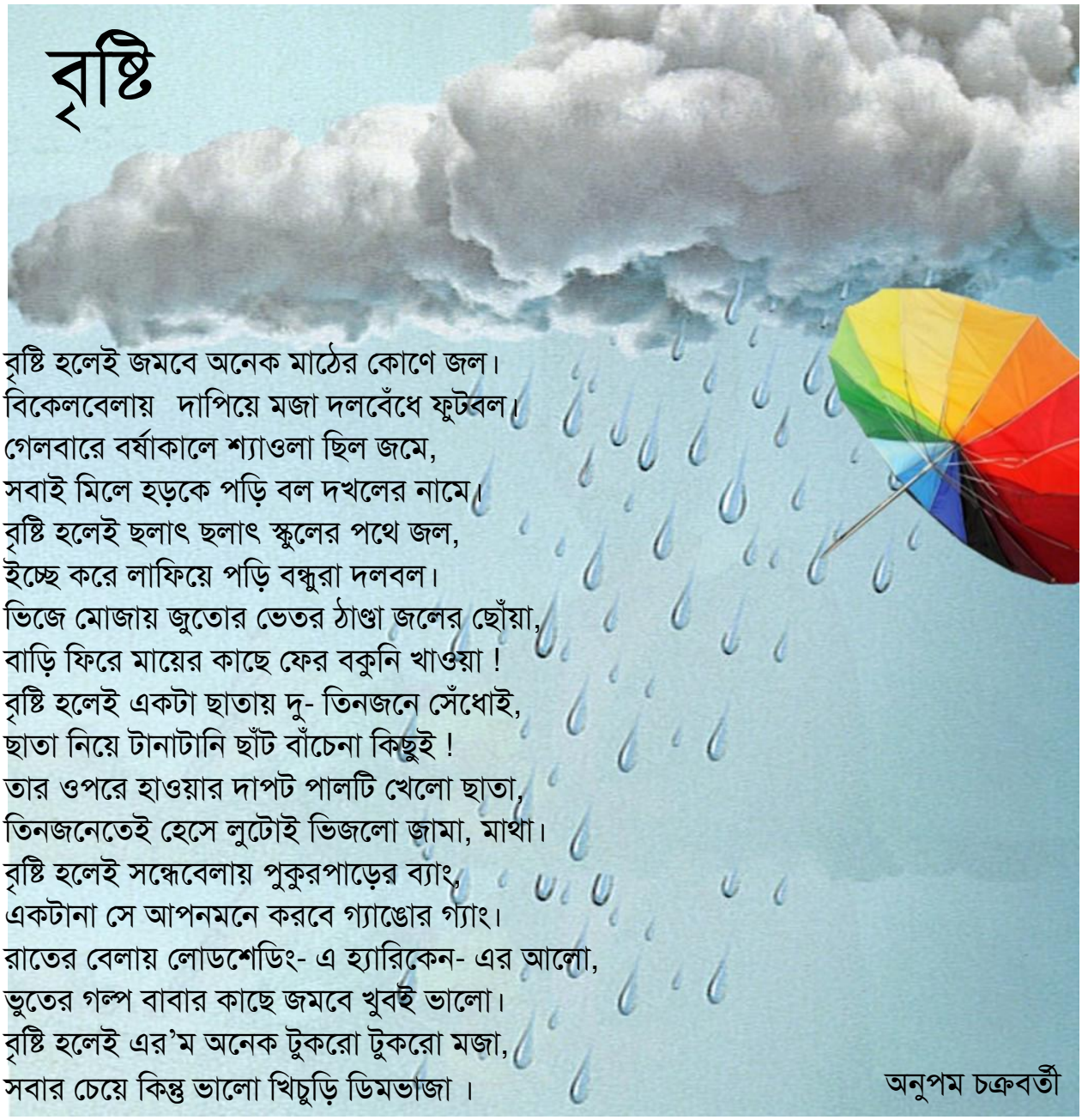

বৃষ্টি হলেই জমবে অনেক মাঠের কোণে জল।
বিকেলবেলায় দাপিয়ে মজা দলবেঁধে ফুটবল।
গেলবারে বর্ষাকালে শ্যাওলা ছিল জমে,
সবাই মিলে হড়কে পড়ি বল দখলের নামে।
বৃষ্টি হলেই ছলাৎ ছলাৎ স্কুলের পথে জল,
ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়ি বন্ধুরা দলবল।
ভিজে মোজায় জুতোর ভেতর ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া,
বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে ফের বকুনি খাওয়া !
বৃষ্টি হলেই একটা ছাতায় দু- তিনজনে সেঁধোই,
ছাতা নিয়ে টানাটানি ছাঁট বাঁচেনা কিছুই !
তার ওপরে হাওয়ার দাপট পালটি খেলো ছাতা,
তিনজনেতেই হেসে লুটোই ভিজলো জামা, মাথা।
বৃষ্টি হলেই সন্ধেবেলায় পুকুরপাড়ের ব্যাং,
একটানা সে আপনমনে করবে গ্যাঙোর গ্যাং।
রাতের বেলায় লোডশেডিং- এ হ্যারিকেন- এর আলো,
ভুতের গল্প বাবার কাছে জমবে খুবই ভালো।
বৃষ্টি হলেই এর'ম অনেক টুকরো টুকরো মজা,
সবার চেয়ে কিন্তু ভালো খিচুড়ি ডিমভাজা ।

অনুপম চক্রবর্তী

ঋতুরঙ

তন্ময় চট্টোপাধ্যায়

গরম নাকি দেখতে বেঁটে কালো,
পায়েতে নখ , মাথাতে তার শিং,
হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে মাঠে ঘুরে
নিজেকে ভাবে এই ধরারই কিং।

নিজের পোশাক জমকালো বেশ দামি
এলাকাতে নাম ডাক তার খুব,
বর্ষা এলেই পোশাকটা জ্যাবজ্যাবে
মুখ লুকিয়ে কোথায় যে দেয় ডুব।

বর্ষা কখন ফর্সা- অন্ধকার
বুঝিনা ভাই এই কি রূপের মানে
পোশাকটা তার ভীষণ আলুথালু
লুকোচুরি খেলতে ভালই জানে।

শরৎবাবু ভীষণ পরিষ্কার
দিবসে মেঘ রাতের বেলায় তারা,
মেঘ শিকারায় চাপিয়ে মনের ঝাঁপি
মাতিয়ে বেড়ায় দাপিয়ে সকল ধরা।

হেমন্ত কি ঘুমিয়ে থাকে সদাই
নইলে সে কি ভীষণ লাজুক নাকি,
কখন যে সে আসে কখন যায়
দেখতে যে পায় সে জন ভীষণ লাকি।

ঠান্ডা নাকি দেখতে ভীষণ মোটা
বড্ড শীতে খুব গিয়েছে জমে,
অনেক ভায়াই তার জ্বালাতে কাবু
সিঁটিয়ে থাকে শীত দাদারই নামে।

শীত কি থাকে সবখানেতেই ঘিরে
ভারখোয়ানক্স কিংবা অ্যান্টার্কটিকা,
কর না রে সার্চ গুগুল দাদার ঘরে
সব কিছুই তো সেথায় আছে লেখা।

কোট জ্যাকেটে মুড়িয়ে শরীরটাকে
শীত নাকি খুব মিষ্টি সাদা রঙ এ,
দাঁড়িয়ে থাকে ম্যালের গলির মুখে
গোল্ডরাশেরই চ্যাপি দাদার ঢঙে।

বছর শেষে বসন্তটা আসে
সবসময়ই মেজাজটা ফুরফুরে,
চায়না যেতে বাংলাদেশের থেকে
আসতে যে চায় সদাই ঘুরেফিরে।

যখন যে যার টপ ফর্মে রয়
ভাসিয়ে বেড়ায় ধরার সকল লোকে,
গ্রীষ্মে পোড়ে ধরার সকল কণা
জীবন্তরা থাকে গভীর শোকে।।

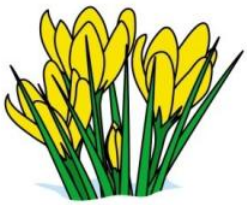

suchipotro

ধাঁধা

প্রথম ধাঁধা

সেকেন্ডে আধবার, মিনিটে একবার, ঘন্টায় আধবার, দিনে একবার, সপ্তাহে শূন্যবার। মাসে কবার?

দ্বিতীয় ধাঁধা

কল্পনা করে নাও তুমি একটা ডুবন্ত নৌকোয় বসে আছ এবং তোমার চারপাশে অসংখ্য নরখাদক হাঙর ভাসছে নৌকোটা ডোববার অপেক্ষায়। তোমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই, রেডিও নেই। কীভাবে তুমি বাঁচবে?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

লোকটা তার ঘরে আসা মানুষটির একমাত্র ছেলেকে শুট করে, জলের তলায় চুবিয়ে রেখে, দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর সেই মানুষটা লোকটাকে টাকাপয়সা দিয়ে চলে গেল। লোকটার ঘরটার নাম কী হতে পারে?

চতুর্থ ধাঁধাঃ

আমার বাড়িতে যত পুষ্যি আছে তাদের তিনটে বাদে সবগুলো গাধা, তিনটে বাদে সবগুলো ঘোড়া, তিনটে বাদে সবগুলো গরু আর তিনটে বাদে সবগুলো বেড়াল। সব মিলিয়ে কতগুলো পুষ্যি আছে আমার বাড়িতে বলোতো? কোনটা কতগুলো করে আছে?

পঞ্চম ধাঁধাঃ

একটা বোবা লোক তার বন্ধুকে নিয়ে রেলস্টেশনে গেছে। টিকিটের দাম পাঁচ টাকা। বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। বোবা লোকটা দুজনের জন্যে টিকিট কাটতে গেছে। কাউন্টারের ফুটো দিয়ে সে দশ টাকা বাড়িয়ে দিল ভেতরে। কটা টিকিট চাই সে নিয়ে সে কোন ইশারা করেনি। কাউন্টারের লোকটা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই একটার বদলে দুখানা টিকিট বাড়িয়ে দিল। কাউন্টারের লোকটা বুঝলো কীভাবে যে বোবা লোকটা দুটো টিকিট চাইছে?

কুইজঃ

তুমি একজন ভ্যাম্পায়ার কিনা জানতে গেলে এই কুইজটা করোঃ

১। তোমার কাছে দিনরাতের মধ্যে প্রিয় সময় কোনটা? (ক)সকাল (খ) দুপুর (গ)সন্ধে (ঘ)মাঝরাত

২। তোমার ঘরের দেয়ালের ডেকোরেশন কী (ক) ভ্যাম্পায়ারের ছবি (খ) নিউ মুন- এর পোস্টার (গ) কিচ্ছু না (ঘ) ভেজা লাল

৩। তোমায় যদি একটা পোশাক কেনবার সুযোগ দেয়া হয় তুমি কোনটা কিনবে?

(ক) কালো লেদার ট্রাউজার (খ) লাল রুমাল (গ) কিছু না (ঘ) কালো মোজা

৪। বাদুর উড়তে দেখলে তুমি মনে মনে কী বল?

(ক) কী রে, কী খবর? (খ) ওরে বাবা গো (গ) আহা কী সুন্দর (ঘ) জঘন্য জীব

৫। ছুটিতে বিদেশ যেতে পেলে কোথায় যাবে?

(ক) ট্রান্সিলভ্যানিয়া (খ) লন্ডন (গ) বিশালগড় (ঘ) কোথাও যাবো না

৬। মুরগির ঝোলে হাড়ের মধ্যে রক্ত লেগে থাকলে তুমি কী কর?

(ক) খাবারটা ফেলে দি (খ) রক্তটা ধুয়ে মাংসটা খেয়ে ফেলি (গ) কপাৎ করে মুখে পুড়ে দিই (ঘ) মাকে জিজ্ঞেস করি কী করব?

৭। তরকারীতে রসুন পড়লে তুমি কী কর?

(ক) খাবার ছেড়ে পালিয়ে যাই (খ) মহানন্দে খেয়ে ফেলি (গ) বমি করে দি (ঘ) ভালো পদ হলে রসুনটা ফেলে খাবারটা খেয়ে ফেলি

৮। কেমন বিছানায় শুতে ভালোবাসো?

(ক) মাটিতে (খ) মাদুরে (গ) সোফায় (ঘ) গদিওয়ালা বিছানায়

৯। ইশকুলে মাস্টারমশাই বকলে তোমার কী মনে হয়?

(ক) যেদিন বাগে পাবো মজা দেখিয়ে দেব (খ) এর মুন্ডুটা ছিঁড়ে গেন্ডুয়া খেলব (গ) গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত খাব (ঘ) ভ্যাঁ- অ্যাঁ অ্যাঁ-

১০। স্বপ্নে কখনো ভ্যাম্পায়ার দেখলে তুমি কী বলো?

(ক) নমস্কার স্যার। ভালো আছেন? (খ) যা ভাগ! (গ) মারবেন না স্যার। (ঘ) গুড মর্নিং , কাজকর্ম কেমন চলছে?

উত্তরগুলো ভেবে রাখো, পরের সংখ্যায় জানতে পারবে তুমি কত পারসেন্ট ভ্যাম্পায়ার।

জানো কী?

১। কুমির জিভ বের করতে পারে না।

২। চিংড়ির হৃৎপিড থাকে মাথায়

৩। হাঁচবার সময় হৃৎপিন্ড খুব কম সময়ের জন্য থেমে যায়

৪। কথায় বলে উটপাখি নাকি বালিতে মাথা গুঁজে লুকোয়। কথাটা একেবারে মিথ্যে। বাবা অস্ট্রিচ ডিম লুকোবার জন্যে বালিতে গর্ত খোঁড়ে মুখ দিয়ে। সে ছাড়া তারা কক্ষনো বালিতে মাথা লুকিয়ে বসে না।

৫। শুয়োরেরা আকাশের দিকে কখনো তাকাতে পারে না।

৬। পৃথিবীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ কখনো টেলিফোন ব্যবহার করে নি।

৭। খুব জোরে হাঁচলে পাঁজরার হাড় ভাঙবার খবর পাওয়া গেছে।

৮। এক ঘন্টা ইয়ারফোন ব্যবহার করলে কানে সংক্রমনের সম্ভাবনা বাড়ে সাতশো গুণ।

৯। দেশলাই আবিষ্কারের আগে লাইটার আবিষ্কার হয়েছিল।

১০। বেশ কিছু ধরনের লিপস্টিক বানাতে মাছের আঁশ ব্যবহার হয়।

শব্দখেলাঃ

এই কবিতাটা বাংলায় বলো তো!

TRBA
TRBA
BADBK
DDLO
PCLO
RLOK

ড্রুডলঃ

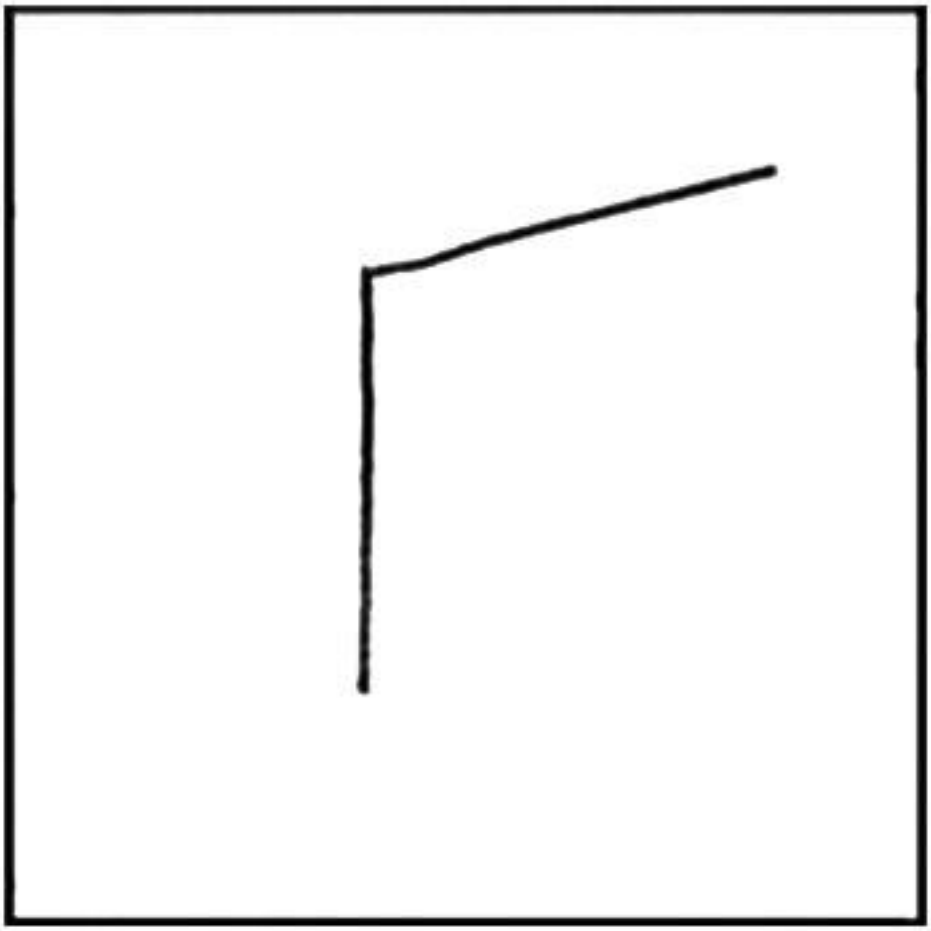

অবিশ্বাস্য

সেন্ট পিটার্সবার্গের বরফ প্রাসাদ। প্রথম তৈরি হয় ১৭৪০ সালে। বানিয়েছিলেন রানি অ্যানা ইভানোভনা তুর্কি যুদ্ধে জয় উপলক্ষে। ২০০৫ সালে সে প্রাসাদকে ফের পুণর্নির্মাণ করা হয় ১৪ জন তুষার ভাস্করের সাহায্যে।

কীসের ফটোঃ

এটা কী অনুষ্ঠানের ছবি?

আশ্চর্য উল্কি

গত সংখ্যার উত্তর(জয়ঢাক ৪৮)

ধাঁধার উত্তর

এক: পল্টুদার প্রশ্ন ছিল:আমি যদি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করি, ও আমাকে কোন দিকে যেতে বারণ করবে?

দুরকম হতে পারে: ধরা যাক, যদি পল্টুদা সত্যবাদীকে প্রশ্নটা করে... তাহলে সে - মিথ্যেবাদী যে দিকে যেতে বারণ করবে... মানে সঠিক দিক দেখাবে।

আবার, যদি মিথ্যেবাদীকে পল্টুদা একই প্রশ্ন করে... সেও সত্যবাদীর বারণ করার উল্টো দিক দেখিয়ে সঠিক দিক দেখাবে।

দুই: পল্টুদা বাসে বসে থাকলে, মানে বাস থেকে না নামলে... বাস থামত না। আর ওখান থেকে চলে গেলে, পাথরের চাঁই বাসের ওপর পড়ত না, সবাই বেঁচে যেত। পল্টুদা নামার জন্যই বাস দুর্ঘটনা ঘটলো - তাই দুঃখ প্রকাশ।

তিন: নয় থেকে ছয় এইভাবে...

শব্দখেলাঃ
কাঠ দিয়ে সবগুলো হয়। কাঠগোলাপ, কাঠচাঁপা, কাঠকয়লা, কাঠবেড়ালি।

ড্রুডলঃ
হাতি চিৎ হয়ে সুইমিং পুলে ভাসছে।

কুইজঃ

১।ওপেনহেইমার ২। ১৮৯৬ সালে ৩। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিট্যুটের তখনকার সচিব স্যামুয়েল ল্যাংলে ৪। এরোড্রোম ৫। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসের সাত আর আট তারিখে মানুষবাহী এরোড্রোমের প্রথম পরীক্ষা হয়। দুটো পরীক্ষাই ব্যর্থ হয়। এর নদিন পরে রাইটভাইরা প্রথম সফল মনুষ্যবাহী উড়োযানের সফল পরীক্ষা করেন। মনুষ্যবাহী উড়োযানের প্রথম উদ্ভাবক হিসেবে রাইট ভাইরা তাই স্বীকৃতি পেয়েছেন। ৬। ডানা ঝাপটে ওড়ার যন্ত্র। ৭। পিয়ের জুলিয়েন, ১৮৫৮ সালে। ৮। প্রথম সফল গ্লাইডার উড়ান। ৯। ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, চিনে। ১০। ব্যাম্বু কপ্টার বা ঘুরন্ত রোটর দিয়ে ওড়ার প্রথম যন্ত্রের যথাক্রমে চিনা ও জাপানি নাম।

কীসের ফটোঃ চায়ের কাপে তলানি

suchipotro

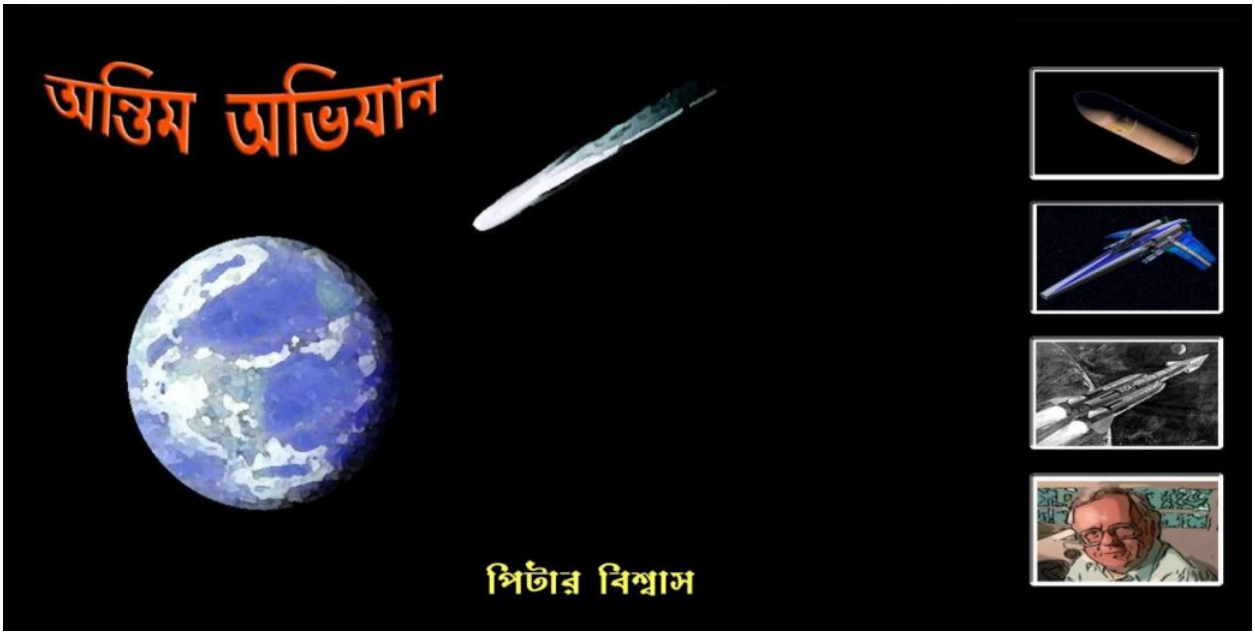

টুলবক্স থেকে কিছু স্টিলনের সুতো নিয়ে নিয়ে বিরাট কাপড়ের টুকরোটার চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই শেষ করে স্টিলনের প্রান্তদুটো আগুণ জ্বেলে একসঙ্গে গলিয়ে মিশিয়ে দিলেন প্রফেসর বোস । তারপর জিষ্ণুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটা কী তৈরি করেছি বুঝতে পারছো?"

"উঁহু।"

"এটা একটা উড়োযান।"

জিষ্ণু একটু অবাক হয়ে তার বাবার মুখের দিকে চাইল। তিনি রসিকতা করছেন কিনা তাই বোঝবার চেষ্টা করছিল সে।

প্রফেসর বোস জিষ্ণুর চাউনি দেখে তার মনের কথাটা ধরতে পেরেছিলেন বোধ হয়। মৃদু হেসে বললেন, "অন্যপাশটা ধরো। এটাকে আমাদের গাড়ির ওপর বিছিয়ে দিতে হবে প্রথমে।"

গাড়ির ওপর কাপড়টাকে ছড়িয়ে দিয়ে জিষ্ণুকে তার দড়ির পাশগুলো গাড়ির চারপাশে ভালো করে বাঁধতে বলে প্রফেসর বোস গাড়ির ওপরে উঠে স্পেসস্যুটের বাক্স থেকে উচ্চচাপে রাখা হিলিয়ামের কয়েকটা ক্যান বের করে আনলেন। জিষ্ণুর কাজ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। কাপড়ের ঢাকনার তলায় উঁকি মেরে বাবার হাতে ক্যানগুলো দেখে সে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "ওগুলো তো স্পেসওয়াকের সময় বিপরীত ধাক্কা তৈরি করে এদিক ওদিক চলবার কাজে লাগে! এখানে—"

"দেখতে পাবে জিষ্ণু। সন্ধে হয়ে আসছে। এখনই পাহাড় থেকে বাতাসের ঢল নামবে নদীর দিকে। একটু অপেক্ষা কর শুধু।"

নির্জন অরণ্যে সন্ধে গভীর হচ্ছিল। মাথার ওপরে তখনও রঙবেরঙের অজস্র পাখি বাতাসে ভেসে বাসায় ফিরে যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে জিষ্ণুর চোখ ফিরছিল না। এতদিন এদের শুধু সে চাঁদের স্টেশনের মহাগণক চিত্রক ৪ এর তৈরি ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপণেই দেখেছে। কিন্তু তাতে তো মুখের ওপর এই হাওয়ার স্পর্শ, বনের এমন সুন্দর গন্ধ মাখা থাকত না!

"হাওয়া বইতে শুরু করেছে জিষ্ণু। গাড়ির ওপর উঠে বস তাড়াতাড়ি।" বাবার ডাকের সঙ্গেসঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দে সম্বিত ফিরে এল জিষ্ণুর। শব্দটা কাপড়ে ঢাকা গাড়িটার ভেতর থেকে আসছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে তার চোখে পড়ল, একটা হিলিয়ামের ক্যানের মুখ খুলে ধরেছেন প্রফেসর। তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ করে স্বচ্ছ সেই গ্যাসের একটা ধারা ক্যান থেকে ছাড়া পেয়ে মাথার ওপরে বাঁধা বিশাল কাপড়ের টুকরোটাকে ফুলিয়ে তুলছে তখন। জিষ্ণু তাড়াতাড়ি গাড়ির ওপর বাবার পাশে উঠে বসল।

ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করছিল হিলিয়ামে ভরা পলিমার কাপড়ের ঢাকনা। গাড়ির ধারে বাঁধা দড়িগুলো টানটান হয়ে উঠছে ক্রমশ। তারপর একসময় আস্তে আস্তে নড়ে উঠল গোটা গাড়িটা। মাথার ওপর তখন বিরাট একটা অর্ধগোলকের মত ফুলে উঠেছে সেই আদিম উড়োযান, কয়েক শতাব্দী আগে যাতে চেপে মানুষ প্রথম মাটি ছেড়ে আকাশের পথে অভিযান শুরু করেছিল।

তারপর, পাহাড় থেকে বয়ে আসা সন্ধ্যার বাতাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের কোল ছাড়িয়ে খরস্রোতা সেই নদীর বুকের দিকে।

অবলোহিত সংবেদী দুরবীণের পর্দায় আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিল দ্বীপটা। অতিকায় একটা চুণাপাথরের পাহাড়কে ঘিরে সরু একটু সমতল জমি। অতিকায় বেলুনটা তার ওপরে গিয়ে

পৌঁছুতে একটা ছুরি বের করে বেলুনের কাপড়ের গায়ে কয়েকটা বড় বড় ফালা করে দিলেন প্রফেসর। আটকে থাকা গ্যাস হু হু করে বের হয়ে যাচ্ছিল সেইখান দিয়ে। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল অতিকায় বেলুন। বাতাসে ভাসবার ক্ষমতা হারিয়ে এইবারে সে ধীরে ধীরে নেমে এল সেই সমতল জমির গায়ে।

বিশ পঁচিশ হাত চওড়া ঝোপঝাড়ে ঘেরা জমি পেরিয়েই মাথা উঁচু করে ছিল বিরাট পাহাড়টা। চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার আলোয় পাহাড়ের সাদাটে শরীর চকচক করছিল। সেইদিকে তাকিয়ে জিষ্ণু হঠাৎ বলল, "কিন্তু এইখানে এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে—কী লাভ হবে বাবা?"

প্রফেসর বোস গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবছিলেন। জিষ্ণুর কথা শুনে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "খুব বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের জিষ্ণু এই জঙ্গলে বসে। তুমি যদিও এখনো সবটা বুঝবে না, তবু সহজ করে বলি, সুইফট টাটল ধূমকেতুটার মুখ কয়েকটা বিস্ফোরণে খুব সূক্ষ্মভাবে ঘুরে গেছে পৃথিবীর দিকে। এই মুহূর্তে সেটা এতটাই সূক্ষ্ম যে হঠাৎ করে কারো নজরে না পড়লে তাকে কেউ খেয়াল করবে না। আমি একরকম হঠাৎ করেই সেটা জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে খবর পৃথিবীকে জানাবার আগেই মঙ্গল উপনিবেশ আমাদের গবেষণাকেন্দ্রে আঘাত করল—"

"কিন্তু বাবা, আমরা তো দিল্লির কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সব তথ্যপ্রমাণ দেখিয়ে—"

"না জিষ্ণু। ভেবে দেখো, আমাদের যানের ইলেকট্রনিক বিচ্ছুরণ একমাত্র বুদ্ধ-র দূরসংবেদি উপগ্রহের চোখেই ধরা পড়তে পারে। সেই তথ্যও ওরা চুরি করতে পেরেছে সামান্য সময়ের মধ্যে, তারপর যেভাবে ওরা আমাদের অনুসরণ করে পৃথিবীর সুরক্ষাবলয়কে এড়িয়ে এই জঙ্গলে এসে হানা দিয়েছিল তা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার। পৃথিবীতে ওদের হাত অনেক লম্বা। এমনকি বুদ্ধর চালকমন্ডলীতেও নিঃসন্দেহে ওদের লোকজন আছে। পার্থিব কাউন্সিলকে সব বলতে গেলে আমাদের প্রকাশ্যে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে ওরা আমাদের ছাড়বে না। হয়ত সব কথা খুলে বলবার আগেই—না, না সে ঝুঁকি আমি কোন মূল্যেই নিতে রাজি নই।"

জিষ্ণু একটু অবাক হয়ে প্রফেসর বোসের দিকে চাইল। তারপর বলল, "তুমি -- ভয় পাচ্ছ বাবা?"

“না জিষ্ণু ভয় নয়। আমাদের প্রাণের দাম আর কতটুকু। পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে পৃথিবীকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করবার সুযোগ আর আমি পাবো না। এই মুহূর্তে পৃথিবীর হাতে যে অস্ত্রশস্ত্র আছে, অতবড় একটা ধূমকেতুকে ধ্বংস করবার জন্য তা যথেষ্ট নয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নির্মাণের পরিকল্পনাও আমার অজানা নয়। আগামী বিশ বছরের মধ্যে সেইরকমের শক্তিশালী কোন অস্ত্র বানাবার পরিকল্পনা আমাদের শান্তিপ্রিয় বৈজ্ঞানিকদের নেই। সে ক্ষমতা আছে শুধু আমার নতুন আবিষ্কার এই একাগ্নির। নস্তু- প্রতিবস্তুর সংঘর্ষে যে শক্তিবিচ্ছুরণ করতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র, তাকে সহ্য করবার ক্ষমতা থাকবে না ওই ধূমকেতুর। শোন জিষ্ণু, সবাই জানুক আমরা হারিয়ে গেছি। তারপর এইখানে, সবার অলক্ষ্যে বসে আমরা দুজন মিলে ফের গড়ে তুলব আমার একাগ্নিকে। তারপর অপেক্ষায় থাকব। যেদিন প্রয়োজন হবে-- ”

“কিন্তু বাবা, এখানে, এই খোলা আকাশের নিচে—কেমন করে—”

“খোলা আকাশের নিচে নয় জিষ্ণু। দূরসঞ্চার উপগ্রহদের নজর খুব তীক্ষ্ণ। কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেই তার ইলেকট্রনিক ঝলক ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবার বিরাট সম্ভাবনা থেকে যাবে ওতে। আমরা কাজ করব—ওই পাহাড়ের ভেতরে। পুরু পাথরের আস্তরণের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়।”

“পাহাড়ের ভেতরে—কিন্তু—”

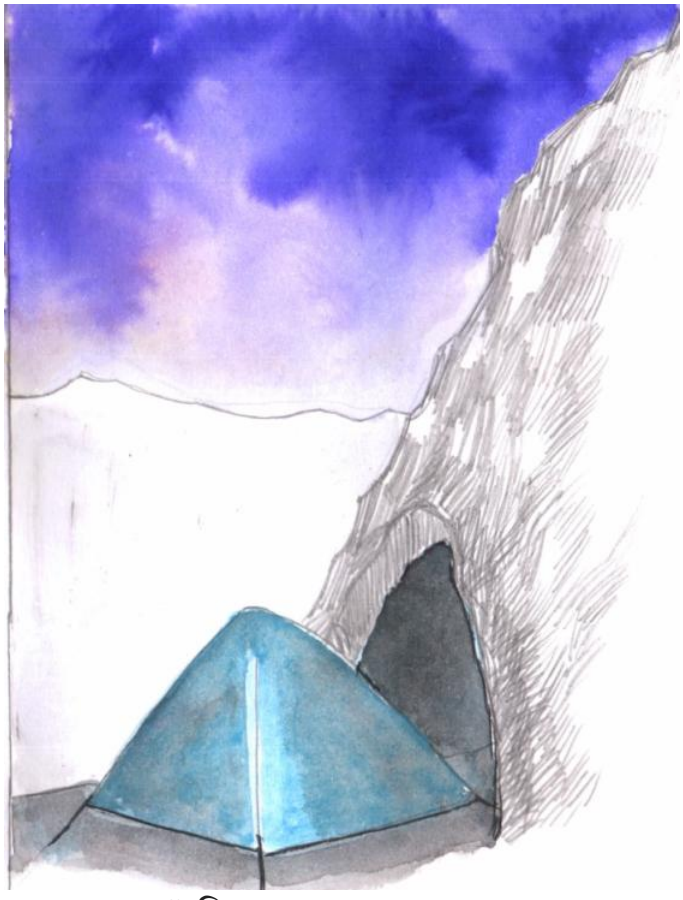

“কাল সকালের জন্য অপেক্ষা কর জিষ্ণু। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখো! পাহাড়টার গায়ে একটা বিরাট গর্তের মুখ দেখছ? চুণাপাথরের পাহাড়। ওর ভেতরে উপযুক্ত চেহারার কোন প্রাকৃতিক গুহার খোঁজ আমরা পাবই। না পেলে এই এলাকার অন্য কোথাও, অন্য কোন পাহাড়ে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের। জায়গা আমরা খুঁজে বের করবোই জিষ্ণু। সবার চোখের আড়ালে নিরাপদে কাজ করবার জন্য উপযুক্ত জায়গা—”

****

“সাবধানে এগোবে। ঝুঁকি নেবে না। কথা বলবার জন্য রেডিও ব্যবহার করবে। পুরু পাথরের আস্তরণের বাইরে ওর সংকেত পৌঁছোবে না। কোন অবস্থাতেই হেলমেট খুলবে না। এসব গুহায় বিষাক্ত গ্যাসের অস্তিত্ব থাকে অনেকসময়।” জিষ্ণুর মাথায় মহাকাশের পোশাকের হেলমেট আটকে দিয়ে পিঠের অক্সিজেনের ক্যানটা তার সঙ্গে জুড়তে জুড়তে প্রফেসর বোস বলছিলেন। তাঁর নিজের হেলমেটের উঁচু করে

রাখা ভাইসরের ভেতর থেকে মুখটা ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল প্রফেসরের। আগের রাতটা তাঁর একেবারে বিনিদ্র কেটেছে। কিন্তু বিশ্রাম নেবার অবকাশ এখন নয়।

"আর একটা কথা। যদি কোন কারণে দড়ি খুলে দুজন দুদিকে চলে যাই, উত্তেজিত হবে না। বুদ্ধি না হারিয়ে একজায়গায় বসে অপেক্ষা করবে। রেডিও ব্যবহার করবে।" বলতে বলতে জিষ্ণুর কোমরের দড়িটার সঙ্গে নিজের কোমরের বেল্ট হুক দিয়ে আটকে নিয়ে জিষ্ণুকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছন পেছন রওনা হলেন প্রফেসর বোস। অতিকায় গুহার হাঁ মুখটা তাঁদের সহজ শিকারের মতই মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেলল যেন।

"সাবধান বাবা, সামনে নুড়ি পাথর—" বেশ খানিকটা সামনে থেকে রেডিওতে জিষ্ণুর গলা ভেসে এল। দড়িতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে থামবার নির্দেশ দিলেন প্রফেসর বোস। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সামনে খাড়া নেমে যাওয়া ঢালটার দিকে হেলমেটের আলো ফেললেন। মাটি থেকে প্রায় দুশো ফুট নিচে এই জায়গাটায় গুহার ছাদ একদম মাথার কাছে নেমে এসেছে। তীব্র, ভ্যাপসা গরমে ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর।

ঢালটা কতটা গভীর কে জানে। প্রায় ষাট ডিগ্রি কোণ করে নেমে গেছে একেবারে যেন পাতালের দিকে। তার গায়ে বিপজ্জনকভাবে আটকে রয়েছে অজস্র ছোটবড় নুড়িপাথর। পায়ের সামান্যতম ধাক্কাতেও তা অবরোহণকারীকে নিয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়তে পারে নিচের দিকে।

ধীরে ধীরে উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে তার মুখটার কাছে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর বোস। জিষ্ণুও একই ভঙ্গীতে শুয়ে ছিল সেখানে। জোড়া হেডল্যাম্পের আলোয় বেশ খানিকটা নিচে অবধি দেখা যায়।

"গরমটা একটু কম লাগছে না বাবা?"

হঠাৎ জিষ্ণুর কথায় ব্যাপারটার দিকে খেয়াল হল প্রফেসর বোসের। ঢালটার তলা থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত উঠে এসে সারা শরীরে লাগছে তাঁদের। তবে কি—

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে খুব আস্তে আস্তে হেলমেটের ভাইসরটা একটু উঁচু করলেন প্রফেসর। ঠান্ডা, ভেজা ভেজা একটা হাওয়ার স্রোত এসে লাগল মুখে। একটু সোঁদা গন্ধ আছে তাতে কেবল। কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে হঠাৎ এক টানে মাথার হেলমেটটা খুলে ফেলে জিষ্ণুর হেলমেটটাও খুলে দিলেন প্রফেসর। মাটিতে রাখা হেলমেটদের আলোয় হাসি হাসি মুখে তার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আর চিন্তা নেই রে!। সঠিক জায়গা পেয়ে গেছি। শুধু এই খাদটা পার করবার যা দেরি।"

"তার মানে?"

"প্রথম কথা হল এখানে বাতাসটা ভালো। আর তার চেয়েও বড় কথা, যেরকম হাওয়ার স্রোত উঠে আসছে তাতে ওখানে খুব বড় আকারের কোন পাতাল গুহা থাকবেই। নইলে এমন হাওয়ার স্রোত এই গভীরতায় তৈরিই হতে পারত না। আর বাতাসটা যেমন ভেজা ভেজা আর ঠান্ডা তাতে মনে হচ্ছে ওখানে জলের একটা উৎসও রয়েছে। চুণাপাথরের পাহাড়ে পাতাল নদী থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয় জিষ্ণু।"

suchipotro

“তাহলে চলো, এগোই।” বলতে বলতেই সামনে এগোতে যাচ্ছিল জিষ্ণু। প্রফেসর বোস তাকে বাধা দিলেন। তারপর তার পিঠ থেকে অক্সিজেনের ক্যানটা খুলে নিয়ে একপাশে রাখতে রাখতে বললেন, “না। এবারে আমি যাবো আগে। তুমি পেছনে আসবে। আর, হেলমেটটা পরে নাও।”

“কিন্তু তুমি তো আমাদের ক্যানদুটো খুলে রাখলে--- ”

“সে ঠিক। কিন্তু হেলমেটটা না পরলে হেডল্যাম্প আর রেডিওর সুবিধেটা থাকবে না যে! আর একটু কষ্ট করো শুধু,” বলতে বলতে নিজের মাথাতেও হেলমেটটা ফের চাপিয়ে নিলেন প্রফেসর। সামনের খোলা ভাইসর দিয়ে নিচে থেকে উঠে আসা পরিষ্কার বাতাসের ঝাপটা লাগছিল। পাতালগুহার অজানা দেশটা যেন স্বাগত জানাচ্ছিল দুই অতিথিকে।

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

পঞ্চা নামে ভালুকটি

চিত্ত ঘোষাল

মামা কীরকম বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

" কদিন এ রকম চলবে?"

"বেশি না, বেশি না," ডাক্তার আশ্বস্ত করল আমাদের, "তিন- চার দিনেই হয়ে যাবে।"

"হয়ে যাবে মানে!" আমি আঁতকে উঠলাম।

"আরে, তারপরে আর এখানে ওষুধ খাওয়াতে আনতে হবে না। অল্প ওষুধ চলবে, সে ওর খাবারের সঙ্গে মিশিয়েই খাওয়ানো যাবে। আমার ফি টা?"

মামা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ডাক্তারের হাতে দিল।

ডাক্তার নোটটা হাতে নিয়ে বলল, "আরো পঞ্চাশ। এখনই একবার ওষুধ খাইয়ে দেব।"

মামা ভালোছেলের মতো আবার একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ডাক্তারকে দিল। আমাদের বসতে বলে ডাক্তার তার ওষুধের আলমারি খুলল। কৌটো, বয়াম, ট্যাবলেটের পাতা নামিয়ে আনল বেছে বেছে। তিন- চারটে বয়াম আর কৌটো থেকে গুঁড়ো ওষুধ নিল, নানারকম ট্যাবলেটও আট- দশটা। তারপর ছোট হামানদিস্তায় ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করে পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হল ওষুধ। আমি ভাবছিলাম অতগুলো ওষুধ পঞ্চাকে খাওয়াবে কী করে ডাক্তার?

যেন মনের কথা বুঝেই ডাক্তার মামাকে বলল, "বুঝতে পারছেন কত ঝামেলার ব্যাপার? এতটা ওষুধ আপনারা একবারে খাওয়াতে পারবেন ওকে? পারবেন না যে তা তো জানা কথাই। কিন্তু আমি পারি, আর আমি পারি বলেই আমি ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দার। এই দেখুন- "

বলতে বলতে আলমারি থেকে বাঁশির মতো কী একটা জিনিস বার করে আনল। ঠিক যেন বাঁশের বাঁশি। সেই চোঙার মতো জিনিসটার মধ্যে গুঁড়ো ওষুধ ঢোকাতে ঢোকাতে ডাক্তার বলল, "কী দুরূহ কৌশল বুঝুন। এটার নাম হচ্ছে ফিডার। এটা দিয়ে আমি বড়ো বড়ো জন্তু- জানোয়ারকে ওষুধ খাওয়াই। নিন, ধরুন এটা সাবধানে, ওষুধ না পড়ে যায়। এবার এইদিকটা

এতটা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিন ভালুকের মুখে। অন্যদিকটা থাকবে আমার মুখে। তারপর সময়মতো দেব মোক্ষম একটা ফুঁ, ব্যস, ওষুধ চলে যাবে পেশেন্টের গলায়, গলা থেকে পেটে।”

আমি পঞ্চার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, চোঙার ডাক্তারের দেখানো দিকটা মামা ঢুকিয়ে দিল পঞ্চার মুখে। ডাক্তার চোখ বুঁজে জোড়হাতে মনে মনে কাকে যেন প্রণাম করে চোঙার অন্যদিকটা মুখে নিল। মুখোমুখি পঞ্চা আর ডাক্তার। চোখে চোখে তাকিয়ে। ডাক্তারের চোখে পলক পড়ছে না। তাক করে আছে ফুঁ লাগানোর ঠিক সময়টার জন্য। নাঃ, কায়দা আছে, কষ্টও আছে, এজন্যে পঞ্চাশ টাকা চাইতেই পারে ডাক্তার।

কথাটা আমি ভাবতে না- ভাবতেই কান্ড ঘটে গেল একটা। হঠাৎ চোঙা থেকে মুখ সরিয়ে বুকে হাত চেপে দারুণ কাশতে লাগল ডাক্তার। চোঙা পড়ে গেছে মাটিতে। হাওয়ায় উড়ছে ওষুধের গুঁড়ো, ডাক্তার খকখক করে কাশছে আর সাদা সাদা গুঁড়ো ওষুধ বেরোচ্ছে তার মুখ থেকে। আমি আর মামা ধরে ছিলাম পঞ্চাকে, আমরা তাকে ছেড়ে ডাক্তারকে নিয়ে পড়লাম। বাচ্চাদের বিষম খাওয়া সামলাতে মা- মাসিদের যা যা করতে দেখেছি তা- ই তা- ই করি আমরা। মামা ডাক্তারের পিঠ চাপড়ায়। আমি তার চাঁদি থাবড়াই হাতের চেটো দিয়ে।

সামান্য সামলে নিয়ে ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে, “জল, জল—”

ঘরের কোণায় কুঁজো ছিল। মামা ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে আসে।

জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয় ডাক্তার। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মোছে। তারপর কটমট করে তাকায় পঞ্চার দিকে।

“হঠাৎ কী হল আপনার ডাক্তারবাবু? আপনার কি কাশির রোগ আছে?” মামা বলে।

“আমার কোন রোগ- টোগ নেই,” ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে, “আপনাদের ভালুকের চিকিৎসা আমি করব না। এ রকম ভয়ানক অসভ্য ভালুক আমি জীবনে দেখিনি। আমি ফুঁ দেবার আগে ও-

ই ফুঁ দিয়ে দিল, সব ওষুধ চলে গেল আমার গলায়। নিজের ভালোমন্দ বোঝে না, চ্যাংড়া কোথাকার একটা। ভয়ানক! মোস্ট ডেঞ্জারাস! অত্যন্ত বিপজ্জনক!"

পঞ্চার এই অপমান সহ্য হল না আমার, রেগে- মেগে বলে বসলাম, "পঞ্চা ভয়ানক ভালুক হতে যাবে কেন, আপনি ভয়ানক পশু- চিকিৎসক। নিজে জানে না কেমন করে ওষুধ খাওয়াতে হয়। দোষ দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাকে।"

"এই চোপ," কাশতে কাশতেই ধমক দিল ডাক্তার, "তোমাদের ভালুক নিয়ে চলে যাও তোমরা। এ রকম অশিক্ষিত অসভ্য ভালুকের চিকিৎসা করব না আমি।"

এদিকে মামাও রেগে লাল, "কী বললেন? অশিক্ষিত ভালুকের চিকিৎসা করবেন না? আগে বলে দিলেই পারতেন যে বি. এ- এম. এ পাস ভালুক ছাড়া অন্য ভালুকের চিকিৎসা আপনি করেন না। যাকগে, চিকিৎসা যখন করবেন না টাকা ফেরত দিন।"

"এঃ, টাকা ফেরত দেবে? বিচ্ছিরি মুখের চেহারা করল ডাক্তার, ওদের ভালুকের চিকিৎসা করতে গিয়ে অতগুলো ওষুধ আমার পেটে চলে গেল, কী হবে কে বলতে পারে, হয়তো মরেই যাব। টাকা ফেরত দিচ্ছি আমি!"

"কিচ্ছু হবে না। আমাদের পঞ্চার চেয়ে আপনার ওজন কম না। যেটুকু ওষুধ আপনার পেটে গেছে তাতে একটা বেড়ালই মরবে না, আর আপনি তো- "

মামাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ডাক্তার বলল, "কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন যে ওষুধটা ভালুকের?"

"আপনিও—" কী বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে অন্য কথায় ঘুরল মামা, "টাকাটা ফেরত দিন, আমরা চলে যাচ্ছি।"

ডাক্তার নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই টাকা ফেরত দেবে না। মামাও ছাড়নেওলা না। শেষপর্যন্ত মামা বলল, "টাকা দেবেন না তো? বেশ, শুনুন তবে। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কী কী করব। প্রথমে থানায় যাব। থানায় বড়বাবুকে সব বলব। আমার ধারণা আপনি একজন জাল পশু- চিকিৎসক। তারপর আমাদের ধুকধুকিয়া বস্তি থেকে পাঁচশো লোক নিয়ে মিছিল করে আসব এখানে। স্লোগান দিয়ে আপনার কীর্তি ফাঁস করতে করতে আসব। মিছিলের লিডার কে থাকবে জানেন ? পরানজেঠু।"

"কে পরানজেঠু? হাতিঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।" বলল বটে ডাক্তার, কিন্তু গলার তেজ আগের চাইতে যথেষ্ট কম।

"পরানজেঠু কে? অপেক্ষা করুন, একটু বাদেই টের পাবেন। তারপর চিঠি দেব পশুক্লেশ নিবারণী সমিতিতে, কপি যাবে দিল্লীতে মন্ত্রীর কাছে, সে মন্ত্রী একটা নেংটি ইঁদুরের ওপর অত্যাচার হলেও সহ্য করে না। বুঝবেন ঠ্যালা কাকে বলে।"

শুনতে শুনতে ডাক্তারের মুখ চুপসে যাচ্ছিল। মামার কথা শেষ হতে তার ওরকম গোলগাল রাগী রাগী মুখখানা কীরকম শুকনো আর করুণ দেখাতে লাগল। মিনমিনে গলায় বলল, "সবটাই ফেরত দিতে হবে?"

ওষুধে কাজ হয়েছে বুঝে মামাও সদয় হল, "দশ টাকা রেখে বাকিটা ফেরত দিন।"

টাকা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। টাকা ফেরত পেয়েও মনে আনন্দ নেই। দুজনেই চুপচাপ ভেবে চলেছি। পঞ্চার চিকিৎসার ব্যবস্থা তো হল না। না জেনে না শুনে অন্য কোথাও নিয়েও যাওয়া যায় না।গরিবের টাকা বুঝে হিসেব করে খরচ করতে হয়।

রাস্তায় হঠাৎ দেখা আমাদের বস্তির গোপাল ডাক্তারের সঙ্গে। গরিবের ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি করে। দুটাকা পাঁচটাকা নিয়ে ওষুধ দেয়। যারা হদ্দ গরিব তাদের কাছ থেকে পয়সা নেয়ও না। বস্তির সবাই তো বলে, বেশ কাজ হয় ওষুধে।

কোথাও বোধহয় রুগী দেখতে গিয়েছিল গোপাল ডাক্তার, হাতে ওষুধের বাক্স ব্যাগের মতো ঝোলানো। আমাদের দেখে ডাক্তার বলল, "কোথায় গিয়েছিলে? খেলা দেখাতে বুঝি?"

"না," মামা বলল, "আমাদের ভালুকের শরীরটা খারাপ। তাই ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম।"

মামার কথা শুনে অবাক গোপাল ডাক্তার, "সে কী! আমি থাকতে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে ডাক্তার দেখাতে!"

ডাক্তারের কথায় মামা আরো অবাক, "আপনি মানুষের ডাক্তার, ভালুকের চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে গেলে আপনি আমাদের ভাবতেন না বোকার বোকা?"

হো হো করে হেসে উঠল গোপাল ডাক্তার, "না, ভাবতাম না, বরং এখনই ভাবছি। আরে বাবা, শুধু মানুষ? নেংটি ইঁদুর থেকে তিমি মাছ সবারই অসুখ সারবে আমার ওষুধে। হোমিওপ্যাথির কী জান তোমরা? যাকগে, তোমাদের ভালুককে দেখানো হল ডাক্তার?"

"কই আর হল, " মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "ওটা ঘোড়ার ডাক্তারও না, ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার। ভাগ্যে ওর জারিজুরি আমরা ধরে ফেলেছি, না হলে হয়তো আমাদের পঞ্চাকে ও মেরেই ফেলত।"

"খুব ভালো, খুব ভালো," ভারি খুশি- খুশি দেখাল গোপাল ডাক্তারকে, "তোমার ভালুকের অসুবিধেগুলো আমাকে বলো তো নকড়ি।"

মামা সব বলল।

শুনে তো গোপাল ডাক্তার হেসে বাঁচে না, "ওঃ হো হো হো, এই ব্যাপার! এরই জন্যে তোমরা ভেবে মরছ? তিন দিনের মধ্যে ঠিক করে দেব তোমাদের ভালুককে। দাঁড়াও।"

বলে ডাক্তার সেই রাস্তার মধ্যেই ওষুধের বাক্স খুলে বের করল একটা ছোটো শিশি, তার ভেতরে টলটলে জলের মতো একটুখানি ওষুধ।

"এই নাও ওষুধ। ব্রাইয়োনিয়া থার্টি। খাবার জলের সঙ্গে দশ ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে ওর সামনে রেখে দেবে। এই রকম তিন দিন চলবে। জলের সঙ্গে যেটুকু ওষুধ পেটে যাবে তাতেই দেখবে তোমাদের ভালুক চনমনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

"আপনাকে কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু?" মামা জিজ্ঞেস করল।

“এখন দিতে হবে না,” গোপাল ডাক্তার হাত মাথা জোরে জোরে নাড়ল, “আগে দ্যাখো আমার হোমিওপ্যাথির কেরামতি, তারপর আমার ওষুধে যে ভালুকের অসুখও সারে সেটা প্রমাণ হলে দিয়ো, হ্যাঁ,পাঁচ টাকাই দিয়ো। চলি তাহলে, নগেনের ছেলেটার জ্বর, ওকে একবার দেখতে যেতে হবে। আচ্ছা নকড়ি, আমি ঠিক জানি না, নগেনের অবস্থা কেমন। ওর কাছ থেকে ফি নেওয়া কি ঠিক হবে?”

“অবস্থা ওর খুবই খারাপ ডাক্তারবাবু,” মামা বলল।

“গেল , এটাও গেল,” গোপাল ডাক্তার যেন হায় হায় করে উঠল, “আজ সকাল থেকে চারটে রুগী দেখলাম, তার মধ্যে তিনজনেরই অবস্থা এমন যে পয়সা দিতে চাইলেও নিতে পারলাম না। নগেনের কাছ থেকেও পয়সা নেওয়া যাবে না বুঝতে পারছি। তাই বলে বাচ্চা ছেলেটার চিকিৎসা হবে না তাও তো হয় না। যাই, দেখি গে।”

“আমি বলছিলাম কি ডাক্তারবাবু,” মামার গলা ভারি নরম শোনাল, “পঞ্চার ওষুধের দামটা নিন না। আমাদের কাছে টাকা আছে।”

“বললাম তো নেব, পাঁচ টাকাই নেব। তবে এখন না। আচ্ছা চলি।”

বলে বাক্স দুলিয়ে দুলিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল গোপাল ডাক্তার। মামা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, “মানুষে মানুষে কত তফাত দেখলি দশা? গোপাল ডাক্তারও ডাক্তার, ভববন্ধু পোদ্দারও ডাক্তার। চল দশা, এগোই।”

গোপাল ডাক্তার একটাও কথা বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই তিন দিনের মধ্যে একেবারে সুস্থ হয়ে গেল পঞ্চা।

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

অলোকপর্ণার বিড়াল

রোহণ কুদ্দুস

অলোকপর্ণার বিড়ালের নাম মিনিমিনি। আসলে তার নাম বিনিবিনি। কিন্তু বিড়ালরা 'ব'- এর বদলে 'ম' উচ্চারণ করে। তাই বিনিবিনি নামটা হয়ে গেছে মিনিমিনি।

ঈশ্বর সারা সকাল জোড়ায় জোড়ায় পশুপাখি বানিয়ে দুপুরে ভরপেট খেয়েছেন। একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলের দিকে মানুষ বানাবেন এমনটাই ছক কষেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা গোলমালে তাঁর কাঁচাঘুমটা গেল ভেঙে। দেখলেন, ছাগল আর বিড়াল দুজনেই ডাকাডাকির জন্যে 'ব্যা' করছে।

হয়েছে কি, সামনে কচি ঘাস দেখে ছাগল তার বউকে ডেকেছে 'ব্যা।' কাছেই বিড়ালের গিন্নি ছিল, সে ছাগলের ডাকে এগিয়ে এসে মহানন্দে নরম ঘাস খেতে আরম্ভ করল। কিন্তু দু গ্রাস খেতে না খেতেই গা- টা গুলিয়ে হ্যাঁক- হ্যাঁক করে বমি করতে আরম্ভ করল। বিড়াল কর্তা এসে ছাগলের ওপর চোটপাট শুরু করল। "আমার বউকে ঘাস খেতে পরামর্শ দিস কোন সাহসে? ছাগল কোথাকার!" ছাগল প্রথমে ঠান্ডা মাথায় বোঝানোর চেষ্টা করছিল, সে বিড়াল গিন্নিকে নয়, তার নিজের বৌকে ডাকছিল। কিন্তু বিড়াল নখ বের করে ক্রমাগত ফ্যাঁস- ফ্যাঁস করতে থাকলে কার না রাগ হয়। ছাগলও মাটিতে খুর ঘষতে ঘষতে শিং বাগিয়ে ঢুঁ মারার তোড়জোড় শুরু করল। আর সব জন্তু- জানোয়ার দুজনকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাতাতে আরম্ভ করল।

'মার! মার! মার! মার!'

গোলমাল শুনে হন্তদন্ত হয়ে ঈশ্বর ছুটে এলেন। ব্যাপারস্যাপার দেখে তাঁর মাথায় হাত। ছাগলের দুটো ভোকাল কর্ড এক্সট্রা থেকে গিয়েছিল। ভুল করে সে দুটো বিড়ালদের গলায় চলে গেছে। আর বিড়ালদেরটা চলে গেছে জেলিফিসে। জেলিফিসের ভোকাল কর্ড কোথায় গেছে কে জানে। ভাতঘুম ভেঙে গিয়ে ঈশ্বরের তখন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে, কার গলার যন্ত্র কোথায় গেছে সেটা হিসাব করার মতো ধৈর্য তখন নেই। তাই মহা চটিতং হয়ে বিড়াল দম্পতিকে বললেন — "তোরা আজ থেকে ব উচ্চারণ করবি নাকো। ব- এর জায়গায় ম বলবি। বুঝেছিস? সব ব তোদের জন্যে ম।"

তা এসব হল সৃষ্টির গোড়ার কথা। অলোকপর্ণা স্কুল- কলেজ পাশ করে একটা চাকরি বাগিয়ে ব্যাঙ্গালোরে এসেছে বটে, কিন্তু এইসব খুঁটিনাটি বিষয় সে কিছুই জানে না। কারণ তার সিলেবাসে এসব ছিল না। আফশোস!

সে তার বিড়ালটাকে কিছুদিন আগেও 'ম্যাও' নামে ডাকত। বিড়ালটার আসল নাম যে মিনিমিনি (বা বিনিবিনি), সেটা সে জেনেছে অনেক পরে।

গল্পটা খুলেই বলি।

সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে অলোকপর্ণা দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বিড়ালটা এসে তার পায়ে লেজ বুলিয়ে আদর চায়। অলোকপর্ণা কাঁধ থেকে ল্যাপটপের ব্যাগ নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করে — "সারাদিন কী করলি ম্যাও?"

সারাদিনে ম্যাও ওরফে বিনিবিনি ওরফে মিনিমিনি অনেক কাজই করে। অলোকপর্ণা অফিসের জন্যে রওনা দিলেই বিড়ালটা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে পাশের দোতলা বাড়ির ছাদে লাফ দিয়ে নামে। তখন সে একেবারে স্পাইডারম্যান। আশপাশের বাড়ি থেকে আরও ২- ৪টে বিড়াল সেখানে এসে জোটে। তারপর সবাই মিলে পাখি খোঁজে। 'খেটে খাই' নামের বিড়ালটা ছাড়া সবাই- ই কোনও না কোনও বাড়ির পোষা। তাই পাখি ধরে খাওয়ার মতো কষ্ট কেউ- ই করতে চায় না। এরা পাখি খোঁজে পাখিদের বিরক্ত করবে বলে। কাছাকাছি কোনও গাছের ডালে পাখি দেখতে পেলেই তাদের দিকে তাকিয়ে বিড়ালগুলো একযোগে টিটকিরি দিতে আরম্ভ করে।

"কী রে আজ চান করেছিস?" (বিড়ালগুলো নিজেরা চানই করে না, তবু যে পক্ষীস্নান নিয়ে তাদের কেন এই রসিকতা কে জানে।)

"ঐ দামড়া, তোর নাম হাঁড়িচাঁচা কেন রে?" (এদিকে হাঁড়ি চেঁছেপুঁছে খাওয়ার ব্যাপারে বিড়ালরাই বেশি ওস্তাদ।)

"তোর নাম টুনটুনি রেখেছে কে রে? তুই কি সারাদিন টুনটুন করিস?" (মিনিমিনির নামটাই বা কে রেখেছে? ও কি সারাদিন মিনমিন করে?)

পাখিগুলো বিড়ালদের বাজে রসিকতায় কোনও কান না দিয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে উড়ে গিয়ে নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। বিড়ালগুলো পাখিদের কোনও সাড়া না পেয়ে রোদে শুয়ে- বসে ঘুমোয়, চেটে চেটে নিজেদের গা পরিষ্কার করে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটানোর পর যে যার বাড়ি ফেরে দুপুরের খাবার খেতে। অলোকপর্ণা মিনিমিনির জন্যে একটা বড় বাটিতে খাবার রেখে যায়। আর তার সঙ্গে আর একটা বড় বাটিতে জল।

সেদিন আর সব বিড়ালরা দুপুরের খাবারের জন্যে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে খেটে খাই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে কাছের পাঁচিলের ওপর হাঁটতে আরম্ভ করল। মিনিমিনি তাকে পিছু ডাকল — "ঐ খেটে খাই। কোথায় যাস?" খেটে খাই বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল — "আমার তো আর তোদের মতো মনিম* নেই যে মুখ না ঘোরাতেই খাবার এসে হাজির হয়।"

** আসলে খেটে খাই 'মনিব' বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বিড়ালরা 'ব' উচ্চারণ করতে পারে না। পড়ার সুবিধার জন্যে আমরা এর পর থেকে সব শব্দগুলো ঠিক করেই লিখে দেব। কিন্তু মনে রেখো, বিড়ালরা সবসময়ই ব- এর বদলে ম উচ্চারণ করে।)*

খেটে খাই হাওড়া স্টেশনে জন্মেছিল। ওর মা এক বিহারীর কুলির পোষ্য ছিল। অন্যান্য বিড়ালরা ট্রেন দেখলে ভয় পেত। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ট্রেনে উঠে খালি চিপসের প্যাকেট চাটা ছিল খেটে খাইয়ের

অভ্যাস। মাঝে মাঝে টুকরো বিস্কুট, চার- পাঁচটা চিপস, বাসি সন্দেশ জুটে যেত তার কপালে। একদিন এই কপালের ফেরেই একটা ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। প্রায় দু দিন এ কামরা ও কামরা ঘুরে ঘুরে, মাকে খুঁজতে খুঁজতে খেটে খাই এসে নামল ব্যাঙ্গালোরে। প্রথম প্রথম সে থাকত প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটা চায়ের দোকানে। জায়গাটা অনেকটা হাওড়া স্টেশনের মতোই লাগত। কিন্তু মাকে কাছে না পেয়ে মন খারাপ করত খেটে খাইয়ের। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত একটা ট্রেনে চেপে আবার মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু সাহসে কুলোত না। আবার যদি হারিয়ে যায় সে। ব্যাঙ্গালোরের এই চা দোকানের পাশে বসে তবু একটা ভরসা পেত মনে। দোকানের মালিকটা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ছোট মাটির খুরিতে একটুখানি দুধ, কখনও বা বিস্কুটের টুকরো দিত; কোনও কুকুর এসে তাকে বিরক্ত করছে কিনা লক্ষ রাখত। কিন্তু এক জায়গায় থিতু হওয়াটা বোধহয় খেটে খাইয়ের কপালে লেখা নেই। একটা বাচ্চা মেয়ে তাকে প্ল্যাটফর্মের সেই টি স্টল থেকে তুলে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। কিন্তু কদিন পরেই মেয়েটার বাবা বদলি হয়ে গেলেন হায়দ্রাবাদ। খেটে খাই চলে গেল অন্য একটা পরিবারের বিড়াল হয়ে। এমন করে আরও দু- তিন হাত ঘুরে সে এসে পড়েছে মিনিমিনিদের পাড়ায়। শেষ যে পরিবারের সঙ্গে সে ছিল, তারা হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল আমেরিকায়। খেটে খাই যে কোথায় থাকবে সে ব্যাপারে তারা একবার চিন্তাও করল না। বেচারা খেটে খাই তাই এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির পাঁচিলে ঘুরে ঘুরে নজর রাখে কোথায় কী খাবার পাওয়া যায়।

মিনিমিনি জানে মানুষ সম্পর্কে খেটে খাইয়ের রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। তবু সে আস্তে করে বলল — "তুই চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পারিস। আমাদের বাড়িতে অনেক খাবার থাকে।"

খেটে খাই একটু অবাক হয়ে গেল। কোনও বিড়াল তাকে কখনও নিজের বাড়িতে ডাকেনি খাওয়ার জন্যে। আকাশের দিকে তাকাল সে। রোদটা বেশ চড়া, তার ওপর ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি বলতে গেলে। তাই খেটে খাই আলতো পায়ে মিনিমিনিকে অনুসরণ করল।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দুই বিড়াল অলোকপর্ণার ফ্ল্যাটে ঢুকল। খেটে খাইয়ের মনটা ভালো হয়ে গেল। বসার ঘরের দেওয়ালে টিভি ঝোলানো। খেটে খাই এদিক ওদিক খুঁজে ডাইনিং টেবিল থেকে টিভির রিমোটটা মুখে করে নিয়ে এল। তারপর সেটা সোফার ওপর রেখে বড় লাল বোতামে চাপ দিল।

মিনিমিনি এতক্ষণ খেটে খাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু টিভিটা বিকট শব্দে চালু হয়ে যেতে ভয় পেয়ে গেল। সে সোফার ওপর উঠে খেটে খাইকে মৃদু ধমক লাগাল — "মানুষদের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করিস না।" ততক্ষণে খেটে খাই এ- চ্যানেল ও- চ্যানেল ঘুরিয়ে- টুরিয়ে কার্টুন নেটওয়ার্ক খুলে ফেলেছে। সেখানে 'টম এ্যান্ড জেরি' চলছিল। খেটেখাই প্রথম যে বাড়িতে ছিল, সেই বাড়ির ছোট মেয়েটা সারাক্ষণ দেখত এই কার্টুন।

মিনিমিনির কাছে অবশ্য ব্যাপারটা একেবারেই নতুন। অলোকপর্ণা বাড়িতে থাকলে হয় ক্রিকেট চলে, না হয় ওয়ার্ল্ড মুভিজ চ্যানেল। সেসব দেখেশুনে টিভির প্রতি কোনও ভক্তিই তার নেই। কিন্তু এখন ইঁদুর আর বিড়ালের এই খুনসুটি দেখে খাওয়াদাওয়ার কথা বেমালুম

ভুলে গিয়ে সে হাঁ করে টিভি দেখতে আরম্ভ করল। খেটে খাই তাকে বোঝায় – "বিড়ালটা ইঁদুরটাকে ধরতে চায়, কিন্তু ইঁদুরটা খুবই চালাক। সে শুধুই পালিয়ে বেড়ায়।" টিভির পর্দা থেকে চোখ না সরিয়েই মিনিমিনি জিজ্ঞাসা করে – "কিন্তু বিড়ালটা ইঁদুর ধরে করবে কী?" খেটে খাই বিরক্তির সুরে বলল – "বিড়াল ইঁদুর ধরে কী করে? মারবে।" মিনিমিনি এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেল – "বিড়াল ইঁদুর মেরে কী করবে?" এবার খেটে খাই ভুরুটুরু কুঁচকে লেজ নাড়িয়ে মিনিমিনিকে মুখ ঝামটা দিল – "তোদের মত পোষা বিড়ালগুলো এমন নেকুপুষুমুনু হয় যে বলার নয়। বিড়াল ইঁদুর ধরে খায়।" এমন অদ্ভুত কথা শুনে মিনিমিনির গা গুলিয়ে উঠল। বিড়াল ইঁদুর খায়? ইয়াক! এরপর কী শুনতে হবে? বিড়াল আরশোলা খায়? ছ্যাঃ! অলোকপর্ণার ফ্রিজের নিচে একটা আরশোলা থাকে। তার নাম নিশুম্ভ। রাতের দিকে অলোকপর্ণা ঘুমিয়ে পড়লে সে বেরিয়ে এসে মিনিমিনির সঙ্গে সুখ- সুঃখের গল্প করতে আসে। ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে মিনিমিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুই কি আরশোলাও খাস?" খেটে খাই তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "ইঁদুর খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে লাগলে আরশোলা খাই। কেমন মুচমুচে খেতে। আহ!" বলতে বলতেই খেটে খাই জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল। এখন নিশ্চয় নিশুম্ভ ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বলা তো যায় না, আর একটা বিড়ালের আওয়াজ পেয়ে যদি গপ্পো করতে বেরিয়ে আসে। ও তো আর জানে না, বিড়াল আরশোলা খায়।

ওদিকে খাওয়াখাওয়ির কথা শুনে খিদেতে খেটে খাইয়ের পেট ডাকতে আরম্ভ করল। 'গররর গ্লুব গ্লাব' শব্দ শুনে মিনিমিনি ভয় পেয়ে গেল। সে আজীবন অলোকপর্ণার এই ফ্ল্যাটে মানুষ হয়েছে। খাবারের অভাব হয়নি কখনও। তাই ক্ষিদে পেলে যে পেটের মধ্যে এমন আওয়াজ হতে পারে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাই ভয়ে ভয়ে খেটে খাইকে সে জিজ্ঞাসা করল, "তোর পেটে কি ইঁদুর ঢুকেছে? ওরকম আওয়াজ হচ্ছে কেন?"

খেটে খাই করুণ স্বরে বলল, "খিদেতে আমার পেটে ছুঁচো দৌড়চ্ছে।"

এটা শুনে মিনিমিনি মুখ ভেটকে তাকাল খেটে খাইয়ের দিকে, "তুই ছুঁচোও খাস?"

খেটে খাই আবার পোষ্য বিড়ালের ন্যাকামির ওপর ভাষণ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বসার ঘরের এককোণে দুটো বড় বাটির দিকে নজর গেল তার। বেশ ভালো গন্ধ আসছে। খেটে খাই জিভ দিয়ে গোঁফ- টোফ চেটে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি তোর খাবার?" মিনিমিনি ভালোমানুষের মত বলল, "একটাতে আমার খাবার। অন্যটাতে জল। তোর তো খিদে পেয়েছে। তুই- ই আগে খা। আমি তারপর খাচ্ছি।"

খেটে খাই তুড়ুক করে লাফ মেরে সোফা থেকে নেমে এগিয়ে গেল খাবারের দিকে। মিনিমিনি আবার টিভির দিকে মন দিল। বিড়ালটা ইঁদুরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐটুকু পুচকে ইঁদুর মহাচালাক। ঠিক কী করে যেন পালিয়ে যাচ্ছে। উলটে বিড়ালটাই নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে। নিজের এক জাতভাইয়ের এমন অপমানে মিনিমিনির বেশ রাগ হতে লাগল। টিভির স্ক্রিন লক্ষ করে একটা লাফ দিয়ে ইঁদুরটাকে ধরবে কিনা ভাবছে, খেটে খাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে তার পাশে বসে একটা ঢেকুর তুলল, "ক্রাউ।"

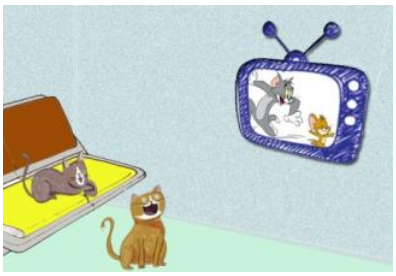

মিনিমিনি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

“কী রে? পেট ভরল?”

একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে খেটে খাই বলল, “আমি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি।”

মিনিমিনি সোফা থেকে নেমে তার খাবারের বাটির কাছে গিয়ে দেখে সব খাবার শেষ। মুখ ঘুরিয়ে দেখে খেটে খাই গোল হয়ে শুয়ে একটা চোখ অল্প খুলে রেখে টিভি দেখছে। তার কাছে গিয়ে মিনিমিনি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, “তুই যে আমার খাবারটা সাবাড় করলি, এবার আমি খাব কী?”

খেটে খাই উঠে বসে লেজ নাড়াতে নাড়াতে বলল, “তোর মানুষটা তোর খাবার কোথায় রাখে? সেখান থেকে খেলেই পারিস।”

মিনিমিনি ভাবতে চেষ্টা করল। অলোকপর্ণা তার খাবার কোথায় রাখে তা ভাবার দরকার হয়নি কখনও। সকাল থেকে মিনিমিনির বাটিতে খাবার রাখা থাকে। সে সারাদিন ঘুরে ফিরে খায় সেটা। রাতে খাবার শেষ হয়ে গেলে অলোকপর্ণা তার বাটিটা ধুয়ে এনে রাখে। আবার পরদিন সকালে খাবার ভর্তি করে দেয়। সেই খাবার কোথা থেকে আসে তা মিনিমিনি কোনওদিনই জানার প্রয়োজন মনে করেনি।

মিনিমিনি চুপ করে আছে দেখে খেটে খাই ব্যাপারটা আন্দাজ করল। অবাক হয়ে সে মিনিমিনিকে জিজ্ঞাসা করল, “তোর খাবার কোথায় থাকে তাও জানিস না? তুই বিড়ালদের কলঙ্ক।” তারপর সোফা থেকে নেমে বলল, “তোর মানুষ রান্না করে কোথায়? মানুষগুলো খাবার ওখানেই রাখে।”

এদিক ওদিক তাকিয়ে সে প্রথমে অলোকপর্ণার বেডরুমে ঢুকল। সাজানো গোছানো বিছানা দেখেই খেটে খাইয়ের পাগুলো সুড়সুড় করে উঠল। এক লাফে অলোকপর্ণার বিছানায় উঠে একটা সাদা বালিশের ওপর গোল হয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিমিনি এমনটা করলে অলোকপর্ণা ভালোরকম ধমক দেয়, তাই সে সাধারণত বিছানা থেকে দূরেই থাকে। ঘুম পেলে সে ড্রয়িংরুমের সোফাতেই লম্বা হয়।

মিনিমিনি একটা মৃদু প্রতিবাদ করল, “বিছানা থেকে নেমে আয়। ওখানে মানুষে ঘুমোয়।” তারপর একটু থেমে বলল, “আমার খিদে পেয়েছে।”

খেটে খাই বিছানা থেকে অনিচ্ছার সঙ্গে নেমে এল। তারপর শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু এদিক ওদিক ঘুরে ঢুকল অলোকপর্ণার কিচেন। মিনিমিনির দিকে ঘুরে বলল, “এই হল সেই জাদুঘর, যেখানে মানুষ খাবার বানায়।” তারপর একটু ভেবে বলল, “এখানে কোথাও একটা ঠান্ডা বাক্স আছে। সেখানে খাবার থাকে। তোরও খাবারও নিশ্চয় ওতেই আছে।”

কিন্তু কিচেনে জায়গার অভাবে অলোকপর্ণার ঠান্ডা বাক্স মানে ফ্রিজ তার ড্রয়িংরুমেরই এক কোণে রাখা। কিন্তু খেটে খাই তো আর তা জানে না। তাই ঠান্ডা বাক্স ভেবে সে কায়দা করে কিচেনের কাবার্ড খুলতে গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি শুরু করল। একটু জোর লাগাতেই ধড়াম করে দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। আর ভেতর থেকে তিনটে থালা আর কিছু বাটি গড়িয়ে পড়ল। একটা কাপও ভাঙল। মিনিমিনি ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল। সে

তাড়াতাড়ি খেটে খাইকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল কিচেনের বাইরে। ড্রয়িংরুমে এসেই খেটে খাই লাফিয়ে উঠল। ঐ তো ঠান্ডা বাক্স!

সে এবার সামনের পায়ের থাবা দিয়ে ফ্রিজের দরজার তলাটা ধরে টানল। অলোকপর্ণা কোনওকালেই ফ্রিজের দরজায় তালা দেয় না। কারণ সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি যে কোনও বিড়াল তার ফ্রিজের দরজা খুলতে পারে। ফ্রিজের দরজা খুলতেই মিনিমিনি অবাক হয়ে গেল। কী ঠান্ডা! আহ! খেটে খাইও একই রকম বিস্ময়ে ফ্রিজের ভেতরটা দেখতে লাগল। থরে থরে খাবার সাজানো।

এরপর যা ঘটল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বেচারা অলোকপর্ণার ওপর আমার দারুণ মায়া হচ্ছে। দুই বিড়াল মিলে তার ফ্রিজের প্রত্যেকটা খাবার ফ্রিজ থেকে নামিয়ে বিড়ালের খাবার খুঁজতে চেষ্টা করল। সেটা না পেয়ে তারা শেষ পর্যন্ত দয়া করে অলোকপর্ণার খাবারই সাঁটাতে লাগল। মিনিমিনি প্রথম প্রথম আড়ষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যখন রান্না করা মাছের বাটি উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ল আর খেটে খাই সেটা চাকুম- চুকুম করে খেতে আরম্ভ করল, তখন সে আর নিজেকে আটকাতে পারল না।

ফ্রিজ থেকে একের পর এক খাবার মেঝেতে পড়তে লাগল। পাঁউরুটির প্যাকেট, মাখনের বাক্স, জ্যামের বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট (ফ্রিজে কেউ বিস্কুট রাখে! অলোকপর্ণার আক্কেল দ্যাখো।) সবকিছুই খুলে দেখতে লাগল মিনিমিনি আর খেটে খাই। এমনকি চারটে ডিমও বাদ গেল না। মেঝেতে পড়ে ভাঙার পর চেটেপুটে দুজনে ডিমের সাদা আর কুসুমও খেল। এরপর মিনিমিনির নজর গেল সফট ড্রিংক্সের বোতলের দিকে। সে খেটে খাইকে জিজ্ঞাসা করল, “এটা কী?”

ওটা যে কী তা খেটে খাইও জানে না। তাই দুজনে ঠিক করল ওটা কী তা জানতেই হবে। বোতলটা ঠেলে ফ্রিজ থেকে ফেলে দিয়ে দুজনে পরীক্ষা করছে, এমন সময় দরজার বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। মিনিমিনি এই আওয়াজ চেনে, তাই সে এবার ভয়ে ভয়ে খেটে খাইকে জিজ্ঞাসা করল, “এবার কী হবে?” অলোকপর্ণা যদি দেখে তারা দুজন মিলে ফ্রিজ খুলে কী করেছে, তাহলে আর রক্ষা নেই। ঠিক কী যে হবে সে সম্পর্কে মিনিমিনির কোনও ধারণা নেই। কারণ এর আগে এই ধরনের অপরাধ সে করেনি। কিন্তু খেটে খাই খুব ভালো করেই জানে এমন কাজ করলে একজন মানুষ কী করতে পারে। তাই সে এক ছুটে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে কেটে পড়ল। মিনিমিনিও তাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডিমের কুসুমে পা পিছলে সে দমাস করে পড়ল মেঝেতে। আর ঠিক সেই সময়ই অলোকপর্ণা দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে পা রাখল।

শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে সে আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভেবেছিল বাড়ি ফিরে একটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু দরজা খুলে ঘরের মধ্যে যা অবস্থা দেখল তাতে সে থ। ফ্রিজের দরজা খোলা, সমস্ত খাবার ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। আর সবকিছুর মধ্যে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বসে আছে তার বিড়াল।

ছবিঃ লেখক

suchipotro

অথ গোদো- প্রণবঃ কথা

(একটি ভয়ানক বৈজ্ঞানিক ভ্যাবাচ্যাকা)

তাপস মৌলিক

'গোদো' এবং 'প্রণব' তত্ত্ব সারা বিশ্বে একটি বিখ্যাত তত্ত্ব। তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই আমার এ লেখার দুরভিসন্ধি।

প্রথমেই বলি 'গোদো' আসলে কী তা আমি জানি না। 'গোদো' হচ্ছে এমন একজন লোক বা এমন একটি বস্তু যা পেলে আমাদের সবার সমস্ত আশাআকাঙ্খা চরিতার্থ হয়ে যাবে, গুল্মে গুল্মে পুষ্প ফুটবে, পাখিসব রব করবে এবং শুকোনো বাগান আবার সাজবে। এই গোদোকে নিয়ে গত ষাট বছর ধরে সারা বিশ্বে তোলপাড় চলছে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত বয়েসের লোক নাকি হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে গোদোকে। খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না সেটা 'গোদো'- র সংজ্ঞা দেখলেই দিব্যি বোঝা যাবে। 'n সংখ্যক লোকের একটা দলের মধ্যে (n+1)- তম লোকটি হল গোদো।' সংজ্ঞা থেকে গোদোর ব্যাপারটা বুঝে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। এ বুঝতে গেলে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের অনেক কচকচির প্রয়োজন। ব্যাপারটা আমি একটু সোজা করে বলার চেষ্টা করছি।

প্রথমে বুঝতে হবে 'প্রণব' কাকে বলে। 'প্রণব'- এর সংজ্ঞা হল – 'n সংখ্যক লোকের একটা দলের মধ্যে n জনই প্রণব।' অর্থাৎ কিনা আমরা সবাই এক একজন প্রণব। আমাদের সবার রাম, শ্যাম, ঘটোৎকচ ইত্যাদি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও সমষ্টিগতভাবে আমরা সবাই প্রণব।

ধরা যাক একটা যাত্রীবোঝাই বাস যাচ্ছে। এখন, বাসের লোকেদের সাপেক্ষে বাসের প্রত্যেক যাত্রীই প্রণব, আর বাসের বাইরের লোকেরা গোদো। আবার যদি বাসের বাইরের বহির্বিশ্বকে একটা syst em ধরি, তবে বাসের বাইরের লোকেদের সাপেক্ষে ওরা নিজেরা সবাই প্রণব, আর বাসের লোকেরা গোদো। এখন ধরা যাক, একজন বাসে উঠছেন। বাসে ওঠার সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে, সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ে, তিনি বাসের লোকেদের কাছেও গোদো, আবার বাসের বাইরের লোকেদের কাছেও গোদো। এই সময়কে ধরে i nt egr at e করে 'গোদো'- কে ধরা যেতে পারে। গোদোতত্ত্বের ব্যাপকতা ও জটিলতার আঁচ দেবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

পাশাপাশি প্রণব- তত্ত্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। প্রণব যদি হয় mat t er , তবে গোদো ant i - mat t er . And not hi ng el se mat t er s. গোদো- প্রণব সংস্পর্শে ধ্বংস অনিবার্য। বিদেশে গোদো- প্রণব সংঘাত ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টাও নাকি শুরু হয়েছে। প্রণব থিওরিতে অঙ্ক কষা খুব সহজ। ধরা যাক, একটা দলে ৬ জন লোক আছে। অর্থাৎ নিজেদের সাপেক্ষে তারা সবাই প্রণব। এখন, আরেকজন আগন্তুক এলে সেও প্রণব হয়ে যাবে। অর্থাৎ, প্রণব + ১ = প্রণব। অর্থাৎ, ১ = ০। এই থিওরিতে পড়াশুনো হয় এমন একটি স্কুল আমাদের এই দুর্গাপুরেই আছে। সে স্কুলে সব প্রণবেরা পড়ে। স্কুলটির নাম 'প্রণবানন্দ (প্রণব হইয়া আনন্দ) বিদ্যাপীঠ'।

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, কোনও মেশিনের সমস্ত পার্টস খুলে ফেলে আবার জোড়া লাগাতে গেলে একটি পার্ট বাড়তি হয়। এটি হচ্ছে গোদো- পার্ট। এভাবে বিভিন্ন মেশিন বারবার খুলে ও ফিট করে অনেক গোদো- পার্ট ও তা থেকে আস্ত একটি গোদো- মেশিন তৈরি করা সম্ভব। জাপান এব্যাপারে শুনেছিলুম অনেক গবেষণা করছে। জানিনা কদ্দূর কী এগিয়েছে।

সবশেষে একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা শেষ করব, যাতে ব্যাপারটা হাতের মধ্যে থাকে। অনেকের হাতে দেখবে ছ'টা আঙুল। ষষ্ঠ আঙ্গুলটি হচ্ছে 'গোদো আঙুল'। ছ'টা আঙুল অবিশ্যি কারো পায়েও থাকতে পারে, কিন্তু একবার যখন ধারণাটা হাতের নাগালে এসেছে, আশা করি হাত ফস্কে সেটাকে আর পায়ে ঠেলবে না।

suchipotro

এম বি বি এস এম আর সি পি

স্বপ্না লাহিড়ী

সকাল বেলা বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম, আজ একটু অন্যপথে বাড়ি ফেরা যাক। এ পথটা তো এতো চিনি যে এর গাছপালা পাথর মাটি খানা খন্দ সব মুখস্ত হয়ে গেছে। জীবনে নতুন ছন্দ আনার জন্য একটা অন্য পথ ধরি । পথের ধারে বাঁক নিয়ে নতুন রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলাম।

বেশ নতুন নতুন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে চলছিলাম। একটা জায়গায় রাস্তার ধারে একদম নতুন আনকোরা ঝকঝকে একটা ডাক্তারখানা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। নতুন বোর্ডে নাম লেখা ডাঃঅতনু মিশ্র, পাশে অনেকগুলো ডিগ্রি। ভাবলাম অনেকদিন রক্তচাপ পরীক্ষা করানো হয়নি, করিয়েই নিই।কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, কোনও লোকজন নেই, শুধু ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে রাখা প্লেট থেকে একটা একটা করে চিনেবাদামের দানা মুখে দিচ্ছেন। চিবুচ্ছেন, কিন্তু গিলছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকতেই, তিনি একটা চোখ খুলে বললেন, "ক্যামন আছেন?" যেন কতদিনের চেনা।

বললাম, "ভাল।"

তেমনিই চোখ বন্ধ করে রেখে তিনি বললেন, " তা ভাল আছেন তো এখানে কেন?"

বলতে যাচ্ছিলাম, "রক্তচাপটা. . . "

তার আগেই তিনি সটান সোজা হয়ে বসে বললেন, "শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো গন্ডগোল করছে তো? হাত, পা, ঘাড়ের কলকব্জাগুলোও বিকল হয়ে উঠেছে?"

আমি "না না" বলতেই খ্যাঁক করে উঠে বললেন, "ডাক্তার আমি না আপনি?"

ভয়ে ভয়ে বললাম, "আপনি।"

আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন , "উঠুন , উঠে দাঁড়ান।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। উনি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, "একটা হাত ওপরে তুলুন।"

আমি বাঁ হাতটা ওপরে তুলতেই বললেন, "ওমনি করেই দাঁড়িয়ে থাকুন।"

একটু পরেই হাতটা টনটন করতে যেই নামিয়েছি ওমনি এক ধমক, "শুনতে পাননি আপনার কাঁধের স্ক্রুগুলো কেমন কটকট করে উঠলো?"

আমি বললাম, "না তো! "

উনি বললেন, "সে কী? আপনার কানটাও গেছে নাকি?" তারপর একটু এদিকওদিক ঘুরে এসে ফের বললেন, "আচ্ছা এবার আপনি এ হাতটা নামিয়ে অন্য হাতটা তুলুন।" আমি বাঁ হাতটা নামিয়ে ডান হাতটা তুলতেই বললেন, "বাঁ পাটাও হাঁটু থেকে মুড়ে দাঁড়ান।"

আমার হাঁটুতে এমনিতেই খুব ব্যথা। হাঁটু মুড়ে. দাঁড়াব কী করে ভাবতে ভাবতেই বললাম, "ডাক্তারবাবু হাতের সঙ্গে পা- ও?"

উনি আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘোঁত্ করে একটা শব্দ করে বললেন, "ব্যালান্স কাকে বলে জানেন? যখন হাঁটেন তখন পায়ের সাথে হাতও চলে কি না?"

ভাবলাম, ঠিক। দেওয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে নিজের ব্যালান্সটাকে একটু সামাল দিলাম। একটু পরে ডাক্তারবাবু আমার একেবারে কাছে এসে বললেন, "আপনার হাত পায়ের স্ক্রুগুলো মর্চে খেয়ে ঘষে গেছে মশাই। বয়স কত হল?"

বললাম, "তা সত্তর হবে।"

উনি বললেন, "তা ই।"

বলতে যাচ্ছিলাম, "ওগুলো তো বল অ্যান্ড সকেট. . . . "

বল পর্যন্ত শুনেই চোখ কপালে তুলে বলে উঠলেন, "বল? এই বয়সে বল খেলবেন আপনি? পুরো শরীর বিকল, আর আপনি কিনা-- হুঁ হুঁ. . "

বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে গেলেন । একটু পরেই বেরিয়ে এলেন দুহাত প্রমাণ লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে। হয়তো এবার আমার স্ক্রুগুলো টাইট করা হবে! ভয়ে ভয়ে বললাম, "ডাক্তারবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

আমার ওপর দয়া করে তিনি বললেন, "বলুন।"

বললাম, "হাত পায়ের স্ক্রুগুলো কি আমার ছোট থেকেই আছে?"

উনি বললেন, "নিশ্চয়। সেজন্যেই তো ওগুলোর এই অবস্থা! সত্তর বছর বয়স তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!"

শুধোলাম, "তখন থেকেই এত বড় বড়?"

উনি বললেন, "না না তা কেন? তখন ছোটই ছিল। তারপর ওগুলো আপনার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে, এবার ওদের খুলতে হবে।"

বলেই স্ক্রু ড্রাইভারটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। আস্তে আস্তে বললাম, "ডাক্তারবাবু , স্ক্রুগুলোতে সব মর্চে পড়ে গেছে তো! ওগুলোকে একটু তেল খাইয়ে নিলে হয় না? খুলতে গিয়ে আধখানা ভেঙে গিয়ে যদি ভেতরে পড়ে যায়. . . . যতোই হোক ওরিজিনাল পিস তো!"

একটু ভেবে উনি বললেন, "তা ঠিক," তারপর ভেতর থেকে একটা লম্বা গলা অয়েল ক্যান নিয়ে এলেন। কি বিচ্ছিরি গন্ধ! জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী তেল?"

উত্তর পেলাম একটু শক্ত গলায়, "পুরোন মবিলের সঙ্গে আমার কিছু নিজস্ব লতা পাতা সেদ্ধ করা আছে. . . ."

বলেই হড় হড় করে সেই তেল ঢালতে থাকলেন আমার মাথা থেকে গায়ে। গন্ধে ততক্ষণে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে । আমার গোটা শরীর চপচপে তেলে চুবিয়ে বললেন, "চব্বিশ ঘন্টা এই তেলটা থাকুক, স্ক্রুগুলো ভিজুক। কাল আপনি ঠিক এই সময় আসবেন, ভুলবেন না। না এলে যেখানেই থাকবেন ধরে নিয়ে আসবো। এখন দশটা টাকা দিয়ে যান আমার চিকিৎসা বাবদ।"

কোন রকমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে তেল চপচপে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে, দৌড়ে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাড়ি ফিরে, স্নান করে সোজা স্টেশনে। টিকিট কেটে মুম্বই। ছ'মাস আর এ মুখো হই নি।

ছবিঃ মলয়চন্দন সাহা

suchipotro

পুরোনো বাড়ি

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ক্লাস ফাইভ, এপিজে স্কুল, সল্ট লেক

ওই হালিশহরের পুরোনো বাড়িটাতে বড় বড় লোক যেতে ভয় পায়। কিন্ত একদিন আমি আর আমার বন্ধুরা সবাই মিলে সেখানে গেলাম কে কত বীর সেটা প্রমাণ করতে। বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে ওরা আমায় একদম উপরের ঘরটায় গিয়ে ওদের দিকে হাত নাড়তে বলল, কিন্তু তার আগে দেখি যে ওরা কয়েকটা সাদা কাপড় নিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পরল। বেশ! আমিও বুঝে গেলাম যে ওরা আমায় ভয় দেখাবে। আমিও বাড়িটার মধ্যে ঢুকলাম। দেখতে দেখতে আমি ওই উপরের তলার দরজাটা দেখতে পেলাম। হাত দিতে দেখি বন্ধ। তারপর আমি নিচে নেমে এলাম। সামনে দেখি একটা সাদা কাপড়। আমিও বুঝে গেলাম যে ওই সাদা কাপড়ের মধ্যে ওরা, কিন্তু ওরা দাঁড়িয়ে কেন গেল? পিছনে তাকিয়ে দেখি আরো একটা সাদা কাপড়। তারপর আমরা হাবার মতন দৌড়োলাম। হঠাৎ দেখি ওই জিনিসটার নিচে দুটো পা। কাপড়টা টানতে দেখি একটা চেনা জানা লোক। হঠাৎ মনে পড়ল যে একে চোরদের পোস্টারে দেখেছি। আমরা পাঁচজন ওকে ধরলাম। আর অন্যরা পুলিশকে ডাকল।

পুলিশ যাবার পর যখন বাড়ি ফিরছি হঠাৎ ওই দরজাটার কথা মনে হল। কেন যে বন্ধ ছিল কে জানে? উপরের জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখি জানালাটা খোলা আর আর আমি ওখান থেকে হাত নাড়ছি।

ছবিঃ ঋত্বিক

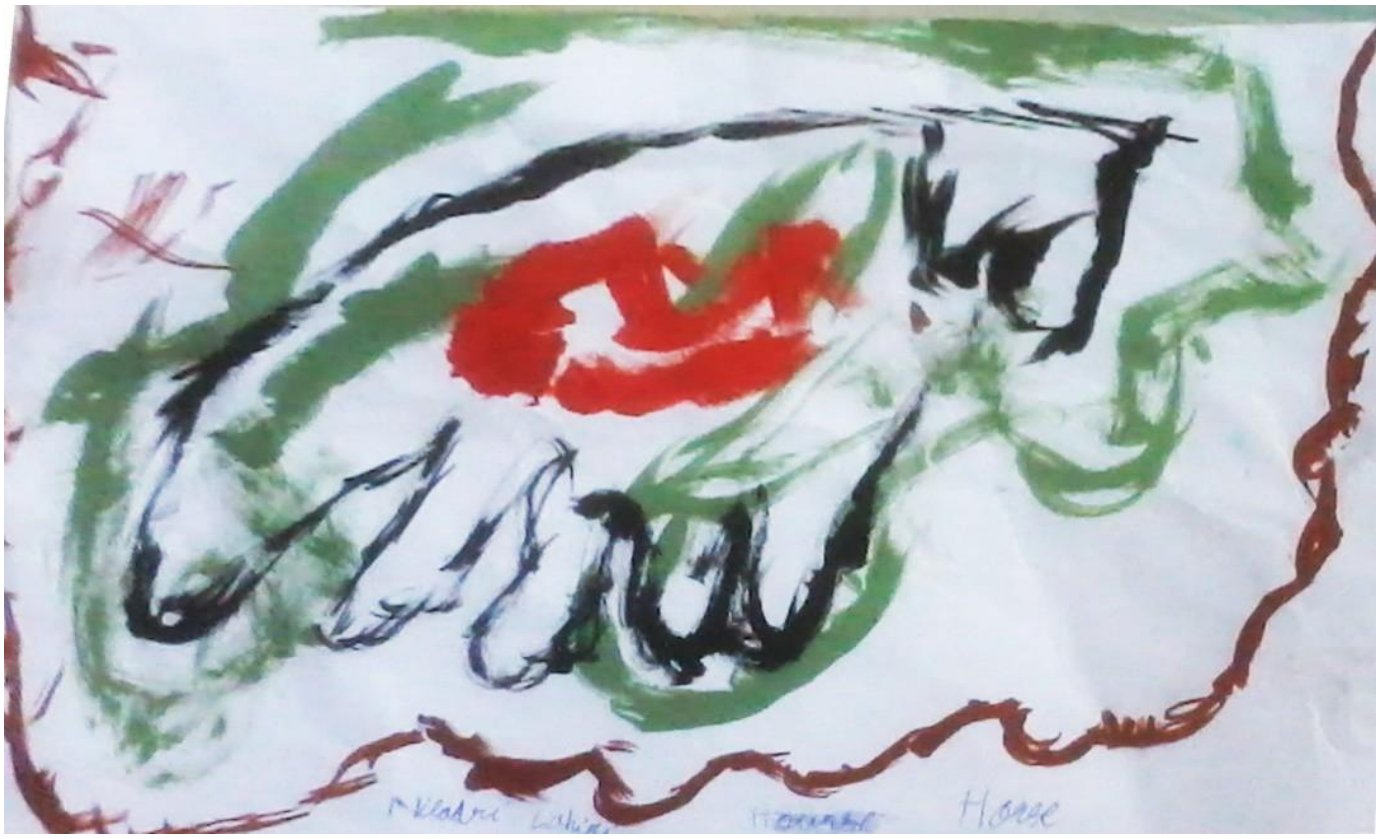

মেহেল ছবি এঁকে পাঠিয়েছে সে—ই ছত্তিসগঢ় থেকে। ছবি দেখে তো আমি কিছুই বুঝতে পারি না। শুধু রঙ আর রং—সাদা কাগজের বুকে খেলে বেড়াচ্ছে।
মেহেলকে ওর ছবির মানে জিজ্ঞেস করাতে উত্তর এলো , একটা ঘোড়া আর একটা মা। জিজ্ঞেস করলাম, ঘোড়ার লেজ অত মোটা কেন? বলল, অমনিই হয়। এইবার তোমরাই বুঝে নাও।

suchipotro

সংহিতা

সূত্রঃ *যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শেষ পর্বে ছিল উপস্থিত রাজন্যদের অর্ঘ্য দেওয়ার পালা। পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠির প্রথম অর্ঘ্য তুলে দেন বৃষ্ণিকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের হাতে। তাতে প্রতিবাদ করেছিলেন চেদীরাজ শিশুপাল। যাবতীয় দেবতা, দেবদ্বিজ এবং মহাপরাক্রমশালী রাজাদের ছেড়ে সিংহাসনহীন রাজপুরুষ কেশব কেন পাবেন প্রথম অর্ঘ্য এই ছিল শিশুপালের প্রশ্ন। কারণ শিশুপালের নজরে কেশব আসলে এক ঘাতক - কেশুহন্তা, মধুহন্তা, পুতনাবধকারী, কংসনিধনকারী। সহদেব, যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্ম নিজে শিশুপালকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিলোকশ্রেষ্ঠত্বের মহিমা। কিন্তু শিশুপাল জানান যে তাঁর মতে সব থেকে বেশি অনৈতিক ভীষ্মের আচরণ এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ভীষ্ম আত্মীয়দের হাতেই প্রাণ হারাবেন। শিশুপালের মতে, ভীষ্ম যখন নীতিকথা শোনান তাঁর উত্তরপুরুষদের বা তাঁদের সুরক্ষার জন্য নানান কাজ করেন, তখনই তাদের নৈতিক ভবিষ্যতটিও বিনাশ করেন নিজের কাজগুলো দিয়েই,*

যেহেতু সেই সব কাজ তাঁর বংশরক্ষায় অপরিহার্য হলেও, অন্য কারুকে আহত বা নিহত করে – অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই বক্তৃতার উপমায় তিনি এক বৃদ্ধ রাজহাঁসের কথা বলেছিলেন।

এক সাগরবেলায় বাস করত একদল রাজহাঁস। তাদের মধ্যে প্রবীণতম রাজহাঁস সমস্ত গোষ্ঠীকে উপদেশ শোনাতেন সারাদিন। সেই উপদেশের সার ছিল, "ধর্মের পথে থেকো, পুণ্যের পথে থাকো, পাপ পরিহার করো।"

মন্ত্রের মতো সারাদিন সারারাত শুনে শুনে এই বাণী শুধু রাজহাঁসই নয়, অন্য যত সমুদ্রচারী পাখি ছিল, তাদের সবার কন্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই সাগরবেলা দিয়ে গেলে মানুষও সেই সুমহান ধর্মবাণীটি শুনতে পেত।

ভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় তাই রাজহাঁস আর অন্য পাখিরা বুড়ো রাজহাঁসকে খাবার এনে দিত। এইসব খাবার জোগাড় করতে যাবার সময় তারা নিজেদের ডিম রেখে যেত বুড়োর জিম্মায়। বুড়োও যেন পরম দায়িত্বে সেই সব ডিমের উপর নজর রাখত।

এক সতর্ক ও বুদ্ধিমান রাজহাঁসের নজরে আসে প্রথমে যে ডিমের সংখ্যা যেন

ক্রমে কমে যাচ্ছে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যে বুড়োর জিম্মায় ডিম রেখে বাকি রাজহাঁসেরা খাবার সংগ্রহে রওয়ানা হলে বুড়ো কী করে।

যেমনটি ছিল তার দুরাশায় তেমনই ঘটত সব রাজহাঁস ডিমের জিম্মা বুড়ো রাজহাঁসকে দিয়ে খাবারের খোঁজে গেলে। অর্থাৎ বুড়ো ডিম ফাটিয়ে খেয়ে ফেলত হবু ছানাদের। এই অনাচারে ভয়ানক রেগে গেল সতর্ক রাজহাঁস। সে বাকিদের জানাল যে ধর্মকথার আড়ালে বুড়ো রাজহাঁস কী ভীষণ অধার্মিক ও নৃশংস।

বাকি রাজহাঁসেরা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ রাখল বুড়ো রাজহাঁসের ওপর, তার জিম্মায় ডিম রেখে খাবার খুঁজতে যাওয়ার ভান করে। তারাও জেনে গেল আসলে বুড়ো কী ভীষণ অধার্মিক, অসৎ, মিথ্যাচারী, প্রাণঘাতী ও পাপী। তখন সবাই মিলে একসাথে ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলেছিল বুড়ো রাজহাঁসকে।

ছবিঃ শিমুল

suchipotro

কাজুমার প্রতিশোধ (শেষ পর্ব)

মূল সংগ্রহঃ বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ডের 'টেলস অব ওল্ড জাপান'।
বাংলা ভাষান্তরঃ সংহিতা

সংহিতা

বলাবাহুল্য এইভাবে মাতাগোরোর মাথার ওপরের ছাদ আর পায়ের তলার জমি দুইই গেল। তিনি তখন মাকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন সাকুরাই জিউজায়েমন নামে এক বৃদ্ধের। সে বৃদ্ধ নামজাদা গুরু ছিলেন তলোয়ার যুদ্ধের কৌশল শেখানোয়। শুধু তাই নয় তিনি বেশ সম্পত্তিও করেছিলেন এবং সমাজে বেশ মান্যগণ্যও হয়েছিলেন। তাই তিনি মাতাগোরোকে আশ্রয় দিলেন। আর মাতাগোরোর পাহারায় মোতায়েন করলেন তিরিশজন রনিনকে যাঁদের সব্বাই ছিলেন তাগড়া জোয়ান আর সুদক্ষ যোদ্ধা। তাঁরা সব্বাই মিলে গা ঢাকা দিলেন বহুদূরে, সাগারা নামে এক জায়গায়।

এত ঘটনার মধ্যে কাজুমা ওয়াতানবে তাঁর বাবার মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছিলেন কীভাবে তিনি এই হত্যার প্রতিশোধ তুলবেন। তাই যখন হঠাৎ করে মহাপালক কুনাইশোয়ু মারা গেলেন এবং তাঁর পুত্র যুবক রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন, তখন কাজুমা রাজকার্য থেকে ছুটি নিয়ে চললেন তাঁর পিতৃহন্তার খোঁজে। কাজুমার বড় বোনের স্বামী ছিলেন জাপানের শীর্ষস্থানীয় তরবারি যোদ্ধা আরাকি মাতায়েমন। নিহতের জামাতা মানে তিনি নিকটতম আত্মীয়পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং কাজুমার মাত্র ষোল বছর বয়স হওয়ায় আরাকি মাতেয়েমন কাজুমার অভিভাবক হিসেবে মাতাগোরোর সন্ধানে কাজুমার সঙ্গ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে চললেন ইশিডোমে বুসুকে এবং ইকেজোয়ে মাগোহাচি নামে তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর। এঁরা দুজন যে কোনো অবস্থায় তাঁদের প্রভুর সঙ্গ ছাড়তে নারাজ।

আরাকি মাতায়েমন তাঁর অনুচরদের ইচ্ছের কথা শুনে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যে তিনি চলেছেন এক প্রতিশোধের ইচ্ছে এবং যেহেতু এই অভিযানে তাঁর প্রাণ সংশয় নিশ্চিত সেহেতু তিনি মোটেই চান না যে তাঁর অনুচরদের কোনভাবে মৃত্যু কিংবা অঙ্গহানি হোক। অনুচরদের প্রস্তাব তিনি কৃতজ্ঞতাভরে ফিরিয়ে দিলেন। তখন অনুচরেরা বলল, "প্রভু, আপনি বড় নিষ্ঠুর। এত বছর আমরা শুধুই আপনার দয়ার দান আর আশ্রয় নিয়ে জীবনধারণ করে চলেছি। আর আজ যখন আপনি এই খুনীর খোঁজে চলেছেন, তখন দরকার পড়লে আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে আপনাকে রক্ষা করব সেটাই তো স্বাভাবিক। তার ওপর আমরা শুনেছি এই মাতাগোরোর সাঙ্গপাঙ্গ মোট ছত্রিশজন। সুতরাং যতই বীরের মতো আপনি লড়ুন না কেন, শত্রু সংখ্যা অনেক বেশি বলে আপনাদের দুজনের সর্বনাশের সম্ভাবনা বেশি। এরপরেও যদি আপনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে পেট ফুঁড়ে এইখানেই আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ান্তর থাকবে না।"

সাহসী, বীর অনুচরদের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ মাতায়েমন আর কাজুমার চোখে জল এসে গেল। তখন মাতায়েমন বললেন, "তোমাদের দুজনের সাহস আর দয়া অকল্পনীয়। বেশ, তবে চল তোমরা। জেনে রাখ আমি তোমাদের সেবা পেয়ে কৃতজ্ঞ। তাই তোমাদের সেবা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।"

পরমানন্দে দুই অনুচর সঙ্গী হলেন তাঁদের কর্তার। চারজনে মিলে চললেন মাতাগোরোর খোঁজে। মাতাগোরো যে কোথায় থাকে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই তখন।

এর মধ্যে মাতাগোরো বৃদ্ধ সাকুরাই জিউজায়েমন আর তাঁর তিরিশ রনিনের সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল ওসাকাতে। যদিও তাঁদের দলটা বেশ বড় ছিল। তবুও তাঁরা সাংঘাতিক গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কারণ বৃদ্ধের ছোটো ভাই সাকুরাই জিনসুকে একবার এক তলোয়ার দ্বৈরথে মাতায়েমনের কাছে লজ্জাজনকভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে ছিলেন পেশাদার তলোয়ারবাজ। তাই পুরো দলটাই কাজুমার জামাইবাবু মাতায়েমনের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। বিশেষত মাতায়েমন যখন কাজুমার অভিভাবক হয়ে মাতাগোরোকে খুঁজে কাজুমার বাবা ইয়েকুয়ির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার অভিযানে সামিল হয়েছেন, তখন জিউজায়েমনের দলে রনিনের সংখ্যার কোনো গুরুত্বই নেই বলে পুরো দলটার ধারণা। তাই দলটা ভীষণ গোপনীয়তায় ওসাকা পৌঁছে এক সরাইখানার ইকুতামা নামে একটা ঘরে বাসা নিয়ে কাজুমা আর মাতায়েমনের থেকে গা ঢাকা দিল।

কাজুমা আর মাতায়েমন যথা সময়ে ওসাকা পৌঁছোলেন এবং অনায়াসেই তাঁরা মাতাগোরোর খবর জোগাড় করে ফেললেন। এক বিকেলে গোধূলিবেলায় মাতায়েমন যখন শত্রু শিবিরের এলাকায় পায়চারি করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে সম্ভ্রান্ত পরিচারকের মতো জামাকাপড় পরা একটা লোক রান্নাবাড়িতে ছত্রিশজনের জন্য বাজরার মণ্ড রেঁধে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। লোকটাকে কিছুক্ষণ মন দিয়ে দেখার পর মাতায়েমন তাকে চিনতে পারলেন যে লোকটা আসলে সাকুরাই জিউজায়েমনের এক পরিচারক। সেই জন্য তিনি লোকটার খুব কাছাকছি পৌঁছে সে কী বলছে তা আড়াল থেকে শুনতে লাগলেন। মাতায়েমন শুনতে পেলেন যে লোকটা বলছে, "আমার প্রভু জিউজায়েমন কাল খুব ভোরে সাগারা রওয়ানা দেবেন। সেখানের মন্দিরে তিনি পুজো দেবেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে ভগবানের দয়াতেই তিনি অসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেন। তাই আমার এখন দম ফেলারও সময় নেই- " কথাটা পুরো শেষ না করেই সে হাঁটা লাগাল।

তখন মাতায়েমন রান্নাবাড়িতে ঢুকে একটু বাজরার মন্ড খেয়ে দেখলেন। খেতে খেতে তিনি রান্নাবাড়ির মালিকের সাথে একথা সেকথায় একটু আগেই বাজরার মন্ড কিনে নিয়ে যাওয়া লোকটার ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে নিলেন। জানতে পারলেন তাদের দল কোথায় বাসা নিয়েছে। খবরটা মাতায়েমন কাজুমাকে দিতে, রাত পোহালেই প্রতিশোধ চরিতার্থ হবে ভেবে কাজুমার চোখমুখ উত্তেজনায় ঝকঝকিয়ে উঠল। সেই রাতে মাতায়েমন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে চর করে পাঠালেন মাতাগোরোর বাসায় শুধু জানার জন্য যে পরদিন ঠিক কোন সময়ে মাতাগোরো বেরোবেন। চর পান্থশালার কর্মচারীদের থেকে খবর নিয়ে এল যে মাতাগোরোর দল ভোরের আলো ফোটামাত্র সাগারার পথে রওয়ানা দেবে এবং পথে ইসে নামের দেবস্থানে থামবে টেরশো ডাইজিনের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য।

মাতায়েমন সেই অনুসারে পরদিন ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়লেন কাজুমা আর তাঁর অনুচরদের নিয়ে। ইগা প্রদেশের দাইমিও টোডো ইদজুমি নো কামির দুর্গনগরী উয়েনো ছাড়িয়ে এক বিস্তীর্ণ পোড়ো জমি। সেই এলাকাতেই মাতাগোরোকে আক্রমণ করা হবে বলে ঠিক করলেন কাজুমা আর মাতায়েমন। সেখানে পৌঁছোলে পর মাতায়েমন রাস্তার পাশের এক চা দোকানে ঢুকে দাইমিওর দুর্গনগরীর প্রশাসকের এলাকায় তাঁদের প্রতিশোধের লড়াই লড়ার অনুমতি চেয়ে এক আবেদন পত্র লিখে ফেললেন। তারপর তিনি কাজুমাকে বললেন, "যখন আমরা মাতাগোরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তুমি তখন কেবলমাত্র মাতাগোরোর সাথেই লড়বে এবং তোমার পিতৃহন্তাকে হত্যা করবে। তার রক্ষক রনিনদের আমি সামলাব।" তারপর নিজের অনুচরদের দিকে ফিরে বললেন, "কাজুমার কাছাকাছি থাকবে। রনিনরা মাতাগোরোকে বাঁচাতে চাইলে তোমাদের দায়িত্ব তাদেরকে বাধা দেওয়া আর কাজুমাকে রক্ষা করা।" তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার দায়িত্ব সকলকে বারবার বলে দিয়ে মাতায়েমন আর তার দলের লোকেরা চা দোকানেই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। সেই সময়ে মাতায়েমনের খোঁজে উপস্থিত হলেন দাইমিও টোডো ইদজুমি নো কামির দুর্গনগরীর প্রশাসক। তিনি বললেন, "আমিই দাইমিও টোডো ইদজুমি নো কামির দুর্গনগরীর প্রশাসক। আমার প্রভু তাঁর দুর্গ এলাকার মধ্যে আপনার শত্রুকে বধ করার অনুমতি

দিয়েছেন। আপনার কর্তব্যনিষ্ঠা আর বীরত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে একশো পদাতিকের এক শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়েছেন। এঁরা এই চা দোকানকে বাইরে থেকে ঘিরে পাহারা দেবে যাতে আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন যে আপনার শত্রুপক্ষের ছত্রিশজনের একজনও না বেঁচে পালাতে পারে।"

দাইমিও টোডো ইদজুমি নো কামি মাতায়েমনের সহায় হলেন কারণ মাতায়েমন প্রতিশোধ নিতে চাইছেন ইয়েয়াসু পরম্পরা মেনে। সেই পরম্পরাপত্রে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে চলেছেন তিনি তাঁর প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার কারণ আর পরিকল্পনা ফৌজদারি আদালতকে জানাবেন। যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেওয়া হবে না কিন্তু শত্রুনিধনের অভিপ্রায়ে দাঙ্গা করা যাবেনা।" এই পরম্পরাপত্রে আরও বলা হয়েছিল যে, "যে সব লোকে বিজ্ঞপ্তি জারি না করেই প্রতিশোধ নেয় তারা নেকড়ের মতো অজুহাতের গোলাম, তাদের শাস্তি বা ক্ষমা নির্ভর করবে আনুপূর্বিক ঘটনার ওপর।"

মাতায়েমন এবং কাজুমা অনেক ধন্যবাদ দিলেন প্রশাসক ও তাঁর প্রভু দাইমিওকে। প্রশাসক নিজের বাসায় ফিরে গেলেন। অবশেষে দিগন্তে দেখা দিল শত্রুবাহিনী। প্রথমে উদয় হলেন সাকুরাই জিউজায়েমন এবং তাঁর ছোটো ভাই জিনসুকে। তাঁদের ঠিক পরেই ছিলেন কাওয়াই মাতাগোরো এবং তাকেনৌচি জেন্ট্যান। রনিনদের দলটার মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে বীর এই চারজনই। তাঁরা চলেছিলেন মালপত্তর চাপানো ঘোড়ার পিঠে চেপে। বাকি দলটা তাঁদের পাশেপাশে কুচকাওয়াজ করে করে আসছিল।

প্রতিশোধ স্পৃহায় কাজুমা তখন অস্থির যখন মাতাগোরোর দল আরেকটু কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। আর থাকতে না পেরে অমিত সাহসে কাজুমা লাফ দিয়ে পড়লেন দলটার সামনে। আর চীৎকার করে বললেন, "আমি কাজুমা, ইয়েকুয়ির ছেলে। সেই ইয়েকুয়ি যাকে তুই, মাতাগোরো, বিশ্বাসঘাতকের মতো মেরেছিস। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমার বাবার হত্যার শোধ তুলবই।" রনিনদের চমক কাটার আগেই মাতায়েমন ঘোষণা করলেন, "আমি, আরাকে মাতায়েমন, ইয়েকুয়ির জামাই, আমি কাজুমার প্রতিশোধের লড়াইতে তার সঙ্গী। হার- জিত পরের কথা, তোদের এখন আমাদের সাথে লড়াই করতে হবে।"

ছত্রিশ জন রনিন মাতায়েমনের নাম শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন। কিন্তু সাকুরাই জিউজায়েমন প্রত্যেককে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। আর অমনি মাতায়েমন খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জিউজায়েমনের কাঁধ থেকে বুক অবধি চিড়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ জিউজায়েমনের মৃত্যু হলো। চোখের সামনে দাদার হত্যা হতে দেখে সাকুরাই জিনসুকে ক্রোধে অন্ধ হয়ে মাতায়েমনের দিকে একটা তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু মাতায়েমন উড়ন্ত তীরটাকেই তাঁর ছোরা দিয়ে দুটুকরো করে ফেললেন। এতে হকচকিয়ে গিয়ে তীর- ধনুক ফেলে জিনসুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাতায়েমনের উপর। মাতায়েমনের তখন ডান হাতে তলোয়ার আর বাঁ- হাতে ছোরা। প্রাণপণ লড়াই করতে লাগলেন তিনি। বাকি রনিনরা ছুটে এলেন জিনসুকেকে বাঁচাতে। অন্যদিকে কাজুমা মাতাগোরোকে অস্থির করে তুলেছিলেন আক্রমণে আক্রমণে। মাতায়েমন জিনসুকে আর তাঁর উদ্ধারে আসা রনিনদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে কাজুমা আর মাতায়েমনের বোঝাপড়ায় ছেদ পড়ল। তবে তাঁর আদেশ মতো দুই অনুচর বুসুকে আর

মাগোহাচি ততক্ষণে কাজুমার নিরাপত্তায় হত্যা করেছেন আরও পাঁচ রনিনকে। তবে তাঁরাও খুব আহত হয়েছিলেন এই অসম লড়াইতে। এর মধ্যে মাতায়েমন সাত রনিনকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। কাজুমার পক্ষে তিনিই সব থেকে বীর। তাই সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে তিনি আরও তিন রনিনকে নিকেশ করে ফেললেন। ফলে বাকিরা ভয়ে তাঁর দিকেই এল না।

এই সময় উদয় হলেন মাতায়েমনের পুরোন বন্ধু কোনো তোজায়েমন। তিনি দুর্গনগরীর দাইমিওর একজন সামন্ত। তিনি যেই শুনেছেন যে মাতায়েমন তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন অমনি নিজের বর্শা বাগিয়ে ছুটে এসেছেন মাতায়েমনের সঙ্গ নিতে তাঁদের পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে। তিনি বললেন, "মাতায়েমন মশাই, আমি যেই শুনেছি আপনি এই ভয়ানক অভিযানে এসেছেন অমনি আমি চলে এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে।"

তাই শুনে মাতায়েমনের এমন আনন্দ হলো যে তিনি বহুগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের মোকাবিলায়। তখন তাকেনৌচি জেন্ট্যান তাঁর সঙ্গীদের মাতায়েমনের সাথে লড়তে দিয়ে নিজে চললেন মাতাগোরোকে উদ্ধার করতে। ততক্ষণে মাতাগোরোকে বেদম করে ফেলেছেন কাজুমা। কিন্তু তাকেনৌচি জেন্ট্যানকে বাধা দিতে গিয়ে বুসুকে ভীষণ আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী মাগোহাচি ব্যাপার দেখে বুসুকের জন্য চিন্তিত হলেও ভাবছিলেন যে কাজুমার কিছু হলে মাতায়েমনকে কী জবাব দেবেন। তাই তিনি তাকেনৌচি জেন্ট্যানের বাধা হয়ে রইলেন আর মারাত্মক আহত হতে লাগলেন। তাই দেখে দুর্গনগরী থেকে আসা মাতায়েমনের বন্ধু বলে ফেললেন, "মাতায়েমন, দেখুন, আপনার যে সঙ্গী তাকেনৌচি জেন্ট্যানের সাথে লড়ছেন তাঁর ভারি বিপদ। আপনি তাঁকে উদ্ধার করুন, কাজুমাকে রক্ষা করুন, বাকিদের আমি সামলে নিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ মশাই। আমি কাজুমার কাছে যাচ্ছি," বললেন মাতায়েমন। করলেনও তাই। তার সহকারি আর দাইমিওর পদাতিক বাহিনী সামলাতে লাগল বাকি রনিনদের। এমনিতেই তারা মাতায়েমনের সাথে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা আর কোনো ঝক্কি নেওয়ার অবস্থায় ছিল না। এর মধ্যে প্রবল লড়াই চলছিল কাজুমা আর মাতাগোরোর মধ্যে। যুদ্ধের পরিণতি কী হবে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। মাতাগোরোর সাহায্যে আসা তাকেনৌচি জেন্ট্যানকে মাগোহাচি কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে ফেলেছিলেন। যদিও মাগোহাচি আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন আর কপালের ক্ষত থেকে বয়ে চলা রক্তস্রোতে তাঁর দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তবুও মরিয়া লড়াই লড়ছিলেন।

সেই সময় মাতায়েমন এসে বললেন, "মাগোহাচি দারুণ লড়েছো ভাই, আমি এসে গেছি তোমার সাহায্য। তুমি সাংঘাতিক আহত। এবার, ভাই, তুমি বিপদ থেকে সরে একটু বিশ্রাম নাও।" কাজুমার নিরাপত্তা নিয়ে ভয়ানক চিন্তিত মাগোহাচি এতক্ষণ ভীষণ সচেতনভাবে লড়ে যাচ্ছিলেন। এইবার তিনি নিজে ক্ষান্ত দিলেন আর নিজের শরীরের ক্ষতগুলো থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণে অচেতন হয়ে পড়লেন। মাতায়েমন জেন্ট্যানকে পরাস্ত ও নিহত করলেন। যদিও তাঁর শরীরের দু জায়গায় আঘাত লেগেছিল, তবুও তিনি, তখনও, সমান প্রাণবন্ত ছিলেন। তিনি কাজুমার কাছে গিয়ে বললেন, "মনোবল আনো, কাজুমা! সমস্ত রনিনরা নিহত। পড়ে আছে শুধু

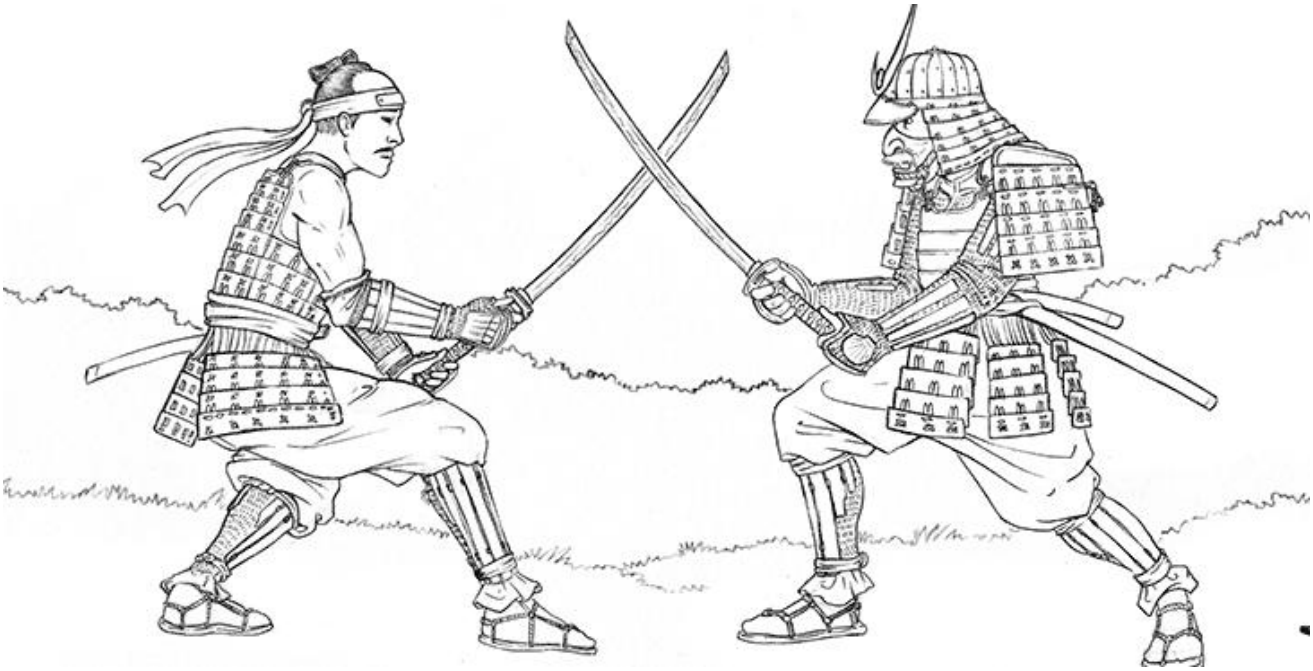

এই মাতাগোরো। লড়ো প্রাণপণে আর জেতো।" এই উৎসাহ পেয়ে কিশোর কাজুমা দ্বিগুণ উদ্যমে লড়তে লাগলেন। মাতাগোরো হতাশ হয়ে পিছু হঠতে হঠতে প্রাণ দিল। কাজুমার প্রতিশোধ পূর্ণ হলো। তার মনস্কামনা চরিতার্থ হলো।

যে দুই অনুচর বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, তাঁদের যথোপচারে সম্মানিত করে সমাধিস্থ করা হলো। কাজুমা মাতাগোরোর মাথা কেটে নিয়ে এসেছিলেন। মাতাগোরোর ছিন্ন শির তাঁর পিতার সমাধিতে যথাবিধি নিবেদন করলেন তিনি।

suchipotro

রাশিয়ান গল্প

বাবা ইয়াগার গল্প

অনুবাদঃ ইন্দ্রশেখর

অনেক কাল আগে এক ছিল বুড়ো আর বুড়ি আর ছিল তাদের এক মেয়ে। বুড়ি মারা গেলে বুড়ো ঘরে আনল এক সৎ মা।

সৎমায়ের মেয়েকে ভারী অপছন্দ। খালি বসে বসে ভাবে কেমন করে মেয়েটাকে তাড়ানো যায় বাড়ি থেকে। একদিন বুড়ো কাজে বেরোতে সৎ মা মেয়েকে ডেকে বলে, "একবার আমার বোনের বাড়িতে যা দেখি। তোর একটা জামা সেলাই করব, তার জন্যে ছুঁচসুতো চেয়ে নিয়ে আয়।" এই বোনটা আসলে ছিল দুষ্টু ডাইনি বাবা ইয়াগা।

ছোট্ট মেয়ের মাথায় কিন্তু বুদ্ধি ছিল অনেক। সে করল কি সৎ মায়ের বোনের কাছে প্রথমে না গিয়ে সটান চলে গেল তার নিজের মাসীর কাছে। গিয়ে বলে, "ও মাসী, সৎ মা আমায় তার বোনের কাছে যেতে বলছে আমার জামা সেলাইয়ের ছুঁচসুতো চাইতে। কী করি বলো তো?"

মাসী বলল, "শোন ভাগ্নী, ওখানে গেলেই একটা বার্চ গাছ তোর মুখে ডালের ঝাপটা মারতে চাইবে। তাকে একটা রিবন উপহার দিস। দরজাগুলো দেখবি ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করবে। তেল নিয়ে যাস তার কবজাতে ঢালবার জন্যে। কুকুরের দল আসবে তোকে ছিঁড়ে খেতে। খানিক মাংস নিয়ে যাস তাদের জন্যে। একটা বেড়াল দেখবি, সেটা নখ দিয়ে তোর চোখ খুবলে নিতে চাইবে। তাকে দিস খানিকটা হ্যাম।"

ছোট্ট মেয়ে তো রওনা হয়ে গেল। হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে অবশেষে মায়ের বোনের বাড়ি

পৌঁছে দেখে তার ভেতরে বাবা ইয়াগা বসে সুতো কাটছে।

"ভালো আছো মাসী?" বলল ছোট্ট মেয়ে।

"ভালো আছি রে ছোট্ট মেয়ে, বল কী চাই।" বাবা ইয়াগা জবাব দিল।

"মা আমায় পাঠাল তোমার কাছ থেকে ছুঁচসুতো চাইতে। আমার জন্যে জামা সেলাই করবে।"

"বেশ বেশ। এখন বসে খানিক সুতো কাট দেখি আগে!"

মেয়ে বসল সুতো কাটতে আর বাবা ইয়াগা বাইরে গিয়ে কাজের মেয়েকে ডেকে বলে, "ওপরে গিয়ে চানের জল গরম কর। চান করে এসে মেয়েটাকে দিয়ে সকালের ভোজ খাব আজ।"

কাজের মেয়ে তো তাই করতে চলে গেল। ওদিকে ছোট্ট মেয়ে তো ভয়েই কাঁটা। কাজের মেয়েকে ডেকে বলে, "ও কাজের মেয়ে ভাই, কাঠে আগুন দিওনা লক্ষ্মীটি। তার বদলে জল ঢেলে দিও আর চালুনিতে করে চানের জল এনো," এই বলে সে কাজের মেয়েকে একখানা সুন্দর রুমাল দিল।

খানিক বাদে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাবা ইয়াগা ছোট্ট মেয়েকে বলে, "কী রে, সেলাই করছিস তো?"

"করছি মাসী," ছোট্ট মেয়ে জবাব দিল।

বাবা ইয়াগা জানালা থেকে সরে যেতেই ছোট্ট মেয়ে করল কি, বেড়ালটাকে খানিক হ্যাম দিল খেতে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে পালাই কেমন করে?"

বেড়াল বলল, "এই নাও একটা গামছা আর একটা চিরুনি। এই নিয়ে এক দৌড়ে পালাও। বাবা ইয়াগা তোমায় তাড়া করবে। তখন মাটিতে কান পেতে তার পায়ের আওয়াজ শুনো। আওয়াজ পেলেই গামছাটা মাটিতে ছুঁড়ে দেবে, ওমনি একটা বিরাট নদী হয়ে যাবে গামছাটা। তারপর মাটিতে কান পেতে যদি শোন সে নদী পেরিয়ে তোমায় তাড়া করে আসছে, তাহলে তক্ষুণি চিরুনিটা ছুঁড়ে মারবে মাটিতে। ওমনি দেখবে গভীর একটা বন হয়ে যাবে জাদু চিরুনি। বাবা ইয়াগা সে জঙ্গল পেরিয়ে যেতে পারবে না।"

ছোট্ট মেয়ে গামছা আর চিরুনি নিয়ে তো পালিয়ে গেল। পালাবার সময় কুকুরগুলো তেড়ে এসেছিল। ছোট্ট মেয়ে ওমনি তাদের সামনে ছুঁড়ে দিল সঙ্গে করে আনা মাংসের টুকরো। কুকুররা তাই পেয়ে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল। দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলতে গেছিল, ছোট্ট মেয়ে তাদের

কবজায় ঢেলে দিল সঙ্গে করে আনা তেল। ওমনি তারা খুশি হয়ে শব্দ না করে খুলে গেল। বার্চ গাছ যেই না এল তার মুখে ঝাপটা মারতে ওমনি সে গাছের ডালে বেঁধে দিল সুন্দর এক রিবন। খুশি হয়ে গাছ কিচ্ছু বলল না তাকে।

এর মধ্যে বেড়াল চরকার ধারে বসে সব সুতো জড়িয়ে মরিয়ে একশা করে রেখেছে। খানিক বাদে বাবা ইয়াগা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যেই জিজ্ঞাসা করল, "কী রে, সেলাই করছিস তো?" অমনি সে নিচু গলায় বলে, "আমি সেলাই করছি মাসী!"

গলা শুনেই বাবা ইয়াগার সন্দেহ হতে এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখে ছোট্ট মেয়ে পালিয়েছে। তখন সে রেগে গিয়ে বেড়ালটাকে ভীষণ মারল প্রথমে। বলে, "চোখ খুবলে নিলি না কেন মেয়েটার?"

বেড়াল বলল, "তোমার কাছে এতদিন যে কাজ করলাম, কিন্তু আমায় একটুকরো হাড্ডিও খেতে দাওনি। ছোট্ট মেয়ে আমায় এই অ্যাত্তোটা হ্যাম খেতে দিয়েছে।"

বাবা ইয়াগা তখন কুকুর, দরজা, কাজের মেয়ে আর বার্চ গাছকে বকতে গেল। বকুনি খেয়ে কুকুর বলল, "এতদিন যে তোমার কাছে কাজ করলাম, একটা পোড়া রুটিও তো কখনো দাওনি আমাদের। ছোট্ট মেয়ে আমাদের তাজা মাংস খাইয়েছে।"

দরজা বলল, "এতদিন যে তোমার কাছে কাজ করলাম, একটা দিন একফোঁটা তেল দিয়েছো আমাদের কবজায়? ছোট্ট মেয়ে আমাদের কবজায় অ্যাত্তো অ্যাত্তো তেল দিয়েছে।"

বার্চ গাছ আর কাজের মেয়ে বলল, "এতদিন যে তোমার কাছে কাজ করলাম, একটা কোন উপহার দিয়েছো আমাদের? ছোট্ট মেয়ে আমাদের কেমন সুন্দর সব উপহার দিয়েছে।"

সেই শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে বাবা ইয়াগা লম্বা লম্বা পায়ে ছুটল ছোট্ট মেয়েকে ধরে আনতে। মাটিতে কান পেতে পায়ের আওয়াজ শুনেই ছোট্ট মেয়ে পথের ওপর ছড়িয়ে দিল সেই গামছা। গামছা অমনি নদী হয়ে বইতে লাগল আর মেয়েও ছুটে পালাল অনেক দূরে। বাবা ইয়াগা করল কি, ঝাঁটায় চেপে উড়তে উড়তে নদী পার হয়ে গিয়ে ফের ছুটল ছোট্ট মেয়ের পেছনে। মাটিতে কান পেতে তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ছোট্ট মেয়ে এইবারে মাটিতে আছড়ে ফেলল সেই চিরুনিটা। অমনি সেখানে গজিয়ে উঠল ঘন একটা জঙ্গল। বাবা ইয়াগার ঝাঁটা সেই জঙ্গলে আটকে গিয়ে সে আর জঙ্গল পেরোতে পারল না।

ছোট্ট মেয়ে তখন ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে দেখে তার বাবা এসে গেছে। বাবা তখন ছোট্ট মেয়েকে অনেক আদর করল আর সৎ মাকে ভীষণ বকে দিল।
তারপর তারা সুখেশান্তিতে থাকতে লাগল।

suchipotro

ভালুক কেন থাবা চোষে?

প্রতিটি জীবজন্তুই তার শীতের খাবার আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে। কাঠবিড়ালি গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখে বাদাম আর ব্যাঙের ছাতা, ইঁদুর টেনে নিয়ে যায় ফসলের দানা তার গর্তে। আর সারা শীতটা চলার মতো যথেষ্ট খাবার পেয়েও যায় তারা। কেবল ভালুকই সারা শীতকাল তার শূন্য গুহায় ঘুমিয়ে কাটায়। দীর্ঘ শীত একটানা ঘুমিয়ে কাটায় সে, আর শোনা যায় সে নাকি খালি নিজের থাবা চুষে সন্তুষ্ট থাকে। এই জন্যেই বসন্তকালে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে যেমন রোগা তেমনই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, আর তার মেজাজও ওঠে তিরিক্ষি হয়ে।

কিন্তু জবুথবু বুড়ো ভালুক কেন নিজের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে রাখে না বলতে পার? সেই গল্পই এখানে তোমাদের বলছেন ভ. সুতেয়েভ। 'সয়ুজমুল্‌তফিল্‌ম' নামে কার্টুন-ছবি তৈরির স্টুডিওর পরিচালক ইউ. প্রিত্‌কোভ ও শিল্পী-প্রযোজক আ. ভোল্‌কভের তত্ত্বাবধানে 'মিশাখুড়ো' নাম দিয়ে এই গল্পটির একটি চিত্ররূপ দেয়া হয়েছে সম্প্রতি। ভোল্‌কভ আমাদের পাঠকদের জন্যে কার্টুন-ছবিগুলিও এঁকেছেন এখানে।

১) একদিন ভালুক 'মিশাখুড়ো' খরগোশকে তার সব্‌জিবাগানে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে ডেকে বললে: 'খরগোশ-ভায়া, বলি করছ কি ওখানে?' 'দেখতেই তো পাচ্ছ মিশাখুড়ো, মাটির তলা থেকে আমি গাজর তুলছি।' 'তা, আমারও তো গাজর খেতে ভালো লাগতে পারে, না কী?' গর্‌গর করে বললে ভালুক। খরগোশ বললে, 'তা তোল-না, যত ইচ্ছে গাজর তুলে নিয়ে যাও।'

২) মিশা টেনে-টেনে গাজর তুলতে শুরু করলে, কিন্তু এ কাজে এতই আনাড়ি ছিল ও যে গাজরগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে যেতে লাগল... সত্যি বলতে কি, একটা গাজর তো ছিটকে গিয়ে সোজা শজারুর কপালে লাগল।

৩) 'কী যাচ্ছেতাই কা'ড করছে দ্যাখো!' রেগে উঠে হিসহিসিয়ে বললে শজারু। ভালুক বললে, 'বড্ড দুঃখিত, ভাই কাঁটামুখো।' তারপর শজারুকে সে শুধোল, 'তা, ভাই, তুমি চললে কোথায়?' 'বনে যাচ্ছি মিশাখুড়ো, ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে।' ভালুক বলল, 'আমারও কিছু ব্যাঙের ছাতা পেলে মন্দ হয় না। শীতের জন্যে তাহলে খানিকটা খাবার জমা করে রাখতে পারি।'

৪) আর যে কথা সেই কাজ! গাজরের কথা বেমালুম ভুলে ভালুক শজারুর সঙ্গে বনের পথ ধরল ব্যাঙের ছাতা তুলতে। শজারু ভালুককে তার ঝাঁপিটা দিয়ে দিল। অবাক হয়ে ভালুক শুধোল, 'তা, ঝাঁপি ছাড়া তুমি ব্যাঙের ছাতা আনবে কী করে?' 'আরে, ঘাবড়াচ্ছ কেন খুড়ো? ঝাঁপি ছাড়াও আমি ব্যাঙের ছাতা বয়ে আনতে পারি,' বলল শজারু।

৫) শজারু বনের মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে ব্যাঙের ছাতা তুলতে লাগল আর সেগুলো তার গায়ের কাঁটায় বিঁধিয়ে রাখতে লাগল। দেখা গেল, সত্যিই শজারুর ঝাঁপির দরকার করে না।

৬) এদিকে জবুথবু আনাড়ি ভালুক করলে কী, ভালোজাতের ব্যাঙের ছাতাগুলো পায়ে মাড়িয়ে দলে-পিষে যতসব বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা তুলে-তুলে রাখতে লাগল তার ঝাঁপিতে। আসলে মিশাখুড়ো ব্যাঙের ছাতার ভালোমন্দ কিছুই বুঝত না — এই হল গিয়ে ব্যাপার। যাই হোক, এমন সময় একটা ফার্-গাছ থেকে কাঠবিড়ালি তাকে ডেকে বললে, 'ও মিশাখুড়ো, তোমার তোলা ওই ব্যাঙের ছাতা কোনো কম্মের নয়, বুঝলে? এর চেয়ে তুমি বরং বাদাম যোগাড় কড় গিয়ে, বাদাম কত ভালো জিনিস তা জানো তো?'

৭) ভালুক ওর কথায় সায় দিয়ে বললে, 'তা যা বলেছিস, বাদাম এর চেয়ে ভালো জিনিস নিশ্চয়ই। পথে যেতে তার সঙ্গে দেখা বেড়ালের। বেড়াল কতগুলো মাছধরা-ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল। ভালুক তাকে শুধোল, 'চললে কোথায় ডোরাকাটা সুন্দরী?' 'মাছ ধরতে চলেছি মিশাখুড়ো। ছানাপোনাদের জন্যে কিছু মাছ ধরা দরকার।' ভালুক বললে, 'আমিও মাছ খুব ভালোবাসি, তাছাড়া শীতের জন্যে কিছু খাবারেরও যোগাড় রাখা দরকার।' 'তাহলে চল, যাওয়া যাক,' বেড়াল বললে, 'আমার কাছে বাড়তি একটা মাছধরা-ছিপও আছে, কোনো অসুবিধে নেই।'

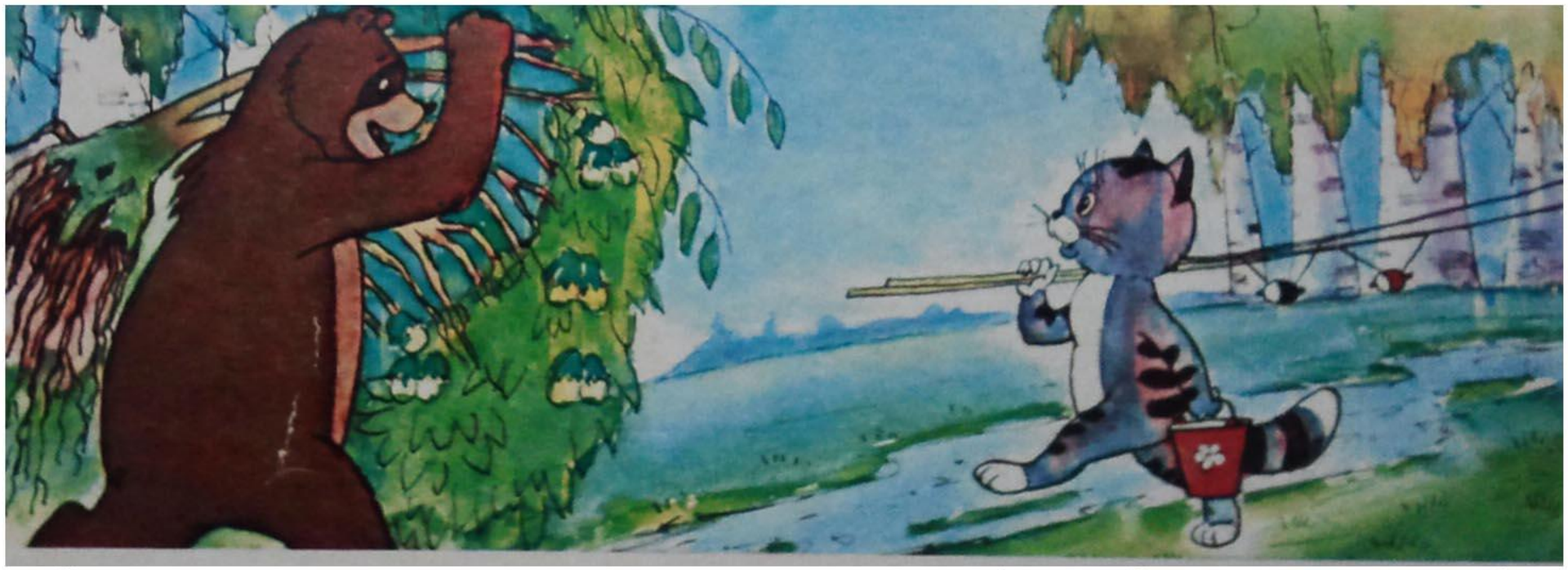

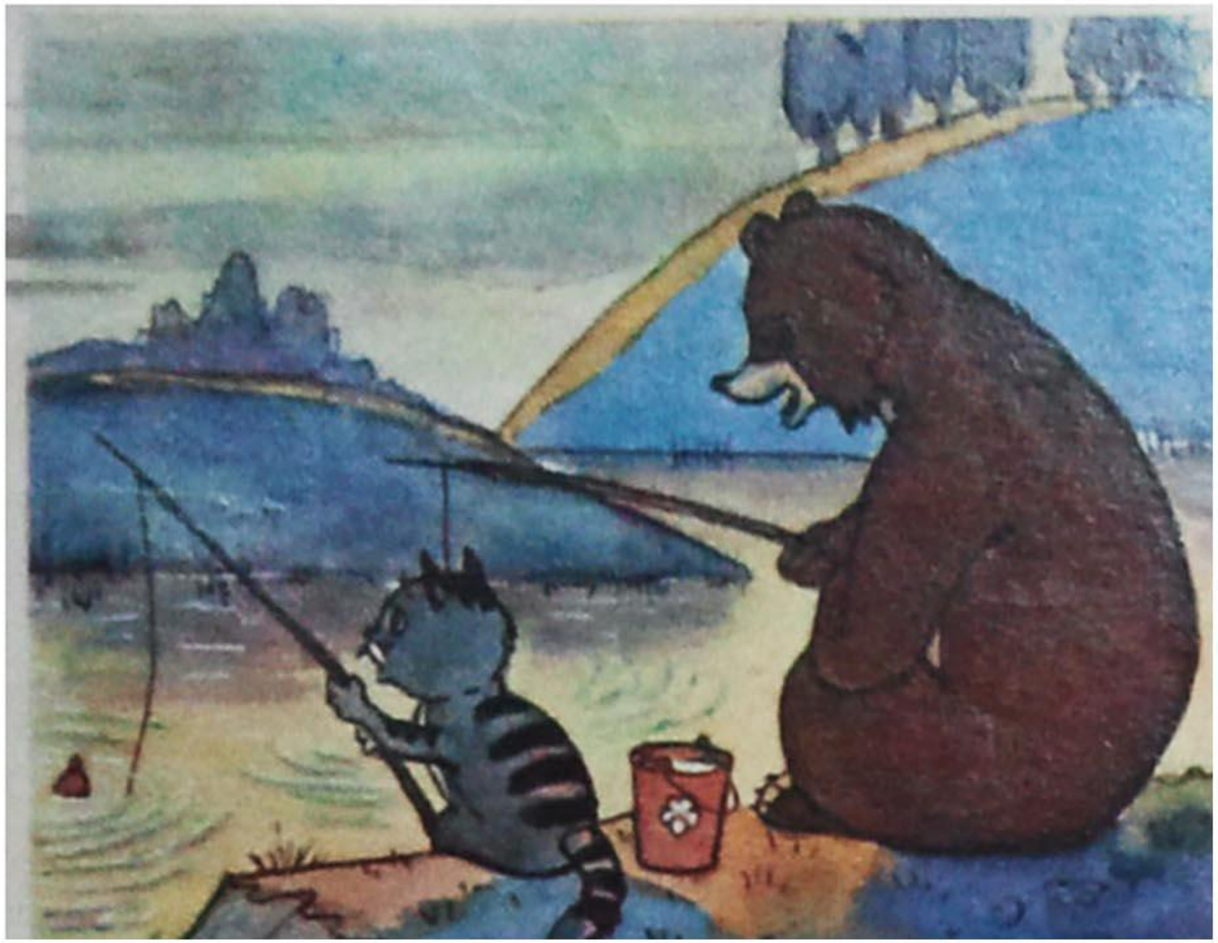

৪) ওরা দু'জন এরপর নদীতে গিয়ে ছিপ ফেললে। আর বেড়ালের চারে দেখতে-দেখতে মাছ পড়ল। এরপর মাছের পর মাছ ধরে চলল বেড়াল। ওদিকে ভালুক তন্দ্রায় ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল আর স্বপ্ন দেখতে লাগল তন্দ্রার ঘোরে। ফলে তার আর মাছ ধরা হল না।

১) আর স্বপ্নের ঘোরে একসময় ভালুকের মনে হল, কে যেন কাছে পিঠে খিলখিল করে হাসছে। তাড়াতাড়ি চোখ মেলে সে দেখে, তার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে শেয়াল। শেয়াল বললে, 'মিশাবুড়ো, তুমি বৃথাই এই ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করছ। বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, আমরা দু'জনে মিলে ক'টা মুরগি ধরি গিয়ে।' শুনে খুশি হয়ে মিশা বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছ। মুরগি পেলে খাসা ব্যাপার হবে।'

১০) যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এল তখন শেয়াল আর ভাল্‌ক চুপিচুপি মুরগির খোঁয়াড়ের কাছে গেল। শেয়াল খোঁয়াড়ের বেড়ার একখানা তক্তা খুলে ফেলে ফিসফিস করে বললে, 'মিশাখুড়ো, তুমি এখানটায় দাঁড়িয়ে পাহারা দাও দিকি, আমি ততক্ষণে কয়েকটা মুর্গি আর হাঁস ধরে নিয়ে আসি।'

১১) কিন্তু ভাল্‌ককে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হল না। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে যমদূতের মতো কয়েকটা কুকুর ছুটে এসে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশাখুড়োর ওপর। ফলে মিশা সাংঘাতিক ঝামেলায় পড়ে গেল! আর সেই অবসরে শেয়াল দিব্যি নিশ্চিন্তে মুরগির খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এল আর মুখে করে বাড়ি নিয়ে গেল একটা আস্ত মুরগি আর তার একটা ছানাকে।

১২) পরদিন সকালবেলায় ভালুক জঙ্গল বেরিয়ে এল... এমন সময় পুঁচকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কী হল তোমার, মিশাখুড়ো?' মিশা জবাব দিলে, 'আমার অপরাধ, শীতের জনো কিছু খাবারদাবার যোগাড় করতে গিয়েছিলাম, এই আর-কি। তা, প্রথমে তুললাম গাজর, কুড়োলাম ব্যাঙের ছাতা, বাদামসুদ্ধ একটা গাছ উপড়ে তুললাম, তারপর গেলাম মাছ ধরতে আর শেষে গেলাম মুরগি ধরতে। আর এমনই আমার কপাল যে কেন যেন কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না।'

১৩) এই জনেই সেবারের শীতে ভালুককে তার গুহায় বসে শুধু নিজের থাবা চুষে যেতে হল। আর এর জনো দায়ী ছিল সে নিজেই, কেননা নিজের মতো না করে অনা লোকের মতো জীবন ধারণের চেষ্টা করলে তার ফল কখনও ভালো হতে পারে না।

suchipotro

গুণদাদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি বই থেকে

(এবারে ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হওনি বা কোন প্রাইজ পাওনি বলে কার কার বাড়িতে বাবা মা খুব বকেছেন? তারা সব্বাই এ লেখাটা তাদের বাবা মাকে যেন পড়িয়ে দেয়।)

একটা নিতান্ত সামান্য ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষ ভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বালিয়া একখানা ছন্দোমালা৩ বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোন- একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে"। তিনি হাসিয়া আমাকে

কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না- হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম, কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে। ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এ- বাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল। কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারিঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন। সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য লাগিয়াছিল। এক দিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর- এক দিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল। বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিষ্ফলতা কেমন করিয়া থাকে। আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম।— এক- একদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য, তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন না; এমন- কি তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে এক- একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতা সম্বন্ধে কী- একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো- একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল ' নিকটে' , ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না অথচ কোনো মতেই তাহার সংগত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে ' শকটে' শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না— কিন্তু মিলের দাবি কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ পর্যন্ত তাহার আর- কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্‌ক্ লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মতো কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা

কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার— বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না; পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম। তাহারই আনন্দ- আঘাতে শিরা- উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলই মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিশি মানুষ ছিলেন তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না।

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত

উমা ভট্টাচার্য

১৮৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর। আগের বছর পয়লা জুন প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। সারা কলকাতায় সে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর,এমনকি সারা এশিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম সংস্কার ভাঙার খবর। মেডিকেল কলেজের সব ফটকগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পাছে এই বিধর্মী কাজ বন্ধ করার জন্য প্রাচীনপন্থীরা কলেজে আক্রমণ চালায়! মেডিকেল কলেজের শব রাখার ঘরে ভিড়,উপস্থিত রয়েছেন মেডিকেল কলেজের সব ইংরেজ অধ্যাপক ডাক্তাররা, সঙ্গী ছাত্রবন্ধুরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরের দরজায়,ঘরের ঝিলমিলের ফাঁকে ফাঁকে চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে অনেকে। সারা ক্যাম্পাস ফাঁকা, সবাই শবঘরের কাছে ভিড় করে এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার গুডিভের সঙ্গে দৃপ্তপদে ঘরে ঢুকলেন একদা সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগের ছাত্র পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। বর্তমানে পণ্ডিত গুপ্ত একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র । ডাক্তারী শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সার্জারি, যা ভারতে এখনও করানো সম্ভব হয়নি, শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া কুসংস্কারের জন্য, সেই কাজটিই আজ করতে এসেছেন পন্ডিত মধুসূদন, হাতে তাঁর একটি শব ব্যবচ্ছেদ করার তীক্ষ্ণ ছুরি। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দলে নাম ছিল উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নবীন চন্দ্র মিত্রের। কিন্তু তাঁরা দরজার বাইরেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘরে ঢুকে মধুসূদন বিনাদ্বিধায় এগিয়ে গেলেন শবের দিকে। শবদেহের নির্ভুল জায়গায় ছুরিটি প্রবেশ করালেন তিনি। মুখে কোনও আড়ষ্টতা বা অস্থিরতার চিহ্ন নেই। খুব নিখুঁতভাবে আর সুন্দরভাবে বিনাদ্বিধায় সম্পন্ন করলেন ব্যবচ্ছেদের কাজ। ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী শুশ্রুতের পরে এই প্রথম হল শবব্যবচ্ছেদ। দীর্ঘকালের কুসংস্কারের আর গোঁড়া পন্ডিতদের বাধানিষেধের বেড়া ভেঙে দিলেন তিনি এই একটি কাজের মাধ্যমে। নিষেধের জগদ্দল ভার সরিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন হুগলী জেলার বৈদ্যবাটি গ্রামের এক বৈদ্য পরিবারের সন্তান। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এই পরিবারের সমাজে খুব নামডাক ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর প্রপিতামহ ‘বকশি’ উপাধি পেয়েছিলেন আর পিতামহ ছিলেন হুগলীর নবাব পরিবারের গৃহচিকিৎসক।তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৮০০ সালে, যে বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় কলিকাতায়। ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত মধুসূদনের প্রথা বিরোধী কাজকর্মেই উৎসাহ ছিল বেশি। প্রথাগত লেখাপড়ায় তাঁর ছিল একান্ত অনীহা। কোনও উচ্চাশা ছিলনা। শোনা যায় লেখাপড়ায় অমনোযোগী কিশোর মধুসূদনকে তাঁর পিতা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

এর পরবর্তী কিছুদিনের কথা বিশেষ জানা যায়না।তাঁকে আবার দেখা গেল ১৮২৬সালে ডিসেম্বরে সংস্কৃত কলেজের সদ্যস্থাপিত বৈদ্যক(আয়ুর্বেদ) বিভাগের ছাত্র হিসাবে।সংস্কৃত কলেজে

ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য ,অলঙ্কার,সাহিত্য পাঠের সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও অসামান্য ব্যুৎপত্তি দেখান তিনি। অসামান্য মেধার অধিকারী মধুসূদন গুপ্ত নিজের পারদর্শিতায় অল্পদিনের মধ্যেই ক্লাসের একজন নামকরা ছাত্র হয়ে উঠলেন।সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদিক ক্লাসের প্রশিক্ষণের সময় তিনি (কাঠ বা মোমের তৈরি) মানুষের হাড়গোড় খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন,কখনও নিজেই ছোট ছোট জীবজন্তু ব্যবচ্ছেদ করে অভিজ্ঞতা ও সাহস সঞ্চয় করেছিলেন।এইসময় কলেজে ইংরেজিতে লেখা ডাক্তারি বই আরবি ও সংস্কৃতে অনুবাদ করে ছাত্রদের বোধগম্য করানো হত।এসব বইই তিনি নিজে থেকে পড়ে ফেলেছিলেন।

তাঁর অভিজ্ঞতার বহর ও পারদর্শিতা কলেজ কর্তৃপক্ষের নজর এড়ায়নি।তাঁর পারদর্শিতার জন্য সংস্কৃত কলেজের এই বিভাগের অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ অসুস্থ হয়ে পড়াতে বৈদ্যক শ্রেণীর কৃতি ছাত্র মধুসূদন গুপ্তকে ১৮৩০ সালের মে মাস থেকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়, ও অধ্যাপকের কাজের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতন নির্ধারিত হয়। সহপাঠী ছাত্র মধুসূদনের অধ্যাপক পদ প্রাপ্তিতে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পাঠদানের দক্ষতায় সেই অসন্তোষ অচিরেই দূর হয়ে যায়। কারণ তাঁর দক্ষতা।

১৮৩২ সালের প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের লাগোয়া একতলা একটি বাড়িতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থানীয়দের চিকিৎসা আর ওষুধপত্র দানের জন্য। সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার জে. গ্রান্ট সাহেব,ও ডাঃ টাইটলার এই নতুন কলেজবাড়িতে এসে ক্লাস নিতেন ও চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষতঃ অ্যানাটমি আর মেডিসিনের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। মধুসূদন নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে সেই বক্তৃতা শুনতেন। ফলে পান্ডিত্যে তিনি সহপাঠীদের থেকে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮৩৫ সালে স্ংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক বিভাগ বন্ধ হয়ে যায় আর ছাত্ররা সব মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসে যোগ দেয়। আর ছাত্র মধুসূদনও ১৮৩৫ সালের ১৭ই মার্চ থেকে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটরের কাজে নিযুক্ত হন ও সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করতে থাকেন।কিন্তু একজন সহপাঠীর কাছে পাঠ নিতে ছাত্ররা আপত্তি করে। তাদের আপত্তির কারণ ছিল মধুসূদন তখনও ডাক্তারী পাশ করেননি, তিনি সামান্য কবিরাজ মাত্র। এই আপত্তি জোরালো হলে কলেজের কাজে অসুবিধা দেখা দেবে, কেননা কবিরাজ হলেও তিনি ডাক্তারি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ। তাই ছাত্রদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষ পাশ করা ডাক্তারের ডিগ্রি নেবার জন্য তাঁকে ডাক্তারী পরীক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে বলেন। তিনি রাজি হয়ে যান ও ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কবিরাজ থেকে ডাক্তারে পরিণত হন।

আসলে ছয় বৎসর সংস্কৃত কলেজে ও ইংরাজির ক্লাস করার আগে থেকেই তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, নিদান দিতে শিখেছিলেন ‘কেবলরাম কবিরাজ’ নামে একজন অভিজ্ঞ দেশীয় কবিরাজের কাছে। সে সময়ে তিনি কবিরাজ গুরুর নির্দেশে গ্রামে গ্রামে রুগী দেখতেও যেতেন। তাছাড়া ইংরেজ শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে শুনেছেন পাঁচবছর ধরে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেষের দুটি বছর তাঁকে সাহেব ডাক্তাররা সহকারী করে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর কাজ ছিল নিজে বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে, দেশীয় ছাত্রদের ইংরেজি শব্দগুলিকে সংস্কৃতে ও বাংলায় তর্জমা করে দিতেন। কেবলরাম কবিরাজের সহযোগী হিসাবে কাজ করার সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরেছেন, আর সেখানকার মানুষের অসুবিধা রোগের কারণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।কলকাতায় বিখ্যাত সার্জন জেমস রেনাল্ড মার্টিন যখন দেশের মানুষদের স্বাস্থ্য আর ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বন্ধ করতে তৎপর হয়েছিলেন এবং কলিকাতার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৩৫ সালে এক সাধারণ মিটিং ডাকেন, আর ‘জেনারেল কমিটি অফ দি ফিভার হসপিটাল

এন্ড মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট”- এর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রথমেই যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মধুসূদন গুপ্তকে তলব করেন ও তাঁর পরামর্শে কমিটির কাজকর্ম শুরু হয়। এই মিটিঙেই তাঁর সকল অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় ও তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। তাঁর পরামর্শ মোতাবেক গড়ে ওঠে ‘হিন্দু ধাত্রী’ কর্মচারীদল গঠনের পরিকল্পনা যাতে বহু হিন্দু মেয়ের কর্মসংস্থান হয়, রাস্তাঘাট পরিষ্কারের নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।(তিনি বিভিন্ন বাজার এলাকার আবর্জনা ভর্তি অবস্থা, ঘনবসতি এলাকার মানুষের নানা অসুবিধার কথা প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছিলেন কমিটির সদস্যদের সামনে)।

তাঁর সকল কার্যকলাপ, জ্ঞান আর পরীক্ষায় চূড়ান্ত সফলতার অভিজ্ঞান হিসাবে ১৮৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ডাক্তারীর চূড়ান্ত পরীক্ষার উত্তরপত্রটির ব্যাপারে এই মর্মে একটি সংশাপত্র দেন যে, “বৈদ্যবাটীর মধুসূদন গুপ্তর উত্তরপত্রটি যত্ন করে পরীক্ষা করে বুঝেছি যে শারীরসংস্থান,শারীরবৃত্ত, রসায়ন ,মেটিরিয়া মেডিকা ইত্যাদিতে তাঁর অসামান্য জ্ঞান আর ঔষধ, শল্যচিকিৎসা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষমতা বিষয়ে তাঁর দক্ষতা সংশয়াতীত।”

মেডিকেল কলেজে একটি হিন্দুস্থানী বিভাগ ছিল। ১৮৪৩-৪৪ সালে এই বিভাগটি ঢেলে সাজানো হয়, ও সেটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয় মধুসূদন গুপ্তকে। এরপরে ১৮৫২ সালে বাংলা বিভাগ খোলা হলে তার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। ১৮৫৬ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি (২২ বছর)মেডিকেল কলেজের এই পদে বহাল ছিলেন।

শুধুমাত্র শিক্ষাদানের কাজ ছাড়াও তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ‘লন্ডন ফার্মাকোপিয়া’ (১৮৪৯ সালে) আর ‘অ্যানাটমি’(১৮৫৩ সালে) নামে বই দুটির ইংরাজি থেকে বাংলা অনুবাদ করা। এই সময়েই ১৮৪৯ সালের ২৭শে জুন তিনি ‘ফার্স্ট ক্লাস সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন’ পদে উন্নীত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ই তিনি হুপারের লেখা “Anat omi st ’s Vade Mecum” নামে বইটির সংস্কৃত অনুবাদ করে ১০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কলিকাতার জনস্বাস্থ্য, পানীয় জলের স্বচ্ছতা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, টিকাকরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি জনসমস্যা বিষয়ে তাঁর বিশেষ নজর ছিল।কমিটিতে সে বিষয়ে তিনি মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছিলেন।

নিজে ছিলেন ডায়াবেটিক রোগী। কিন্তু বারণ না শুনে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও অনবরত শবব্যবচ্ছেদ করতেন অন্যদের একাজে সাহস যোগাতে। জীবাণু সংক্রমণে ডায়াবেটিক সেপ্টিসিমিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৬ সালের ১৫ই নভেম্বর এই মহাপ্রাণের মৃত্যু হয়।

আজ মেডিকেল কলেজ কত উন্নত হয়েছে, দেশ এগিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সার্জারির ইতিহাসের দ্বার খুলে দেওয়ার এই পথপ্রদর্শকের কথা কি সেভাবে মনে রেখেছি আমরা? আজ তাঁর সেই অবদানের সম্মানার্থে এই সামান্য তথ্যটুকু পরিবেশন করলাম জয়ঢাকের পাতায়, হয়ত যারা জানেনা তারা তাঁকে জানবে ,স্মরণ করবে বাংলা মায়ের এই নিঃস্বার্থ সন্তানকে।

suchipotro

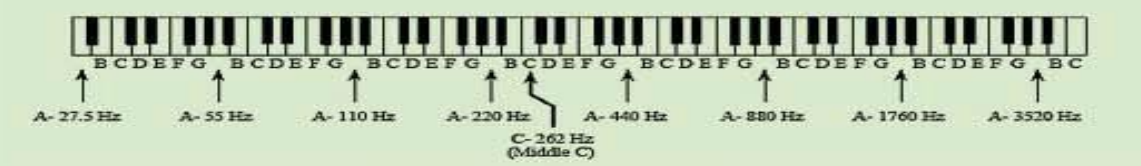

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

শব্দ - সুত্র

Link for soundclips: http://youtu.be/QGBYW_dd73Y
http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug
http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug

আগেরবার পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে' র ' হিন্দুস্হানী সঙ্গীত পদ্ধতি–ক্রমিক পুস্তক মালিকা' থেকে বাহার রাগের কিছু অংশ ব্যবহারিক ভাবে শেখার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এবার ইমন রাগ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করার আগে ভাতখন্ডেজি সম্পর্কে আর একটু জেনে নেওয়া যাক।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাকে বলে ল্যান্ডমার্ক - ভাতখন্ডেজি ছিলেন তাই। এই যুগপুরুষ স্বরলিপিতে রাগসঙ্গীতের রূপরেখা আঁকার আগে অবধি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছিল বলা যায় পুরোপুরি ' গুরু বিনা ক্যয়সে ...' বা পুরোপুরি গুরুমুখী বিদ্যা। অবশ্য স্বরলিপির সাহায্যে রাগের কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা গেলেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গভীরে ঢুকতে হলে গুরুর হাত ধরে যাওয়ার মত আর কোন সহজ রাস্তা এখনও নেই। এর মূল কারণই হল ভারতীয় সঙ্গীতে শ্রুতির ব্যবহার। আমরা এর আগে কয়েকবারই শ্রুতি নিয়ে অল্পস্বল্প আলোচনা করেছি। বাণিজ্যিক পৃথিবীতে মূলত এখন বারোটি অনড় স্বর দিয়ে সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনা চলছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সঠিকভাবে অনুশীলন ও পরিবেশন করতে মাত্র ঐ কয়টি স্বর মোটেই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র শুদ্ধ, কোমল ও কড়ি স্বর তো নয় - ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রয়োজন অনুকোমল, অতিকোমল ইত্যাদি নিয়ে অন্ততঃ বাইশটি স্বর। যদিও আসলে ঠিক ডিজিট্যালি বলার মত নির্দিষ্ট করে শ্রুতির সংখ্যা বা স্বরস্হান বলা সম্ভব নয় - কেন নয় সেটা তোমরা যারা এই সঙ্গীতের আত্মার খোঁজ করবে তারা বুঝতে পারবে সাধনার মধ্য দিয়ে - বুঝতে পারবে কেন বলা হয় ঈশ্বর উপলব্ধির বা নিজেকে জানার, এই প্রকৃতিকে জানার, বোঝার প্রধান পথ সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের সাথে কানে মাকড়ি, ঝাঁকড়া চুল, তাপ্পি দেওয়া দামি জামা গায়ে ড্রাম সিন্থ সহযোগে কয়েকশো ডেসিবেল 'আওয়াজ খানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা' করার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।

আজ থেকে ১০৭ বছর আগে সেই সময়টায় - এ দেশে যখন লর্ড কার্জনের আমলে সবে দু বছর হয়েছে বাংলা ভাগ হয়েছে প্রথমবার পুব- পশ্চিমে, শুরু হয়েছে তীব্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ওদিকে ইউরোপে পাবলো পিকাসো আরও কয়েরজনের সাথে সুচনা করছেন যুগান্তকারী শিল্প- বিপ্লব - কিউবিজম(বিমূর্ত ত্রিমাত্রিকতা)- এর, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী একজন মারাঠি যুবক এই কলকাতায় বসে বাংলা শিখছেন, আলোচনা করছেন সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাথে। বাংলা শিখছেন শুধুমাত্র সঙ্গীত গুণী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ' গীতসুত্রসার' বইটি পড়বেন বলে। এই নির্লজ্জ লক্লকে লোভাতুর সময়ে দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে এই ধরণের পরিশ্রম, এখনকার মানুষজনের কাছে নির্ভেজাল বোকামি মনে হতে পারে। মাত্র ৪৪ বছর বয়সেই ভাতখন্ডেজি' র ঘোরা হয়ে গেছে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ। সময়টা তখন এমন যখন বিভিন্ন ওস্তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের ফলে একই রাগের নানারকম চেহারায় গোটা রাগ সঙ্গীতের বিষয়টাই কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে উঠেছে। এই মানুষটি অক্লান্ত চেষ্টায় নানা গুণীদের একসাথে বসিয়ে, আলাপ আলোচনা করে একটা কাঠামো বা ঠাট তৈরি করলেন যাতে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা এই অমূল্য সম্পদ কিছুটা উদ্ধার হয়। এই কাজটার গুরুত্ব বিশ্বখ্যাত জীব- বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়স এর বাইনোমিয়াল্ নোমেনক্লেচার বা দ্বিপদ- নামকরণ (বর্গীকরণ) পদ্ধতি প্রচলনের মতই গুরুত্বপূর্ণ বললে বোধহয় বেশি বলা হবে না। ঠাট নিয়ে কিছু কথা আমরা আগে জেনেছি, আবারও সময় সুযোগ মত জেনে নেব।

আর কোনো রাগকে এই ইমন রাগটির মত এত বিভিন্নভাবে নানা ধরণের জনপ্রিয় সঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়নি। অসংখ্য এই ধরণের গানের থেকে আমরা ইমন রাগ ভিত্তিক কয়েকটি জনপ্রিয় গান আগে শুনে নেব - তাহলে সুরের চলনটা মনে রাখতেও সুবিধে হবে। এইসব গানের ইউ- টিউব লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হল।

(১)মধুর মধুর ধ্বণি বাজে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)*http://www.youtube.com/watch?v=0LhvgWlanw8*
(২) চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে (") *http://www.youtube.com/watch?v=VKLfGoenNN4*
(৩) দিল যো না কহ সকা - ভিগি রাত *http://www.youtube.com/watch?v=AEcTjxPyFSE*
(৪) ইনহি লোগোনে - পকীজা *http://www.youtube.com/watch?v=lEm7GwR3hvM*
(৫) আঁশু ভরি হ্যয় ইয়ে জীবন কি রাহে - পরভরিশ *https://www.youtube.com/watch?v=ETYfiRPLRDs*

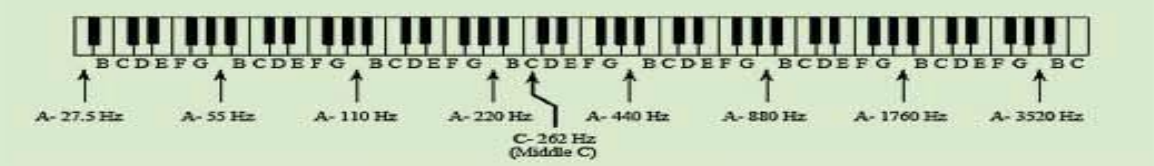

শব্দ - সুত্র

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

Link for soundclips: http://youtu.be/QGBYW_dd73Y

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug এবার কিছু দক্ষ গায়ক- বাদকের ইমন রাগের যাদু শুনব এই লিঙ্ক গুলোতে-

(১) সুলতান খান- সারেঙ্গী - সাথে তবলায় ওস্তাদ জাকির হোসেন

http://www.youtube.com/watch?v=pUYyw5YuD1k

(২) ভীমসেন যোশী - সাম(শ্যাম) বাজায়ে আজ মুরলীয়া

http://www.mp3s.pl/mp3/Pt._Bhimsen_Joshi/Shyam_Bajaye_Aaj_Muraliya/5505689

ইমন বা য়মনকে অনেক সময় কল্যাণ- ও বলা হয়ে থাকে। আসলে যখন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকি এই দুইটি এখনকার মত প্রায় সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে যায় নি, তখনকার কল্যাণ রাগই এখনকার ইমন রাগ এরকম অনেকে মনে করেন। দ্বাদশ(১২শ) শতাব্দীতে রচিত ‘সঙ্গীত রত্নাকর’ বই- এ ২৬৪টি রাগের মধ্যে কিন্তু কল্যাণ রাগটি ছিল না। অনুমান করা হয় ১৫শ শতাব্দী নাগাদ কল্যাণ রাগ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাগদুটির মধ্যে মূল তফাত এই যে কল্যাণ রাগে আরোহণে সা ও পা ব্যবহার হয়, কিন্তু ইমনে হয় না। কল্যাণ রাগের আরোহণে স, র, গ, ক্ষ(কড়ি মা বা তীব্র মা), প, ধ, ন, র্স ব্যবহার হয়, আর ইমন এ - ন্‌, র, গ, ক্ষ, ধ, ন, র্স। আবার ইমন- কল্যাণ নামে যে রাগটি পরিচিত, তাতে দুটি মধ্যম(ক্ষ ও ম)ই ব্যবহার হয়। এই কারণে ইমন রাগে গান্ধার (গা) স্বরটি আন্দোলিত করা হয় না - কেননা তাহলে শুদ্ধ মধ্যম (মা) স্বরের ছোঁয়া এসে যেতে পারে।

অনেকে বলেন ইমন রাগটি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সভাগায়ক আমীর খুসরৌ ১৩শ শতকে সৃষ্টি করেন হিন্দোল ও নওরোজ রাগের মিশ্রণে, আবার অনেকে এ কথা মানেন না সঠিক প্রমাণের অভাবে। অবশ্য পুন্ডরিক ভিট্টল ১৫শ শতাব্দীতে তাঁর রাগ- মঞ্জরী বইয়ে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে পারসিক রাগের প্রভাব বা অনুপ্রবেশের কথা বলতে গিয়ে ইমন রাগটিকে ' পরাদা' অর্থাৎ অন্য কারো উপহার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কল্যাণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ মঙ্গল, সুখ, পবিত্র, সৌভাগ্য, সুন্দর, কৃতি, প্রসন্ন শুভলক্ষণ ইত্যাদি। ইমন নামটির উৎপত্তি নিয়ে নানারকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন য়মন বা ইমন নামটি য়বন বা যবন শব্দ থেকে এসেছে। যবন কথাটি প্রাচীন ভারতে অভারতীয় বোঝাতে ব্যবহৃত হত -প্রথমতঃ গ্রিকদের আর তারপর আক্রমণকারী মোগলদের সম্পর্কে। কেউ আবার মনে করেন য়মন নামটি সরাসরি ইয়েমেন দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মজার কথা, দক্ষিণ- পশ্চিম আরবে সে দেশের সবচেয়ে উর্বর অংশের নাম আল্‌- ইয়ামন। আবার কাবা(মক্কায়)' র দক্ষিণ কোণে যে স্তম্ভটি প্রত্যেক তীর্থযাত্রী ছুঁয়ে আসেন গভীর ধর্মানুরাগে সেই স্তম্ভটির নাম ইয়ামন।

এবারের মত শেষ করার আগে ইমন রাগের ওপর চোখের আলোয় দেখেছিলেম গানটির প্রথম অংশের স্বরলিপি দেওয়া হল। পাতার ওপরের কোনে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে তাতে লেখায় ব্যবহৃত কিছু কিছু উদাহরণ শোনা যাবে।

উল্লেখ করা উদাহরণগুলোর মধ্যে একটা গান আছে যেটি ইমন রাগে আধারিত নয় - দেখব তোমাদের কারো কানে সেটা ধরা পড়ে কি না।

দীন মহম্মদ

ভারত ভ্রমণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য

অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ৫

বন্ধু আর অন্যান্য অফিসারদের সাহচর্য ও ভরসা পেয়ে আমি খুবই তৃপ্ত ছিলাম। পাশাপাশি সৈন্যবাহিনীর নানান কসরৎ পালনও করতাম। দেনাপুরে আমরা আটমাস মতো থাকার পর কর্নেল মরগ্যান গোপন সূত্রে খবর পেলেন মারাঠা হানাদারির। তিনি সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুতি নিতে বললেন যাতে বলামাত্র কর্মনাশার দিকে সৈন্যবাহিনী এগোতে পারে। মালটানার গাড়িগুলো সাথে সাথেই বাইরে আনা হল, আর সেইসাথে বাহক পশুগুলোকেও অভিযানের জন্য তৈরি করা চলতে লাগল। কোয়ার্টার মাস্টাররা যাত্রার প্রস্তুতির যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। কিছু মালপত্র আগেই জলপথে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বলদে টানা গাড়ি আর ওয়াগনে করে পাঠানো হল বাকি জিনিসপত্র। কোয়ার্টার মাস্টার মিস্টার বেকার আর তার সহযোগী অফিসারেরা এক সারিতে পরপর তাদের যার যার এক কোম্পানি করে সেপাই নিয়ে তৈরি হলেন। এছাড়া সাতশো মতো সহকারী, যাদের প্রয়োজনমতো দেশীয় লোকদের মধ্য থেকেই অস্থায়ী নিয়োগ করা হত। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উপজাতীয়, নিজের নিজের বৃত্তি অনুযায়ী সমাজের নীচুতলার লোক। সৈন্যবাহিনী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় তাঁবু খাটানো ছাড়াও এদের নানান কাজকর্ম থাকত। পুরো বাহিনীর সঙ্গে এরকম সহায়ক লোকেদের সংখ্যাটা শুরুতে যথেষ্টই থাকত। ক্রমশ এগোতে শুরু করার সাথে সাথে এই লোকেদের সংখ্যা বেড়ে চলত। এদের মধ্যে লশকর, কুলি, ভিস্তি চারওয়ালা উল্লেখযোগ্য। মূল সৈন্যবাহিনী যাত্রা শুরু করার একদিন আগে এরা রওনা হয়ে যেত। সঙ্গে থাকত মুচি, ছুতোর, কামার, পাল তৈরির কারিগর, প্রভৃতি নানান ব্যবসায়ী লোকজন। এরা ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করত। চারটে দপ্তরে ভাগ ভাগ করে গোটা কাজটা করা হত যাতে ক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে যাবার মতো বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কাজটা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। প্রত্যেক বিভাগকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া থাকত। লশকরদের নেওয়া হত তাঁবু খাটানো, সামিয়ানা টাঙানো, হাতি, বলদ উটের পিঠে বা ওয়াগন থেকে মালপত্র ওঠানো নামানোর কাজে । তাদের পরনে থাকত নীল জামা, পাগড়ি আর পাজামা। কুলিরা দুদলে ভাগ হয়ে দুরকম কাজ করত। একদল মোট বইত, অন্য দল সৈন্যবাহিনীর সামনে রাস্তা তৈরি করতে করতে এগোত যাতে পেছনের সৈন্যদল বা মালপত্র যাবার বাধা না থাকে। ভিস্তিদের কাজ ছিল জল সরবরাহ করা আর চারওয়ালাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ঘরবাড়ি পরিষ্কারের বা অন্যান্য ফাইফরমাশের কাজ।

১৭৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। একদিন খুব ভোর ভোর এইসব বন্দোবস্ত নিয়ে আমরা দেনাপুর থেকে সারি সারি রওনা হলাম। সারাদিন মিঠে বাতাস ছিল, ভালোই লাগছিল। গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরা। রাস্তাও ছায়াঢাকা আর আশপাশের দৃশ্যও চমৎকার। চওড়া মসৃণ রাস্তা, কিছু দূর

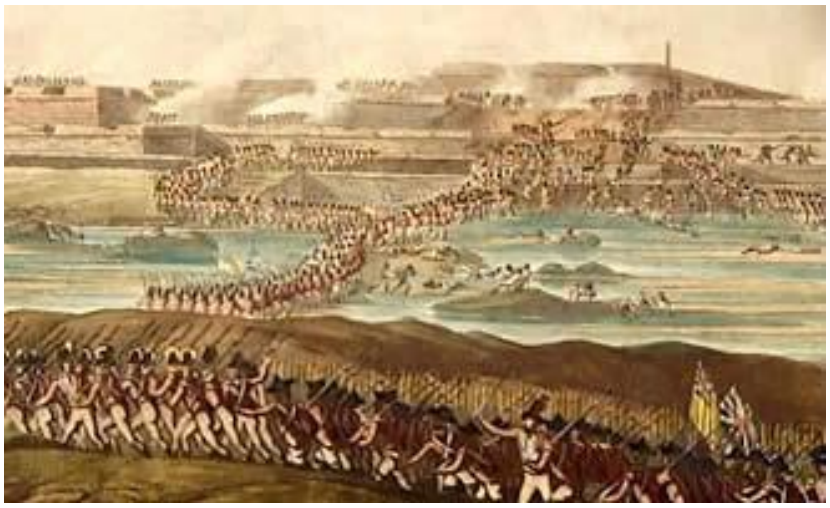

পর পর পানীয় জলের কুয়ো। শ্রান্ত পথিকেরা যাতে সহজেই তেষ্টা মেটাতে পারে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফুলওয়ারি পৌঁছলাম। চ্যাটালো সমতল জায়গা। কোয়ার্টার মাস্টাররা লশকরদের ওইখানে তাঁবু আর সামিয়ানা খাটানোর হুকুম দিলেন।

আমাদের সৈন্যদলের শিবিরের উপস্থিতি একটা রাজকীয় ব্যাপার। লম্বায় প্রায় দু কিলোমিটার, নটা ভাগে ভাগ করা শিবির। দুই ব্যাটেলিয়ান ইউরোপিয়ান, ছয় রেজিমেন্ট সেপাই, আর এক কম্পানি ইউরোপিয় গোলন্দাজ। সামনের সারিতে রেজিমেন্টের পরিচয়জ্ঞাপক শিবির ও পতাকা। এর মধ্যে ছোটো ছোট কয়েকটা বেলটন, বেল টেন্ট থাকত, যার মধ্যে বন্দুক রাখা হত। মাঝখানেরগুলো ইয়োরোপিয়ানদের, তাদের কাছাকাছিই গোলন্দাজরা আর দু পাশে সেপাইদের তাঁবু। বেলটন তাঁবুর পিছনেই যার যার রেজিমেন্টের সৈন্যদলের একাধিক তাঁবু। একদম কাছাকাছি ব্যক্তিগত তাঁবু, কুড়ি হাত মতো দূরত্বে অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং বিলাসবহুল তাঁবুতে লেফটেন্যান্টরা। তাতে যার যার নিশান লাগানো। তারপর ক্যাপ্টেনের ছাউনি, আরও একটু পিছিয়ে মেজরদের। দুই ব্যাটেলিয়ানের পেছনদিকে মাঝামাঝি অবস্থানে খানিকটা তফাতে কর্নেলের তাঁবু। সেটা একদম কোণাকুণি, রক্ষীদের ঠিক উল্টোদিকে। একেবারে সামনে, সামনের সারির মাঝামাঝি রক্ষীদের অবস্থান। কর্নেলের ছাউনির শেষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ওটাই শিবিরের সমাপ্তি রেখা। কোয়ার্টার মাস্টার, অ্যাডজুট্যান্ট, ডাক্তার, শল্যবিদ, এরা এইখানে থাকতেন। সমাপ্তিরেখা আর বাজারের মধ্যে থাকত গবাদিপশু। প্রত্যেক ইয়োরোপিয়ান কম্পানিতে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা থাকত ছটা তাঁবু আর একটা বেলটন তাঁবু নিয়ে। এনসাইন, লেফটান্যান্ট আর ক্যাপ্টেনদের প্রত্যেকের একটা করে তাঁবু। এঁদের সঙ্গে এঁদের স্ত্রীরা থাকতেন বলে আরেকটা করে তাঁবু তারা নিজের খরচে লাগাতেন। মেজরদের দুটো করে ছাউনি,একটা ভাঁড়ার আরেকটা রক্ষীর আর তার সাথে একটা বেলটন। কর্নেলদের তিনটে। দুটো ভাঁড়ার, দুটো রক্ষীর আর একটা বেলটন। কোয়ার্টারমাস্টার, অ্যাডজুট্যান্ট, ডাক্তার, শল্যবিদ এদের প্রত্যেকের একটা করে ছাউনি। ক্যাম্পের নানান দায় দায়িত্ব তাদের হাতে থাকার জন্য কোয়ার্টার মাস্টারদের নিজের তাঁবু ছাড়াও তার সাকরেদ, কারিগর আর ভাঁড়ারের জন্য আলাদা করে তাঁবু

ছিল। বাকি সেপাইদেরও তাদের বেলটনের পেছনেই থাকার ব্যবস্থা ছিল। ইয়োরোপিয়দের তাঁবুর মতোই, তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁবুগুলি পাতা থাকত। হাসপাতালটা ক্যাম্পের অদূরেই ভারি মনোরম পরিবেশে গড়ে তোলা হল। তার আধ কিলোমিটারের মধ্যেই গোলাবারুদ আর সেনাবাহিনীর যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডার। খানিকটা দূরে ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে ফাঁকা অংশে জে.নারেলদের ছাউনি, সেনাবাহিনীর যাবতীয় সৌন্দর্য যেন ওখানেই। প্রত্যেক বিভাগের জন্য ক্যাম্পের অদূরে আলাদা আলাদা বাজার। সেগুলির পাশে পাশে পতাকা ও রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা। এই সমস্ত কর্মকান্ড, সেনাদের থাকার ব্যবস্থা, রসদ ভান্ডার ক্যাম্পের সবকিছুই, আমরা পৌঁছনোর পর সন্ধের মধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেল। ফুলওয়ারি, বাঁকিপুর থেকে স্রেফ বারো কিলোমিটার দূর।

suchipotro

।১৫।

আমরা উঠে জানালার ধারে গিয়ে দেখি বিরাট হল্লা জমেছে বাইরে। চারমিনার চত্বরে কয়েকশো লোক হাতিয়ারবন্দ হয়ে একটা পাঞ্জা বয়ে নিয়ে চলেছে। বাঁশের আগায় বেঁধে উঁচিয়ে ধরা অগুন্তি মশালের আলোয় তাদের হাতিয়ার ঝকমক করছে। সোনালি-রুপোলি জরিতে মোড়া বড় বড় ঝালর দেয়া নিশান দোলাচ্ছে অনেকে, আর সেই মিছিলের মধ্যে মশালের হলদেটে আলোয় আপাদমস্তক আলোকিত হয়ে জেগে রয়েছে অতিকায় চারমিনার।

মিছিল সে চত্বর ছেড়ে সরে যেতে চারমিনার ফের অন্ধকারে ডুবে গেল। তারপর অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে আস্তে আস্তে আবার তাকে আবছা দেখতে পেলাম। তার বিরাট সাদা শরীরটা কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। খানিক বাদে আবার একটা মিছিল এল, আবার ঝলসে উঠল চারমিনার, এইভাবে বারংবার আলো-আঁধারিতে মিলে খেলা করতে থাকল সেই প্রাচীন সৌধকে নিয়ে।

জিনত কখন যেন চলে গিয়েছিল আমাদের রেখে। আমি আর জোরা বসে বসে বাইরের সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখছিলাম। সময় যেন ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জোরা চিৎকার করে উঠল, "দেখো দেখো, কত লোক জড়ো হয়েছে নীচে! মশাল ধরাচ্ছে সব। এইবারে নাল সাহিবের মিছিল বের হবে।"

নিচের রাস্তায় অন্ধকারে যে এত লোক জড়ো হয়ে গেছে তা ঠাহর হয় নি আমার। এইবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, একে একে জ্বলে ওঠা মশালের আলোয় রাস্তা জুড়ে যতদূর চোখ যায় ঠাসাঠাসি ভিড়। এতক্ষণ যত মিছিল দেখেছি তারা সব একে একে এইখানে এসে একত্র হয়েছে। হাজার হাজার মশাল জ্বলছে, জরির ঝালর দেয়া লাখো আফতাব গির, নিশান, পতাকায় গোটা জায়গাটা ছয়লাপ। সেই ভিড়ের মধ্যে শয়ে শয়ে সুসজ্জিত হাতি তাদের পিঠের হাওদায় তাদের মালিকদের নিয়ে এদিক ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এদের মধ্যে একটা হাতি বিশেষ করে আমার নজর টানছিল। তার পিঠে রুপোর হাওদায় চারটে বাচ্চা ছেলে। সঙ্গে বেশ কিছু রক্ষী দেখে বোঝা যাচ্ছিল তারা কোন ধনী মানুষের ছেলে হবে। হাতিটা কিন্তু অন্য হাতিদের মত অত শান্ত ছিল না। সম্ভবত অত ভিড়ভাট্টা আর আগুন দেখে সে একটু ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে। তার আচার আচরণে

মনে হচ্ছিল সে একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য মাহুত বারে বারে তার মাথায় অংকুশ দিয়ে জোরে জোরে মারছিল। অংকুশের ঘা খেয়ে শুঁড় তুলে আর্তনাদ করে উঠছিলো হাতিটা। তার আশেপাশের লোকজন দেখি মাহুতকে শলাপরামর্শও দিচ্ছে বারবার।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হঠাৎ বাঁশের আগায় বাঁধা একটা মশালের জ্বলন্ত টুকরো এসে পড়ল হাতিটার গায়ে। অমনি শুঁড় তুলে একটা হাঁকার ছেড়ে সে ছুট মারল লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। তারপর অমন ভীষণ ভিড় থেকে বের হতে না পেরে সামনে দাঁড়ানো একটা লোককে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় মেরে ফেলে তাকে দাঁত দিয়ে গুঁতিয়ে পিষে ফেলল একেবারে। রক্ষীর দল তাড়াতাড়ি ছুটে এসে এরপর হাতিটাকে তাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার সে হয়ে গেছে। মৃতদেহটাকে একটা দোকানঘরে তুলে দেয়া হোল। তারপর আবার ফের সব চুপচাপ।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে একটা গর্জন উঠল, " হাসা-ন, হোসে-ন, দী-ন, দী-ন।" অমনি অসংখ্য নাগারা বেজে উঠল। তারপর হাজারটা গন্ধকের মশালের নীলচে আলোয় ধুয়ে বের হয়ে এল নাল সাহিবের তাজিয়া। সেই আলোয় চারমিনারের সাদা মিনারগুলোকে রুপোর মত দেখাচ্ছিল। চারপাশে বাজি পোড়ানো শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। তাদের উজ্জ্বল আলোয় অসংখ্য মশালের আলোও ম্লান হয়ে গেছে।

রাস্তা জুড়ে যতদূর চোখ যায় ঠাসাঠাসি ভিড়

হঠাৎ চারমিনারের মাথা থেকে একসঙ্গে অসংখ্য হাউই আগুন ছড়িয়ে ছুটে গেল আকাশের দিকে। তারপর একসঙ্গে ফেটে গিয়ে উজ্জ্বল নীল আগুনের বৃষ্টি নেমে আসতে লাগল নিচের দিকে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আবার জনতার মধ্যে থেকে জিগির উঠল হাসানহোসেনের নামে, তারপর সেই বিরাট মিছিল চারমিনারের দিকে মুখ করে নড়তে শুরু করল।

প্রথমে আস্তে আস্তে শুরু

করে তারপর মিছিলের গতি বেড়ে উঠল। নানা দেশের নানা পোশাকের মানুষ জিগির দিতে দিতে চলেছে দলে দলে, শহীদদের জয়গাথা গাইতে গাইতে চলেছে ফকিরের দল, কোথাও বা আবার কেউ চলেছে সারা গায়ে রঙ মেখে, কেউ গায়ে নানান জাতের ঘন্টা বেঁধে নাচতে নাচতে চলেছে। বাঘ, সিংহ, ভালুক সাজা লোকজনেরও অভাব নেই। কখনো কখনো হাতির পিঠ থেকে কোন রইস নিচের দিকে মুঠো মুঠো কড়ি ছড়িয়ে দিয়ে কাড়াকাড়ির মজা দেখছে, বাতাসে গাদা বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে, যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে চলেছে আরবের দল।

সবার পেছনে আসছিল সোনার সিংহাসনে বসানো নাল সাহেবের তাজিয়া। তার ওপরের রুপোর ছাতা মশালের আলোয় ঝলমল করছিলো। তার আগে আগে মন্ত্রপাঠ করতে করতে মোল্লারা চলেছেন। সিংহাসনের ওপরে ময়ূরপাখার চামর দুলছে, সামনে ধুপের ধোঁয়ায় অন্ধকার, কাছাকাছি লোকজন সিংহাসনের দিকে লক্ষ্য করে আবির উড়িয়ে দিচ্ছিল।

বেশ কয়েকঘন্টা লেগেছিল পুরো মিছিলটা চলে যেতে। তারপর ফের অন্ধকার নেমে এল রাস্তায়। শুধু কোন পিছিয়ে পড়া একলা ফকিরের ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল একবার। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে সে মিছিলের নাগাল ধরবার জন্য। কয়েকজন ভবঘুরে মানুষ নির্জন রাস্তার মাঝখানে একটা গর্তে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে তাকে ঘিরে নাচছিল। ভোর হয়ে এসেছে তখন প্রায়। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল।

সেই ছিল জোরার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বড় আনন্দে কেটেছিল আমার সে দিনটা। একটা স্বপ্নের মত মনে হয় এখন। দীর্ঘ অপরাধজীবনের এপারে বসে আজো সেই স্মৃতি মাঝে মাঝেই এসে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। এখনো আমি চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই, সকালবেলা চলে আসবার সময়, আমায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলে তার সেই কাকুতিমিনতি; আমার চলে যাবার পথের দিকে তার চোখের সেই দুঃখে ভরা চাউনি। এরপর শত অপরাধে মনটা আমার পাথর হয়ে গেছে। হাজারো মানুষকে ঠকিয়েছি, দুনিয়াকে আমার শত্রু বানিয়েছি। তবু তারই মধ্যে জোরার সেই ছবিগুলো আমার প্রাণকে বড় আরাম দেয় সাহেব, কারণ সে সম্ভবত একমাত্র মানুষ ছিল যাকে আমি ঠকাই নি। আমি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আমরা একে একে অন্যকে ভালোবেসেছিলাম, একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম- - -

থাক সে কথা। আসুন আমার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুরু করি আবার। ঘাঁটিতে ফিরে এসে দেখি মোহনদাস অন্য একজন সাহুকারকে নিয়ে বাবার কাছে এসেছে। সে সাহুকার আবার এক বড়লোকবাড়ির জন্য আমাদের সব জিনিসই একসঙ্গে কিনে নিতে চায়। দরদাম ঠিক করবার আগে সে জিনিসপত্রগুলো একবার দেখে নিতে এসেছে। সব কাপড়চোপড় আর দামি পাথরটাথর ভালো করে দেখে নিয়ে সাহুকার একটা তালিকা হাতে ফিরে গেল। বলে গেল খানিক বাদে এসে দামটাম নিয়ে কথা বলবে।

"তা দাম টাম কী রকম চাইবেন কিছু ঠিক করলেন?" মোহনদাস বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"সে কী দাম চাইতে হবে তা আমার থেকে তুমিই ভালো জানো মোহনদাস। যত বেশি দামে বেচবে, তোমার হিস্যাটাও ততই মোটা হবে," বাবা উত্তর দিলো।

"আমার হিসেবমতো, কাপড়টাপড়গুলো সব মিলে ষোল হাজার আর পাথরগুলোর জন্য কুল্যে দশ হাজার টাকা চাইলেই ঠিক হবে। কী বলেন?"

"উঁহু, এ তো একেবারে কেনা দাম হয়ে গেল হে! লাভ না থাকলে আমার পাহারাদারদের দলকে মাইনে দেবো কী দিয়ে?" বাবা মাথা নাড়ছিলো, "সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার চেয়ে এক পয়সা কমে জিনিস ছাড়বো না আমি, এই বলে দিলাম।"

"সে আপনি চাইতেই পারেন, তাতে আমারই লাভ বাড়বে, কিন্তু আমি যে দাম বলেছি ওর বেশি পাবেন না এই জেনে রাখুন," দালাল বলল। তারপর ফের বলে, "আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিন না! ঠিকঠাক দামেই সব বন্দোবস্ত করে দেবো দেখবেন।"

বাবা নিমরাজি ভঙ্গী করে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু পঁচিশ হাজারের নিচে যেন না নামে এই বলে দিলাম। এখন যাও। ব্যবস্থা করো গে।"

দুপুর নাগাদ মোহনদাস হাসি হাসি মুখে ফিরে এল। বাবাকে ডেকে বলে, "আপনার ভাগ্য বেজায় ভালো। তিরিশ হাজার ছশো টাকা দর পেয়েছি শেষ অবধি। অনেক কষাকষি করতে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু সবই নারায়ণের কৃপা। এই যে সাহুকারের রাজিনামা।"

তার হাত থেকে হিন্দুস্তানী ভাষায় জড়িয়ে মড়িয়ে লেখা কাগজের টুকরোটা নিয়ে বাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটাকে অনেকক্ষণ দেখলো। আমার ভারি হাসি পাচ্ছিল। বাবা একবর্ণ লিখতে পড়তে জানে না। খানিকক্ষণ সেটা দেখবার ভান করে বাবা বলল, "হুঁ। সব ঠিকই আছে দেখছি। তা টাকাটা আমি পাবো কীভাবে?"

"যেভাবে চাইবেন। নগদে নিতে পারেন, হুন্ডিও বানিয়ে নিতে পারেন।"

"হুন্ডি যদি আমি বেনারস বা অন্য কোথাও গিয়ে ভাঙাই তাহলে সুদ পাবো তো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"ঠিক আছে তাহলে। সাহুকারকে ডাকো। সব বুঝিয়ে দিয়ে যখন চায় তার মালপত্র সে উঠিয়ে নিয়ে যাক।"

তাজিয়া ভাসাবার সময় হয়ে আসছিল। কারোয়ান নদীটা কাছেই। বাবাকে আমি বললাম, "চলো ঘোড়া নিয়ে তাজিয়া ভাসানো দেখে আসি।"

কারোয়ানের ওপর দিয়ে শহরে ঢোকবার সেতুটাতে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দুজন। মহরমের দশম দিনে সেই নদীর পাড়ে সমস্ত শহরের লোক এসে জড়ো

হয়েছে। হাজারো রঙিন আফতাব-গীর আর নিশানের ভিড় সেখানে। একে একে জলে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে শহরের বিভিন্ন মহল্লার তাজিয়াগুলো। ছোট ছোট ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ভাগ করে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। উৎসবশেষে ক্লান্ত মানুষেরা যে যার বাড়ি ফিরে চলেছে আস্তে আস্তে। পথের পাশে ধুলোয় পড়ে আছে কোন ক্লান্ত নেশাখোর। হয়তো পকেটের শেষ কড়িটা দিয়ে সে একপাত্র ভাঙ খেয়েছিলো কাল রাতে। সে নেশা তার পরের দিনও কাটেনি।

সন্ধে পর্যন্ত সেই সেতুর ওপর কাটিয়ে কাছের একটা মসজিদে নামাজ পড়ে নিয়ে আমি বাবাকে বললাম আমি আবার জোরার ওখানে যাব। সে রাতটাও আমার জোরাদের বাড়িতেই কাটাবার ইচ্ছে ছিল। বাবা আপত্তি করল না। শুধু বলল পরদিন সকাল সকাল ফিরে আসতে। কাজ আছে অনেক। আমি মাথা নেড়ে জোরাদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

চেনা পথ ধরে জোরাদের বাড়িতে পৌঁছোতে আমার সময় লাগল না বেশি। আশা করেছিলাম, জানালায় তার হাসিমুখটা দেখতে পাব। কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে না পেয়ে তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আমি আমার সঙ্গের লোকটাকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠালাম। বেশ খানিকক্ষণ কোন জবাব এল না। মনে মনে আমার ভয় হচ্ছিল। তাহলে কি--

খানিক বাদে আমার আশংকাকে সত্যি প্রমাণ করে লোকটা ফিরে এসে বলে জোরার মা আমায় সালাম দিয়েছে। আর বলেছে, আমি যেন জোরার সঙ্গে আর দেখা না করি। জোরার কথা আমি যেন ভুলে যাই। তাকে খুঁজে কোন লাভ হবে না। নাকি আমার মত একজন ভবঘুরের সঙ্গে জোরা মোটেই জীবন কাটাতে রাজি নয়। নাকি আমি তাকে কখনো কোন জঙ্গলটঙ্গলে উপোস করে মরবার জন্যে কোনদিন ফেলে রেখে চলেও যেতে পারি।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, "বুড়ি আর কিছু বলেনি? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।" এই বলে আমি দরজায় তলোয়ারের বাঁট দিয়ে বারবার ঘা দিলাম, কিন্তু সে দরজা দেখা গেল ভারি শক্তপোক্ত। তার একটা নাটবল্টুও নড়ল না তাতে। রেগেমেগে সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি যত চিৎকার করি, ভেতর থেকে টুঁশব্দটি আসেনা তার জবাবে। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে গেল মজা দেখবার জন্য। কেউ আহা উহু করে, বলে, "আহা বেচারা, ভারি দুর্ভাগা। একেবারে দিওয়ানা হয়ে গেছে গো!" কেউ আবার বলে, "দিওয়ানা না আরো কিছু। ভাঙ খেয়ে চূর হয়ে আছে দেখছিস না? সাবধান। হাতে আবার তলোয়ারও আছে, দেখেছিস?"

শেষমেষ লজ্জায় মাথা নিচু করে আমি ফিরে এলাম। সারারাত ছটফট করে সকাল হোল যখন তখনো কী করা যায় তার কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি আমি। আশা একটাই ছিল, যদি জোরার বুড়ি দাইয়ের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করা যায়। সেই বুদ্ধি করে আমি আমার একটা লোককে পাঠালাম খবরটবর নেবার জন্য।

।১৬।

এর মধ্যে দুএকদিন আমার বদ্রীনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত ছিল না। তাতে সে আবার কী ভেবে বসে তাই ভেবে আমি গেলাম তার খোঁজ করতে। আমায় দেখে বদ্রীনাথ ভারি খুশি। বলে, "কিহে, একেবারে ডুমুরের ফুলটি হয়ে গেলে যে। তিনদিন ধরে দেখাসাক্ষাত নেই!"

"আগে নিজে বলো গত তিনদিন ধরে কী কী করেছো, তারপর আমার গল্প বলব," আমি মাথা নেড়ে বললাম।

"কাজ করছিলাম হে! বেশ কয়েকটা মন্দিরে পুজোটুজো দিলাম, মহরমের জুলুশ দেখলাম, আর সাতটা শিকার করলাম। "

"সা- তটা? বলো কী? পেলে কোথায় এতো লোক?"

"তা লোকের কি অভাব আছে, নাকি এ শহরের আশেপাশে পাথরটাথরে ভরা নির্জন পথঘাটের অভাব? লোকগুলোও বেশ সহজে বিশ্বাস করে বসে আমায়।"

"আজব কাণ্ড।" আমি বললাম, "তা লোকগুলো কে?"

"সাধারণ লোক সব। একজন ছিল বেনে, বিদরের দিকে যাচ্ছিল, বেটাকে আমরা গোলকোন্ডার দিকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে সেখানকার কবরগুলোর মধ্যে গোর দিয়ে এসেছি। ওর থেকে এসেছে সত্তরটা টাকা আর খানিক সোনা। তারপর মারলাম দুটো লোক আর তাদের বউদুটোকে। তারা আবার কুরুঙ্গুল না কোথায় যেন যাচ্ছিল। শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে নিকেশ করে পাথরের গর্তের মধ্যে ফেলে এসেছি। দুশো টাকা আর দুটো টাট্টুঘোড়া রোজগার হয়েছে ওর থেকে টাট্টুদুটো বেচে আরো তিরিশ টাকা পেয়েছি।"

"ঠিক করোনি। শরীরগুলো পুঁতে দিয়ে আসা উচিৎ ছিল।"

"আরে ধুস। কোথাকার না কোথাকার লোক। উৎসবের সময় শহরে ঢুকেছিল। কে ওদের খোঁজ করতে আসবে? তাছাড়া, তখন সকাল হয়ে আসছিল। ওসব কায়দাকানুন মানতে গেলে ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। এ তো গেল পাঁচজনের হিসেব। বাকি দুটো?"

"ওই তো ওখানে রাখা আছে," বদ্রীনাথ ইশারা করে একটা বেঁধে রাখা ঘোড়ার দিকে দেখাল, "সাকুল্যে বিয়াল্লিশ টাকা মিলেছে দুটোর কাছ থেকে, বুঝলে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা।"

"কাজটা ভালো করো নি। শহরের একেবারে মধ্যে-- কেউ যদি দেখে ফেলতো?"

"দেখবেটা কে? সবাই তো গেছিল মহরমের জুলুশ দেখতে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমরাও ভাবছিলাম জুলুশ দেখতে যাই তখন এই দুই শ্রীমান এসে হাজির। সরফরাজ খান সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ মেরে একটার গলা টিপে দিল। আমি আর কী করি, অন্যটার গলা টিপে দিলাম শেষ করে। তারপর দিনমানটা শরীরদুটো লুকিয়ে রেখে সন্ধের পরে এনে পুঁতে দিয়েছি।"

"ফুলে ফেঁপে উঠবে না তো আবার?"

"আরে রামোঃ। অনেক গভীর করে গর্ত খুঁড়েছি হে মীরসাহেব। তাছাড়া আর সব কায়দাও তো তোমার জানাই আছে। পেটটা ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়ি আলাদা করে দিয়ে--"

"উঃ খুব ফুর্তি করলে তিনদিন। আমি সেসব কিছু করতে তো পারলামই না, মধ্যে থেকে জোরাও হাত ফসকে বেরিয়ে গেল," আমি মাথা নেড়ে বললাম।

"আরে বন্ধু, ফুর্তির কী অভাব হবে নাকি জীবনে? কাজ , বুঝলে, কাজকেই তোমার গৃহিনী বানিয়ে নাও। মানুষের মেয়েরা বিশ্বাসঘাতিনী হয়। কাজ কখনো তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না হে!"

"তা ঠিকই বলেছো। বলি আরো কিছু কাজকর্ম করবার কথা মাথায় আসছে?"

"না তেমন কিছু নেই, তবে তুমি চাইলে নাহয় আজ সন্ধেবেলা বাজারটাজার ঘুরে কাউকে একটা তুলে আনা যেতে পারে।"

"সেই ভালো। নইলে বসে থেকে থেকে অভ্যাস চলে যাবে," আমি বললাম। তারপর কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবাকে দেখেছো?"

"উঁহু। শুনেছি লুটের মালের বিলিবন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত আছেন।"

"ঠিকই শুনেছো বদ্রীনাথ। তবে আজকের মধ্যে সেসব কাজ সারা হয়ে টাকাপয়সা এসে যাবে। তার পরে আমরা এ শহরে আর বেশিদিন থাকবো বলে মনে হয় না। আমার নিজেরও এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারি বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। সরফরাজ খান আছে নাকি কাছাকাছি?"

"উঁহু। দলের দশ পনেরোটা সেরা লোক নিয়ে সে সাতজন পথিকের একটা দলের সাথে পুটুনচেরুর দিকে গেছে। কাজ সেরে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

"পথিক বলতে?"

"শুনেছি বানিয়া। নিজে চোখে দেখিনি অবশ্য। সরফরাজের তাড়া ছিল। সব ভালো করে বলে যেতে পারে নি।"

আমার নিজের ওপরে রাগ হচ্ছিল। চারপাশে লোকজন কত কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে আর আমি কিনা বসে বসে আলসেমি করে সময় কাটাচ্ছিলাম! বদ্রীনাথকে বললাম, "কাজকর্ম কিছু করতেই হবে আমায় আজ, বুঝলে। "

সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। সন্ধেটা হোক। তেমন লাভের কাজ কিছু না জুটলে অভ্যেসটা বজায় রাখবার জন্যেও আজ কাউকে একটা মারব। মজাও হবে খানিক।"

"ঠিক আছে তাই হবে। কিছু একটা কাজ না করলে আমি দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো, বুঝলে! উফ্, মনমেজাজের অবস্থা যা হয়ে আছে আমার! কাল অবধি রক্ত ফুটছিলো, আর আজ যেন সব একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।"

বদ্রীনাথকে ছেড়ে আমাদের ডেরায় ফিরে দেখি মোহনদাস এসে বসে আছে। তার সঙ্গে সাহুকারের গোমস্তা এসেছে কাগজকলম নিয়ে। মাল বইবার জন্য কুলিকামিন আর পাহারা দেবার জন্য তলোয়ার আর গাদা বন্দুক হাতে পাহারাদারও এসেছে অনেকগুলো।

তাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে আমি সাহুকারের গোমস্তাকে বললাম, "এ যে একেবারে যুদ্ধে যাবার তোড়জোর করে এসেছেন দেখছি শেঠজি। এত বন্দুক টন্দুক দেখে আমারই তো ভয় ভয় লাগছে!"

লোকটা কাজ করতে করতে জবাব দিলো, "ওর দরকার আছে। নইলে আমাদের মালপত্র যদি চোখের সামনে থেকে চুরি হয়ে যায়, তার ক্ষতিপূরণ তো আর কেউ করবে না, তাই নিজেদেরই সাবধান থাকতে হয় আর কি!"

"ঠিক আছে, এবারে তাড়াতাড়ি কাজ মেটান দেখি," বাবা তাড়া দিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। মালপত্র তো এক্ষুণি রওনা হয়ে যাবে। বাকি রইল আপনার পাওনাগণ্ডার কথা। তা সবই নগদ নেবেন নাকি অন্য মালপত্তর কিছু নেবেন বদলি হিসেবে?"

"না না মালপত্র একেবারে নয়। সব নগদে নেবো। রুপোর টাকায় পাঁচ হাজার, আর বাকিটা সোনায় দেবেন। সঙ্গে করে বইতে সুবিধে হবে।"

"তা সোনা নিতে চাইলে কিনে নিতে হবে। কুড়ি টাকা তোলা দর যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলি কি, হুন্ডি করে নিয়ে যান। ভালো বদলি দর পেয়ে যাবেন।"

"না না ওসব কিছু চলবে না। সোনায় নেব। যদ্দূর খেয়াল পড়ছে দিল্লি থেকে যখন বেরোচ্ছি সোনার দর তখন সেখানে বেশ চড়া যাচ্ছিল। সে দর এখন আরো বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া পথে চোরডাকাত নিয়েও আমার কোন চিন্তা নেই। সঙ্গে লোকজন রয়েছে অনেক।"

"আজ্ঞে আমার হিস্যাটার কী হবে?" মোহনদাস মাঝখান থেকে বলে উঠল।

"ও ভেবোনা। যে পাঁচ হাজার রুপোর টাকা নেবো ওর থেকে তোমার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেবো," আমি বললাম, "তোমার তো পাওনা হবে কুল্যে দেড় হাজার, তাই তো?"

"অ্যাঁ? কতো বললেন? দেড় হাজার? এই জোচ্চোরটার দালালী?" গোমস্তাবাবু দেখি ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বলতে বলতেই মোহনদাসের দিকে ঘুরে বলেন, "হ্যাঁরে ব্যাটা ঠগ, পাগলটাগল হয়ে যাসনিতো?"

মোহনদাস দেখা গেল গোমস্তার ওপর বেশ রেগেছে। বলে, "কিন্তু কর্তা নিজেই তো তখন বলেছিলেন একশোয় পাঁচ টাকা করে দেবেন, তাতে তোমার গায়ে এত জ্বালা ধরছে কেন?"

বাবা গোমস্তাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "একে কত দিলে ঠিক হয় বলুন তো?"

"শতকরা এক ভাগ হলে যথেষ্ট। আপনি সরাসরি যদি যোগাযোগ করতেন তাহলে তারও দরকার হত না।"

"কী করি? শহরে নতুন এসেছি, ঘাঁতঘোঁত কিছুই চিনি না, তখন এ ব্যাটা এসে বলে কিছু কাজ আছে নাকি, তাই এর সাহায্য নিয়েছিলাম," বাবা জবাব দিল।

মোহনদাস এতে ভারি রেগে গিয়ে বলে, "কী বললেন? চার মিনারের কাছ থেকে আপনি আমায় ডেকে নেন নি? আপনি আমায় শতকরা পাঁচ ভাগ দালালি দেবার প্রস্তাব নিজে থেকে দেন নি?"

"ওমা এযে দেখছি দিনকে রাত করতে লেগেছে," বাবা অবাক চোখে দালালটির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, "কী হে মীরসাহেব, লোকটা এসে তো তোমার সামনেই ধরে পড়ল, গরিব মানুষ, খেতে পায় না, কিছু কাজ চাই। কত কী দিতে হবে জিজ্ঞেস করতে বলল, আপনার যা ইচ্ছে হবে তাই দেবেন। আর এখন আমায় মারবার তাল করেছে। জুতো মার, মুখে জুতো মেরে বের করে দে এখান থেকে! যত আপদ!"

গোমস্তা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাবাকে বলে, "আহা জনাব, অত উত্তেজিত হবেন না। এ ব্যাটা মনুষ্যাধমের জন্য অত দম খরচ করে কী লাভ? তাছাড়া কথা যখন একটা হয়েছে, ওকে কাজেও লাগিয়েছেন আপনি তখন পাওনাগণ্ডা কিছু না কিছু তো দিতেও হবে। আমার হিসেবমতো একে এক শতাংশ হারে তিনশো ছ টাকা দিলেই চলবে। কী বলেন?"

বাবা দেখা গেল তাতেও রাজি নয়। বলে, "হায় আল্লা, অত টাকাই বা আমি কোথায় পাব। আরে আমিও তো আমার মালিকের কাজ করি, তার জিনিসপত্র নিয়ে বেচবার কাজ করি। কি মীরসাহেব, বলুন না, আমি কতটা বড়লোক সে তো অন্তত আপনার জানা আছে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তা বটে। এতগুলো টাকার এক শতাংশ দালালি দিয়ে দিলে আপনার তো ভাগে কিছুই থাকবে না। শ দেড়েক দিয়ে দেন বরং।"

মোহনদাস এতক্ষণ হাঁ করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এইবার বেজায় রেগে গিয়ে সে বলে, "তার মানে? আপনি আমার ন্যায্য পাওনা দেড় হাজার টাকা দেবেন না? আ- আপনি আমায় চার মিনারের কাছ থেকে ডেকে এনে এ কাজটা দেন নি? কাজটার জন্য আমি দিনরাত এক করে খাটাখাটুনি করিনি? আ- আপনি ভান করছেন যে আমি আপনার কাছে এসে কাজ চেয়েছিলাম-- আপনি- -"

আমি খুব বিরক্ত মুখভঙ্গী করে গোমস্তার দিকে চেয়ে বললাম, "উঃ, আবার সেই চারমিনারের গল্প! দেখুন মশায় আপনি যদি এ লোকটার ভালো চান তাহলে একে থামতে বলুন। আমি আপনাদের মত ব্যবসায়ী নই, দালালও নই। যুদ্ধ করে খাই। শেষে মেজাজ গরম হয়ে গেলে পরে কিন্তু—"

এই বলে আমি আমার গোঁফজোড়াকে একবার চুমরে নিলাম। মোহনদাস সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে গেল একেবারে। বলে, "আহা রাগ করবেন না হুজুর। ভুল করে ফেলেছি, মাপ করে দেন। আপনারা ঠিক বুঝে যত টাকা দেবেন তাতেই আমার কাজ চলে যাবে। আমায় প্রাণে মারবেন না। এই যে নাক খত দিচ্ছি--"

গোমস্তা বেচারা তাই দেখে হেসেই বাঁচে না। বলে, "আরে ছি ছি মোহনদাস, নাকের নিচে এতবড় গোঁফ রয়েছে তোমার, তা একটু সাহস তো দেখাবে! কে তোমায় মারবে বলল আবার? ওরকম ভিখিরির মত করছ কেন? উঠে দাঁড়িয়ে হুজুররা খুশি হয়ে যা দেন তা বুঝে নাও।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "দশটা টাকা দিলেই আমার যথেষ্ট হবে হুজুর"।

গোমস্তা হাসতে হাসতে বলে, "সে কী হে? এই বলছিলে দেড় হাজার টাকা! সে নিয়ে এত ঝগড়া করলে, আবার এই একেবারে দশ টাকায় রাজি?"

বাবা মাথা নেড়ে বলল, "না না। যা এর ন্যায়ত ধর্মত পাওনা তাই আমি একে দেব। ওই দেড়শো টাকাই তুমি পাবে হে মোহনদাস।" এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মীরসাহেব তুমি গোমস্তাবাবুর সঙ্গে সাহুকারের কোঠিতে চলে যাও। সেখান থেকে টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে ফিরে আসবে, তা ফেরার সময় আপনারা দুয়েকজন পাহারাদার আর কুলি টুলি কিছু সঙ্গে দিয়ে দেবেন তো?" এ প্রশ্নটা ছিল গোমস্তাবাবুর উদ্দেশ্যে।

সে বলল, "আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাববেন না। সেসব ঠিকঠাক করে দেয়া যাবে'খন। এখন চলুন দেখি তাড়াতাড়ি। সোনা জোগাড় করতেও তো সময় লাগবে অনেকক্ষণ।"

আমার সঙ্গে পথে বের হয়ে খানিক দূর গিয়ে মোহনদাস হঠাৎ সবার কান বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "তা, সাহুকারের কুঠিতেই আপনি আমায় আমার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেবেন তো?"

আমি বললাম, "টাকা তো আমার নয়। না জিজ্ঞাসা করে দেবো কী করে?"

"আপনার নয়, তাহলে কার টাকা?"

"আরে বাবা, যে তোমায় কাজে লাগিয়েছে টাকা তো তার। এতো আচ্ছা মূর্খের পাল্লায় পড়েছি!"

"না, মানে একটা কথা ভাবছিলাম তো, তাই জিজ্ঞাসা করলাম আর কি?"

"কী ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম, আপনি তো ভাড়া খাটা সৈনিক। হিন্দুস্তানের ওই ব্যবসাদারকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছেন।"

"তো?"

"আপনি কি রইস?"

"না। কেন?"

"তাহলে আমরা দুজন মিলে বড়লোক হয়ে যাই না কেন?"

"কী'রকম?" আমি বেশ কৌতুহলি গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

"সহজ ব্যাপার। টাকাপয়সা নিয়ে ফেরার সময় কোন কুলি বা পাহারাদার সঙ্গে নেবেন না। দুজন মিলে টাকাপয়সাগুলো নিয়ে পালাই চলুন। শহরের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় একজায়গায় আমার আরো অনেক টাকাপয়সা লুকনো আছে। টাকাপয়সা নিয়ে সেইখানে গিয়ে দুজনে মিলে সবকিছু ভাগ করে নেয়া যাবে, কী বলেন?"

"জায়গাটা কদ্দূর?"

"কাছেই। দেখে আসবেন নাকি একবার? এখন অবশ্য দূর থেকে দেখাব। দিনের আলোয় একেবারে কাছে নিয়ে গেলে লোকজন দেখে ফেলতে পারে।"

তাহলে আমরা দুজন মিলে বড়োলোক হয়ে যাই না কেন?

মোহনদাসের পেছন পেছন যেতে সে কারোয়ান নদীর পেছনদিকটায় একটা উঁচু টিলার দিকে দেখিয়ে বলে, "পাথরের গায়ে একটা সাদা ছোপ দেখতে পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি।"

"ওইখানেই আমার মালখানা। যেখানে যা জোগাড় করতে পারি ওখানেই রেখে আসি। আমি ছাড়া আর মাত্র কয়েকজন জায়গাটা চেনে।"

"তা, কী জিনিসপত্র জোগাড় হয়?"

"যেখানে যা জোটে। কখনো একটা শাল, কখনো কয়েকটা জরির রুমাল, কখনো এক আধ টুকরো সোনা। আমাদের দলে আমরা ষোলজন আছি। তোমায় নিয়ে সতেরো হবে। ওই যে একটা ফকির বসে আছে না? ও আমাদের দলের লোক। এরকম আরো কয়েকজন এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে নিচু গলায় বললাম, "ব্যাটা কুকুর। কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই জানিস? আমি

হিন্দুস্তানের একজন সৈয়দ। তোর মত পোকাকে মারতে আমার এক মুহূর্তও লাগবে না। কিন্তু তুচ্ছ কাজ করে আমি নিজেকে ছোট করতে চাই না। এখন ভালো চাস তো আমায় সাহুকারের কোঠিতে নিয়ে চল ঠিকঠাক। ওতে কোন গণ্ডগোল করলে- -”

মোহনদাস আবার দেখি ভোল পালটে হাতে পায়ে ধরতে লেগেছে। বলে, “না না হুজুর, সে কী? টাকা আপনি ঠিকই পাবেন।”

“তাতে তোরই মঙ্গল। ওতে কোন গণ্ডগোল হলে এই দেখছিস?” আমার উঁচিয়ে ধরা তলোয়ারটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মোহনদাস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গায়ের কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে বলল, “চলুন।”

সাহুকারের কুঠি থেকে টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে আমাদের ভাড়াবাড়ির দিকে আসছি যখন, মোহনদাস তখনো আমার পেছন-পেছন কাকুতিমিনতি করতে করতে আসছে। বলে, “মীরসাহেব, এসব কথা যেন কাউকে বলবেন না। আমি না বুঝলেন আপনার সঙ্গে একটুখানি রসিকতা করছিলাম। আমার স্বভাবটাই ওরকম, খালি বদরসিকতা করে বেড়াই- আর, আমার দেড়শো টাকাটা? ভোলেন নি তো? ও মীরসাহেব- -”

বাড়ি পৌঁছে আমি সঙ্গের সেপাইদের কিছু বখশিস দিয়ে বিদায় করে দিলাম। দেখে মোহনদাস ভিতু ভিতু গলায় বলে, “এইবারে তবে আমার টাকাটাও দিয়ে- -”

বাবা বের হয়ে এসেছিলো বাইরে। বলে, “আরে হ্যাঁ। দালালজির টাকাটা বের করে দিই দাঁড়াও।”

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

বইপড়া

অঙ্কের ভূত

মহাশ্বেতা

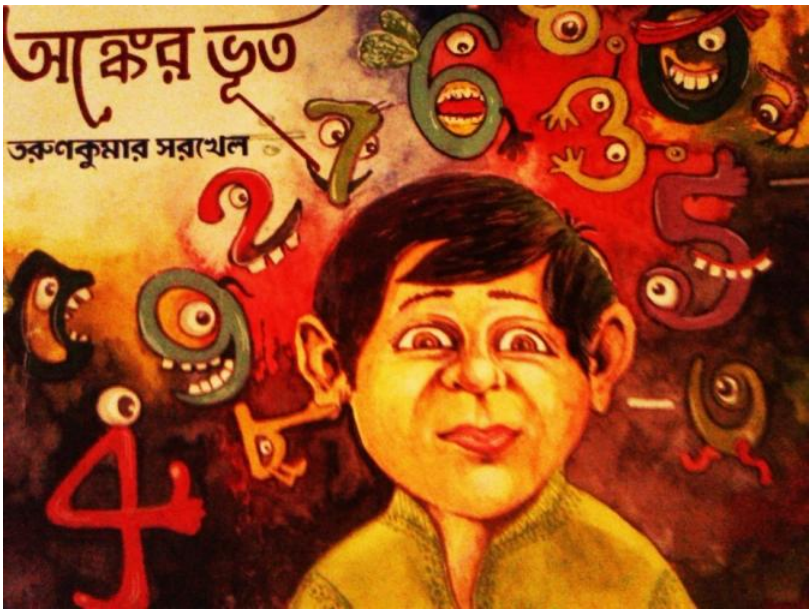

না, না, এটা কোন কঠিন অঙ্কের বই নয়। ভয় পেয়ো না! এটা তরুণকুমার সরখেলের লেখা গোটা তিরিশেক ছোট গল্পের একটা সংকলন। অধিকাংশ গল্পেরই চরিত্রই আমাদের চেনা, যে ছেলেটা অঙ্কে ভয় পায়, যে মেয়েটা স্বপ্ন দেখে, যে গোবেচারা লোকটা কারুর সাথে ঝগড়া করে ছিনিয়ে নিতে পারে না প্রাপ্য অধিকার, ছোট্ট গোয়েন্দা, যে ছেলেটা স্টেশনে ঘুরে বেড়ায়, গল্প বলিয়ে মামা, দূরদেশের রাজা। এদের কেউ থাকে গ্রামে, কেউ থাকে শহরে, কেউ মাটির বাড়িতে, কেউ ফ্ল্যাটে। এদের অনেকের সাথে আমাদের রাস্তাঘাটে দেখা হয়, কেউ কেউ আমাদের পাড়ায় থাকে, আমাদের স্কুলে পড়ে, আবার কারুর কারুর সাথে পরিচয় হয়েছে গল্পের, কমিকসের বইয়ে, আমাদের বড়ই চেনা এরা। অতএব এদের নিয়ে এই বিভিন্ন আবেগে পরিপূর্ণ সুখ- দুঃখের গল্পগুলো পড়লে বড় আপন মনে হবে, আর যেমন হাসি পাবে, তেমন চোখের কোনে জলের কণাও দেখা দেবে। আর প্রত্যেকটি গল্পের নিচে রয়েছে একটি শক্তিশালী মানবিক বার্তা যেটি মনে একটা গভীর দাগ কাটে। তার ফলেই হয়তো ‘রাজামশাই ও বুড়ির গল্প’ অথবা ‘তিন্নি ও প্রজাপতি’র গল্প সহজে ভোলা যায় না। অতি প্রাসঙ্গিক কিছু সমস্যার কথা খুব প্রকটভাবে না হলেও, লেখক উল্লেখ করেছেন গল্পের মাধ্যমে। আর প্রত্যেক গল্পের সাথে রয়েছে যত্ন করে আঁকা ছবি।

আমার ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে ভাল লাগল ‘দুখিরাম’ গল্পটা। এটি ওই স্টেশনে ঘুরতে থাকা গ্রামের ছেলেটার গল্প। একদিন তার সাথে আলাপ হয়ে গেল জন বলে এক শহুরে ফোটোগ্রাফারের সাথে। তাকে নিয়ে গ্রাম ঘোরাতে নিয়ে গেল সে, মাঠে ইঁদুর ধান বের করা থেকে শুরু করে খেজুর রস তৈরি করা, সবকিছুর সাথে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দেয়, কয়েকঘন্টার মধ্যেই জনের চোখ খুলে দেয় সে। তারপর জন ফিরে যায় শহরে। শেষে কী হল তা জানতে পড়ে নাও ‘অঙ্কের ভূত’। তোমাদের যে ভাল লাগবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত।

কিছু তথ্যঃ

নাম- অঙ্কের ভূত
লেখক- তরুণকুমার সরখেল
দাম- ৫০ টাকা
প্রকাশক- শ্রী জগদীশচন্দ্র সরখেল
আমডিহা
পোঃ দুলমি- নডিহা
জেলাঃ পুরুলিয়া ৭২৩১০২
যোগাযোগঃ ৯১৩৩১৭৫৩৫৩
ইমেইলঃ sarkheltarun126@gmail.com
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ – অবি সরকার

suchipotro

লোককথা

কুকুর ও ক্যাঙারুর গল্প

মহাশ্বেতা

অনেক, অনেক কাল আগে, কুকুর ও ক্যাঙারু ছিল ভারী ভাল বন্ধু। তারা একসাথে শিকার করত, খেলা করত, খেত আর একই জায়গায় ঘুমোতো। কুকুরের শরীর ভাল না থাকলে, ক্যাঙারু জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কুকুরের প্রিয় জন্তু শিকার করে আনত সে খাবে বলে। ক্যাঙারু অসুস্থ হয়ে পড়লে কুকুরও তার জন্য একই কাজ করত। আবার মাঝেমাঝে এমনিই তারা একে অপরের প্রিয় খাবার এনে উপহার দিত। তারা ছিল একেবারে হরিহর আত্মা।

একদিন খুব ভোরে ক্যাঙারু হঠাৎই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। পাশে কুকুর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল কিন্তু ক্যাঙারু তাকে আর জাগালো না। সে একাই জঙ্গলে শিকার করতে চলে গেল। কুকুরকে আর জানালো না কিছুই।

ক্যাঙারু জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেছে, এমন সময় কুকুরের ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে আশপাশে ক্যাঙারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সে তাকে খুঁজতে বেরোল। তার নাম ধরে ডাকতে লাগল, "আ- উ- উ- উ- উ, ক্যাঙারু বন্ধু, কোথায় গেলে? আ- উ- উ- উ- উ-- "

কিন্তু ক্যাঙারু তো তখন গভীর জঙ্গলে। সেখান থেকে সে না কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিল, না দিতে পারছিল তার উত্তর। আস্তে আস্তে দুপুর হয়ে এল। আশপাশে ক্যাঙারুকে খুঁজে না পেয়ে শেষে কুকুর মাটিতে বন্ধুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে লাগল। এদিকে ক্যাঙারু সারা সকাল জঙ্গলে ঘুরেও কোন পছন্দসই শিকার খুঁজে পায়নি। সূর্য তখন আকাশ বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ক্যাঙারু শেষমেষ ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা ছিল একটা বিশাল কাঁঠাল গাছ। গাছটা ভর্তি ছিল থরে থরে পাকা কাঁঠাল আর সেগুলো গরমে সব গাছ থেকে খসে খসে পড়ছিল।

ঘুম থেকে উঠে ক্যাঙারুর পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে বেশ অনেকগুলো কাঁঠাল ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। সে মাটিতে বসে সেগুলোকে খেতে লাগল পেট পুরে। সূর্যাস্তের সময় কুকুর তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছোল সেই কাঁঠাল গাছের নিচে। তখনো ক্যাঙারু খেয়ে চলেছিল। কুকুরকে দেখে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল।

কুকুর বলল, "বন্ধু, সকাল থেকে আমি তোমায় খুঁজে চলেছি। এখন তো প্রায় রাতই হতে চলল।" ক্যাঙারুর মুখ ভর্তি তখন কাঁঠাল তাই সে কোন জবাব দিল না। কুকুর আবার জিজ্ঞেস করল, "খাচ্ছটা কী তুমি? আমিও খাব।"

ক্যাঙারু তখন মুখেরটুকু গিলে উত্তর দিল, "আরে বন্ধু, তুমি এ কী করে খাবে, আমি তো গোবর খাচ্ছি!" কুকুর বড়ই সরল ছিল। সে তার কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলল। সন্ধের হালকা আলোয় সে গাছের কাঁঠাল ভাল করে দেখতেও পেল না। সে সরল মনে জিজ্ঞেস করল ক্যাঙারুকে, "সে কি ভাই, গোবর কি আবার খাওয়া যায় নাকি?"

"কেন খাওয়া যাবে না? দিব্যি খাওয়া যাবে! এই দেখ না আমি খাচ্ছি?"

"খেতে কেমন গো? ভালো?"

"আরে দারুণ গো, দারুণ। খেলে মুখে স্বাদ লেগেই থাকবে।"

অন্ধকার হয়ে এসেছিল ততক্ষণে। দুই বন্ধু গাছতলা ছেড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। যেতে যেতে রাস্তার ধারে তারা দেখে এক ঢিপি সত্যিকারের গোবর পড়ে রয়েছে। ক্যাঙারু শয়তানী করে কুকুরকে বলল, "ওই যে কত গোবর। তুমি চাইলে চেখে দেখতে পারো, বুঝলে? আমার তো গলা অবধি ভর্তি।"

কুকুর তাই শুনে গিয়ে সেই গোবর মহানন্দে খেয়ে নিল। ক্যাঙারু ওদিকে হাসি চাপতে চাপতে কোনরকমে তাকে জিজ্ঞেস করল, "কি ভাই? ভালো লাগছে খেতে?" কুকুর তার উত্তরে বলল, "হ্যাঁ ভাই দারুণ! এরকম ভাল খাবার জীবনে খাইনি তো!"

কথাটা অবশ্য ক্যাঙারু বেশিক্ষণ গোপন রাখতে পারল না। বাড়ি ফিরেই সে কুকুরকে বলে দিল, "ভাই, আমায় মাফ করে দাও। আমি ওই গাছ তলায় বসে কাঁঠাল খাচ্ছিলাম, গোবর নয়। তোমাকে ঠাট্টা করে গোবর খাচ্ছি বললাম। কিন্তু ভাই তুমি তো তা সত্যি ভেবেই রাস্তার ধারে আসল গোবর খেয়ে নিলে। তুমি কিছু মনে করো না, হ্যাঁ ভাই?"

কুকুর তাতে মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হল, কিন্তু ক্যাঙারুর সাথে সে কোনরকমের দুর্ব্যবহার করল না। সে চুপচাপ থেকে চিন্তা করতে লাগল শুধু।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কুকুর আর ক্যাঙারু একদিন ঘুরতে বেরোল। এবার তারা গেল সমুদ্রের ধারে, ঝিনুক খুঁজতে আর তাজা মাছ ধরে খেতে। ক্যাঙারু অনেক খেটেখুটে ঝিনুক খুঁজতে লাগল, কিন্তু কুকুর একই জায়গায় বসে থেকে নখ দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই বালিতে তার লম্বা লম্বা সামনের পা-দুটোর অনেকটা ঢেকে গেল। দূর থেকে দেখে মনে হল যে তা যেন কে কেটে একেবারে ছোট করে দিয়েছে। ক্যাঙারুও দূর থেকে দেখে তাই মনে করল।

তা দেখে ক্যাঙারু সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক রেখে কুকুরের কী হয়েছে দেখতে চলে এল। এসে তার ছোট ছোট পা দেখে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই তোমার পায়ের কী হয়েছে? দেখে ছোট মনে হচ্ছে যে?"

তার জবাবে কুকুর বলল, "আমি ঝিনুক দিয়ে কেটে ফেলেছি যে ভাই! এত লম্বা লম্বা হাত আমার আর ভাল লাগছিল না। বড় ঝামেলা! তাই ভাবলাম কেটে ফেলি।"

"ও, তাহলে আমিও তাই করি। তাহলে আমাদের দু'জনের হাতই একরকম হয়ে যাবে। ভালোই হবে। আমারও তো ছোট হাত হলে অনেক সুবিধা!"

“বেশ, তাই কর তাহলে, তোমার যদি ইচ্ছা হয়,” কুকুর মনে মনে হাসতে হাসতে জবাব দিল।

ক্যাঙারু সঙ্গে সঙ্গে তার সংগ্রহ করা সবচেয়ে বড় ঝিনুকটা তুলে নিয়ে এল। তার ধারালো দিকটা দিয়ে খচাত করে নিজের দুই হাত কেটে ফেলল যেমনটা সে কুকুরকে করতে দেখেছে। তার পা’গুলো ছোট ছোট হয়ে গেলে কুকুর মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বালির তলায় চাপা দেওয়া তার সামনের পা গুলো অনায়াসে বের কর আনল। ক্যাঙারু তা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল, “তুমি আমায় বোকা বানালে কেন? আমার হাত দুটো কাটালে কেন আমায় দিয়ে? জবাব দাও!”

কুকুরও তার উত্তরে ক্যাঙারুকে জিজ্ঞেস করল, “আর তুমিও আমায় সেদিন বোকা বানিয়ে গোবর খাইয়েছিলে কেন?”

তারপর তো শুরু হল দুজনের মধ্যে চরম কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া। কুকুর শেষে ক্যাঙারুকে তাড়া করে জঙ্গলের মধ্যে তাড়িয়ে দিল। তাদের বন্ধুত্বেরও সেইসঙ্গে অবসান ঘটল।

সেইদিন থেকে ক্যাঙারু ও কুকুরদের আর কোনরকম সদ্ভাব নেই। কুকুর যত রাজ্যের নোংরা খায় আর ক্যাঙারুর সামনের পাগুলো ছোট ছোট। যদি কেউ ক্যাঙারুদের এলাকায় কুকুর নিয়ে ঢোকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তারা সব পালিয়ে যায়। আগের বন্ধুত্বের ছিটেফোঁটাও তাদের মধ্যে আর নেই। এখন তারা পরম শত্রু।

পাপুয়া নিউগিনির লোককথা
ছবিঃ মৌসুমী

suchipotro

বিচিত্র জনজাতি কাকমারা

উমা ভট্টাচার্য

এবারের সংখ্যায় থাকছে ভারতবর্ষের বাংলাদেশের এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা, ‘যারা ঘরের নহে পারের নহে, আছে মোদের মাঝখানে’, ছিন্নমূল একদল ভবঘুরে মানুষের কথা। নাম তাদের ‘কাকমারা’। বাস তাদের মেদিনীপুর,কাঁথি,খেজুরি,দাঁতন,তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, এগরা, এসব অঞ্চলে। এরা ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষা করে গ্রামে গ্রামে,আর শিকার করে বিশেষত কাক যা অঢেল পাওয়া যায়। যেখানে যায় সেখানে মানুষের ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থ, কাঠকুটো, প্লাস্টিক, ছেঁড়া, ফেলে দেওয়া কাপড় ন্যাতা কুড়িয়ে নিয়ে অস্থায়ী আস্তানা তৈরি করে। কিছুদিন থাকে সেখানে তারপর সেখানের শিকার ফুরিয়ে গেলে আর ভিক্ষার অভাব হলে ,আস্তানা ভেঙে দিয়ে চলে যায় অন্য গ্রামে। তবে মেদিনীপুরের বাইরে এরা বিশেষ যায়না। নিজেদের নির্বাচিত অদ্ভুত বিচিত্র পোশাক পরে, নিজেদের শিকারের হাতিয়ার লাঠি,নারাজ নামে একধরনের ফাঁদ,ছেঁড়া বিচিত্র বর্ণের ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পরে শিকারের সন্ধানে। তবে শুধু মাংসে তো আর পেট ভরেনা, তাই চাল ডাল আনাজের জন্য ভিক্ষা করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি।

একবার গিয়েছিলাম মেদিনীপুরের খেজুরির কাছে এক গ্রামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে,সে প্রায় বিশবছর আগেকার কথা। বিয়েবাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা,আগের দিন অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, রাস্তার ধারে উচ্ছিষ্ট আবর্জনা ফেলা হয়েছে। সকালের টিফিন খাচ্ছে সবাই, হঠাৎ সামনের দরজায় শোনা টং টং ধাতব আওয়াজ। সঙ্গে একটি মনুষ্যকণ্ঠের ডাক।“লেড়িদি লেড়িদি। বুমি দেওয়া ওরা রাজা। বালু ওরা।”

চেয়ে দেখি বিচিত্র পোশাক পরিহিত এক বিচিত্রদর্শন মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তৎপর হয়ে উঠল। দেরি করা যাবেনা। বাড়ির গৃহিনী উঠে গেলেন ভিক্ষা দিতে। টিফিন মাথায় উঠল। দেরি হলে রক্ষে নেই।

মানুষটির কর্কশ ভাষার অর্থ বুঝতে পারলাম না। পরে বাড়ির লোকেদের কাছে জানলাম ঐ বিচিত্র শব্দ বন্ধের মানে।‘লেড়িদি লেড়িদি—মানে সীয়ারাম, সীয়ারাম। ‘বুমি দেওয়া ওরা রাজা’- মানে ‘আমরা এসে গেছি’। ‘বালু ওরা’- মানে ‘তোমরা তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দাও’। একটু বাদে বাড়ির গৃহিনী নিয়ে এলেন থালাভর্তি চাল, আলু, বেগুন,লঙ্কা, নুন আর কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে ডালা সাজিয়ে। পছন্দসই ভিক্ষে হল বলে বাড়িয়ে ধরল ছেঁড়া ন্যাতা দিয়ে তৈরি মোটা আর বেঢপ একটা ঝোলা ‘জোলি’। অশ্রদ্ধায় সামান্য ভিক্ষা এরা নেয়না। ভিক্ষা আনতে দেরি হলে মুহূর্তে রেগে উঠতে পারে আপাতনিরীহ চেহারার দীনহীন মানুষটি। আগুনের গোলার মত লাল চোখদুটো যেন রাগে বেরিয়ে আসতে থাকবে চক্ষুকোটর থেকে। সেই চোখ পাকিয়ে অবোধ্য, অশ্রাব্য ভাষায় অভিসম্পাত করতে থাকবে, আর নিজের হাতের ধারালো কাটারি দিয়ে কোপ বসিয়ে দেবে নিজেরই শরীরের

কোনখানে, আর ঝলসানো কাকের মাংস খাওয়া অপবিত্র শরীরের রক্ত ফিনকি দিয়ে এসে পড়বে গৃহস্থের উঠোনে। তাই মানুষ এদের ডাক শুনলে হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে ভিক্ষার ডালি সাজিয়ে। শুনলাম এদের নাম কাকমারা।

এদের সাজপোশাক বিচিত্র, সেই পোশাকের নামও বিচিত্র। এদের ভাষা তেলেগু। এদের কপালে পরে লাল সিঁদুরের লম্বা টিকা। রংবেরঙের যে আলখাল্লা পরে তাকে এরা এখনও তেলেগু ভাষায় বলে, 'এলিস অলখম'। মাথায় পরে লম্বা শুঁড়তোলা খানিকটা টোপরের মত দেখতে টুপি,এরা বলে 'টোফি'। টোফির চারপাশে বাঁধে টকটকে লাল রঙের কাপড়ের ঝালর দেওয়া রংচঙের রুমাল। তবে পোশাকের রং প্রধানত খাকি রঙের, বনে শিকারের সময় শিকারের চোখে ধাঁধা লাগাবার জন্য পরে এই শার্ট জাতীয় পোশাক 'সককা'। নারীপুরুষ নির্বিশেষে গলায় থাকে নানা রঙের ছোট বড় পুঁতির মালা- 'পসল' আর পরনে খাটো ধুতি 'বাট্টা'। ভিক্ষায় বেরোয় 'এসিম অলখম' গায়ে'জোলি' কাঁধে, বাঁ হাতে বাঁশ বা ধাতুর তৈরি 'লাঠ্টা',ডান হাতের মণিবন্ধে থাকে ধাতুর তৈরি মোটা মোটা বলয় 'কারিম' আর একটা ধারালো কাটারি- 'কাত্তি'। ভিক্ষা করতে এলেও ভিখারিসুলভ কোনও কুণ্ঠা বা নরম ভাব থাকেনা এদের চাউনিতে।

অবহেলিত প্রান্তিক মানুষ হিসাবে বাচঁতে বাঁচতে, ভিন্ন সমাজের এককোণে অবাঞ্ছিতের মত পড়ে থাকতে থাকতে এরা এরকমই হয়ে গেছে বাঁচার তাগিদে। তবে কারো অনিষ্ট করেনা, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেনা, নিজেদের ভাষা আর সংস্কৃতিকে নিজেদের মত করে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরা কাক বেজি ইত্যাদি পশুশিকার করে ঝলসিয়ে খেলেও গোমাংস খায়না। কাক এমনই অখাদ্য যে অন্য পশুও পারতপক্ষে সে মাংস খায় না। তবে কেন এরা খায়,এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। এরা নিজেদের পরিচয় দেয় তেলিঙ্গা বলে –ভাষা এদের তেলুগু। কারো কারো মতে এদের আদি বাস ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাডায়।

তবে এরা আজকাল স্থানীয় ভাষার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হয়েছে প্রয়োজনে, তবু নিজেদের ভাষাতেই এরা স্বচ্ছন্দ। আচার আচরণ থেকেই সিদ্ধান্তে আসা যায় দক্ষিণ ভারতের তেলুগুভাষী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙ্গলাদেশে চলে আশা একটি যাযাবর অংশ এরা, কারণ হিন্দু সংস্কৃতির অনেক নিয়মকানুন এরা পালন করে। তবে এখানকার পালাপার্বণে এরা আসেনা।এদের নিজস্ব পুরোহিত আছে। তাই মনে হয় এদের একটা সুসংহত সমাজ ছিল। শিকারজীবি আদিম তেলুগু জাতির কেন্দ্রচ্যুত একটা অংশ এই গোষ্ঠী কোনদিনই কৃষিজীবি ছিলনা। ভাগ্যের পরিহাসে হয়তো কোনও সামাজিক বিপর্যয়ে, বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে এরা ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে সুদূর অতীতে এদেশে। অর্থবিত্তহীন,আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু হয়ে থাকার জায়গার অভাবে মাঠেঘাটে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া দক্ষিণাপথ থেকে বাংলায় অনেক রাজারা সামরিক অভিযান করেছেন নানা সময়ে। দক্ষিণ ভারত,অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাংলার আসার সহজ পথ ছিল উড়িষ্যা হয়ে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে।এইসব সামরিক অভিযানে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হত সমাজের নীচুজাতির খাটিয়ে শক্তসমর্থ সাধারণ আদিবাসী মানুষ। পাইক তীরন্দাজ হয়ে বা তাদের বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের বাহক হয়ে এরা এসেছিল এদেশে। রাজকীয় অভিযান শেষে এদের উচ্ছিষ্ট আবর্জনার মত পিছনে ফেলে দেশের রাজা ফিরে গেছেন স্বদেশে।

অচেনা রাস্তা,পথ প্রদর্শকের অভাব আর রসদের অভাবে বিপর্যস্ত এই ব্রাত্য মানুষেরা আর ফিরে যেতে পারেনি নিজেদের জন্মভূমিতে। মেদিনীপুরে এরকম আরও কিছু অন্য প্রদেশের ভিন্ন জনজাতির মানুষ আছে, যেমন শিয়ালগিরি, কলমাদার,- যারা নাকি মারাঠাদের রসদবাহী সৈন্য হিসাবে এসেছিল এখানে, আর, কোন না কোন কারণে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরতে পারেনি। এরা অবশ্য তেলেঙ্গি কাকমারাদের মত স্বতন্ত্র না থেকে এখানকার জনজীবনে খানিকটা মিশে গেছে।

কাকমারারা কিন্তু দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এখানে থেকেও নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি এখানকার সমাজে। এরা বেঁচে রইল সেই ভিক্ষাজীবি আর শিকারনির্ভর জাত হয়ে। কাক শিকার কেন? কারণ কাক সর্বত্রই সহজলভ্য,তাই প্রথমে কাকশিকার করে তার মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করত,পরে অন্যান্য খাদ্যের সন্ধানে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছে।

এদের শিকারের সময় খুব ভোরবেলা। প্রায়ান্ধকারে এরা গাছপালা ঘেরা কোনও এলাকায় একটা জাল পাতে, তার দড়িটি থাকে প্রায় ৭০/৮০ হাত লম্বা। অল্প একটু মাটি খুঁড়ে চার- পাঁচ হাত লম্বা জালটা বিছিয়ে দেয় তার উপর। আর ছড়িয়ে দেয় ভাত। তার লোভে কাক এসে জালে ধরা দেয়। কাক ছাড়াও বেজি,কাঠবেড়ালি এসবও পড়ে জালে। সঙ্গে সঙ্গে কলদড়িতে টান দিয়ে জাল গুটিয়ে নেয় আর ধরা পড়ে শিকার।

সব শিকারই এরা খায় তবু এদের নাম রয়ে গেছে কাকমারা বলে। আসলে এরা প্রথমে আর কিছু না পেয়ে কাকই ধরতো ।এদের মেয়েরা ছেঁড়াখোড়া শাড়ি কোনক্রমে গায়ে জড়িয়ে আস্তানাতেই থাকে আর পুরুষেরা ফিরে এলে ভিক্ষায় পাওয়া চাল, তরকারি ফুটিয়ে নেয় শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা মালসা বা হাঁড়িতে, জল রাখে সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনা কলসিতে। মাংস কাঠকুটোর আগুনে ঝলসে নেয়। রাঁধে শুধু বিকেলে। সারাদিন এটা ওটা, গাছের ফলপাকুড়টা খেয়ে।

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও এরকম অবহেলিত প্রান্তিক মানুষের বাস আছে আমাদের সোনার বাংলায়, ভাবতেই কষ্ট হয় মনে। শুনেছি আজকাল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নাকি এদের সমাজের মূল ধারার সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্য নানা প্রকল্প নিচ্ছে, এদের নিয়ে সিনেমাও হয়ে গেছে, তবুও এই সরল সাদাসিধে মানুষগুলি কি মানুষের পর্যায়ে এসেছে? এখনও সে খবর জানিনা। জানলে আবার লিখব এদের নিয়ে।

suchipotro

হটী বিদ্যালঙ্কার

উমা ভট্টাচার্য

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। সে সময় ভারতে, বিশেষত বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা চলতো। সমাজে লেখাপড়ার চল বলতে ছিল টোল আর চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ,কাব্য,আর বৈদ্যকশাস্ত্র (আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র)ছিল শিক্ষার বিষয়। তবে সেই শিক্ষার অধিকার ছিল প্রধানত ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছেলেদের।নীচু জাতির বা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না।আর মেয়েদের পড়াশোনার কথা তো মনেই আনা যেতনা। নারী শিক্ষা আন্দোলন তখনো শুরুই হয়নি পুরোদমে। সংস্কৃতসহ যে কোন শিক্ষার দুয়ার মেয়েদের কাছে বন্ধই ছিল। নানা কুসংস্কারের আর বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ রাখা হত মেয়েদের। বদ্ধমূল ধারনা ছিল যে, মেয়েরা পড়াশোনা শিখলে বিধবা হয়।

এইরকম সমাজের এক ব্যতিক্রমী নারী ছিলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। জন্মস্থান বর্ধমানে। উদার চিন্তার মানুষ ছিলেন হটীর বাবা। পান্ডিত্যে এই মহিলা ছিলেন যেকোন পুরুষ পন্ডিতদের সমকক্ষ। সেই যুগে টোল, চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের পাঠদান করতেন প্রকাশ্যে।

বেদের যুগে মেয়েদের যে পৈতে হত,তাদের যজ্ঞ করার যে অধিকার ছিল, আর তাদের লেখাপড়ার যে অধিকার ছিল, যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক মুনি ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তা নিষিদ্ধ করে দেন। আর তার পর থেকে সবাই সেটা মেনেই চলত। সেই সময়ে যে সব বিদূষীরা ছিলেন তারা মূলত লুকিয়ে বিদ্যাচর্চা করতেন। বাইরে প্রকাশ হতনা। আঠারো,উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত সামান্য কয়েকজন মহিলা বিদূষী টোল পড়ুয়ার বিরল দৃষ্টান্তের একজন হটী বিদ্যালঙ্কার।

রাঢ়দেশের বর্ধমানের সোঞাই গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মনের একমাত্র মেয়ে ছিলেন হটী। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ার পর ঘরের কাজকর্ম করার সাথে সাথে শুনতেন পিতা টোলের ছাত্রদের কী কী পড়াচ্ছেন। শুনেশুনেই ব্যাকরণ,ন্যায়,কাব্য- এইসবকিছুর অনেকগুলিই তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তখনকার দিনে একটি হাতেলেখা পুঁথি থেকে পন্ডিত মশায় পড়াতেন আর ছাত্রদের তা স্মৃতিতে ধারণ করতে হত। অসাধারণ স্মৃতির অধিকারিণী, অধ্যাবসায়ী হটী সেই সবই আত্মস্থ করেছিলেন নিজের চেষ্টায়।

এই সময় সামাজিক নিয়মে এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়, তখন কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহ করতেন, তাই বিয়ের পরেও অনেক মেয়েকে বাপের বাড়িতেই থাকতে হত। হটীকেও তাই থাকতে হল। ফলে বাবার কাছে তাঁর পাঠও চলতে লাগলো গোপনে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বয়স্ক স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হলেন হটী। বাবাকে বললেন, “বই, কলম হাতে নিয়ে পড়াশোনা করলে তো মেয়েরা বিধবা হয়, তবে আমি কেন বিধবা হলাম? আর বিধবা হলাম যখন, তখন তো আমার পড়াশোনায় কোনও বাধা নেই। আমি পড়বো”।

বাবা তাঁকে এইবার সযত্নে পড়াতে লাগলেন একান্তে। তিনি জানতেন শাস্ত্রে আছে “কন্যাকেও পুত্রেরই মত সমানভাবে পালন করতে হবে,আর তাদের যত্ন করে বিদ্যাশিক্ষাও দিতে হবে।” ক্রমে হটী ‘নব্যন্যায়’ নামের সংস্কৃত বিষয়টিতেও অতিশয় পন্ডিত হয়ে উঠলেন।

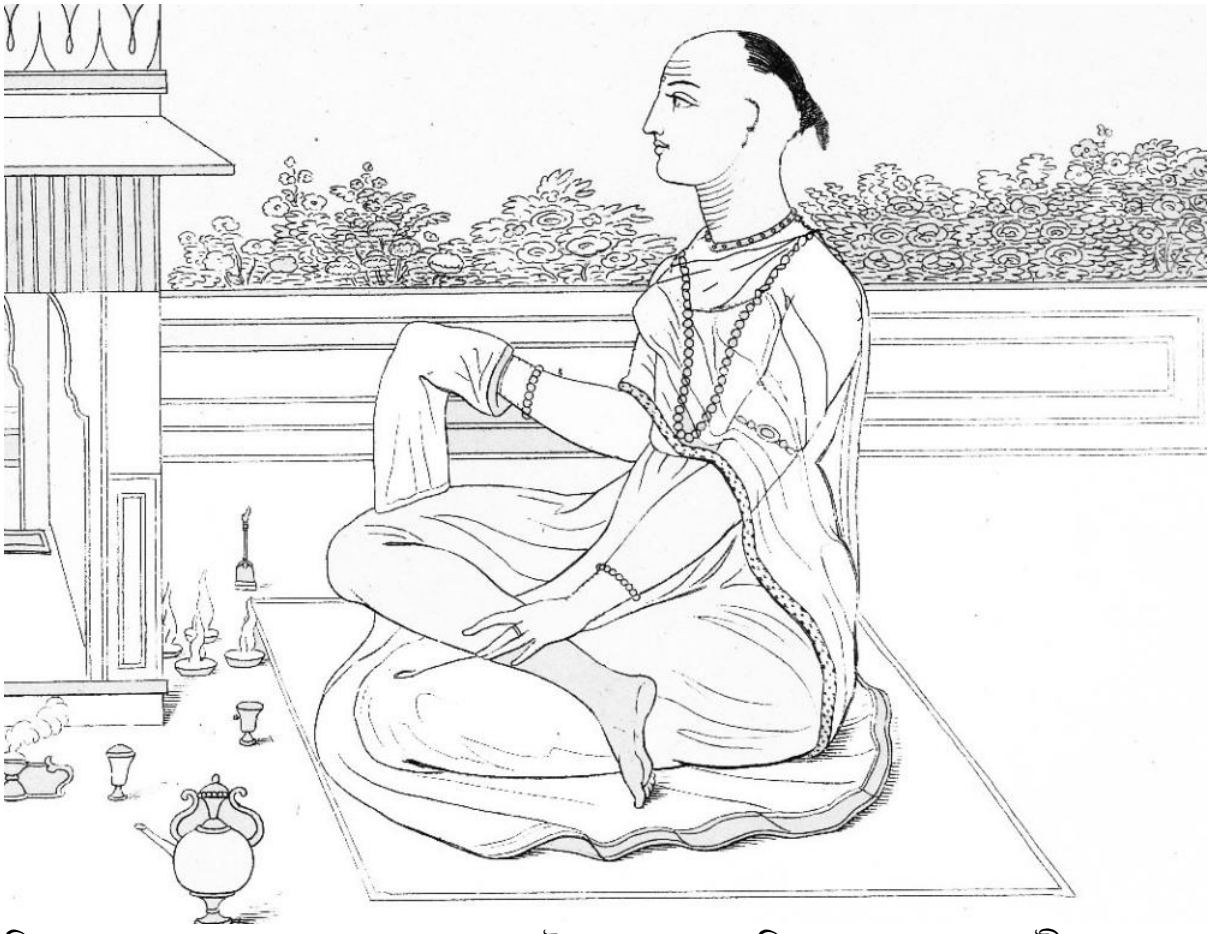

কিছুকাল পরে বাবা মারা যেতে প্রকাশ্যে টোলের ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ভারও হটীর ওপরে পড়ল। এইবারে ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা ক্ষেপে উঠলেন মেয়েটার স্পর্ধা দেখে। তাঁরা প্রতিরোধ শুরু করলেন।টোলের ছাত্ররা স্ত্রীলোকের কাছে আর বিদ্যাগ্রহণ করতে পারল না সমাজের চাপে। তারা একে একে টোল ছেড়ে চলে গেল। প্রচন্ড অর্থাভাবে পড়লেন হটী, সঙ্গে সামাজিক প্রতিকূলতা।

সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অবশেষে তিনি কাশী চলে গেলেন। তখনকার দিনে অসহায়, সম্বলহীন বিধবাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল কাশী। তবে হটী সেখানে গিয়েছিলেন নিজের জ্ঞানের সম্পদ সঙ্গে করে।

কাশীতে গিয়ে তিনি স্মৃতি, ব্যাকরণ ও নব্যন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানী পন্ডিতা হিসাবে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং একসময় নিজের টোল খুললেন কাশীতে। দলে দলে ছাত্র আসতে লাগল দেশবিদেশ থেকে। গৌড় দেশের ও কাশীর অনেক ছাত্রকে পড়িয়েছেন তিনি। নব্যন্যায়ের অধ্যাপিকা হিসাবে তাঁর প্রচুর নামডাক হল। এই সময় কাশীর পন্ডিতেরা তাঁকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। কাশীতে বিভিন্ন বিচারসভাতে পুরুষ পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁরও ডাক পড়তো, এবং তিনি পুরুষ পন্ডিতদের মত বিদায় দক্ষিণাও নিতেন কারণ এই ছিল তাঁর জীবিকা। পন্ডিতদের মত নেড়া মাথায় টিকিও রাখতেন তিনি।

যে সময়ে শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত যশস্বী মহাপন্ডিতেরা শিক্ষার আকাশে বিখ্যাত হয়ে বিরাজ করছেন সেই সময় এক বিধবা মহিলা নিজের দক্ষতার আর সাহসের সঙ্গে একলা বারাণসীতে টোল প্রতিষ্ঠা করে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পান্ডিত্যে তিনি বাংলার ও বাঙালির গৌরব যে কতখানি বৃদ্ধি করেছিলেন তা বোঝা যায় মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' বইটিতে তাঁর নাম উল্লেখ করা থেকে। এ ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের

উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর লেখা বই “হিন্দু”তে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নামের সঙ্গে তাঁর নামটিও উল্লেখ করেছেন (১৮০৬- ১৮০৭ খৃস্টাব্দে)তখনও তর্কপঞ্চানন মশাই বেঁচে ছিলেন। তর্কপঞ্চানন মশায়ের মৃত্যুর তিন বছর পরে ১৮১০ খৃস্টাব্দে কাশীতেই হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়।

১৮১৭ খৃস্টাব্দে স্থাপিত স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত “স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক” নামক পুস্তকে তাঁর সফলতা আর পাণ্ডিত্যের কথা সম্মানের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

আজ এই সামান্য স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাই ।

suchipotro

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

কালীপ্রসন্ন সিংহ (1840- 1870) বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করে, নিজের অর্থ ব্যয় করে ছাপিয়ে বিলি করলেন চিৎপুর রোড- এ সিংহবাড়ির সামনে উপস্থিত থেকে। বড়লোক মানুষের এক নতুন তামাশা? এটা হলো বড়ো মাপের খেলা।

কয়েকদিন রাস্তায় ভিড় জমেছিলো সকাল সন্ধ্যায়। যারা পেলো দান করা এই বই, তারা কেউ নির্ধন, কেউ অর্থবান, কেউ তারা নিরক্ষর, কেউ শিক্ষিত, কেউ হয়তো কল্পনা করে নিল এই বই বাজারে বেচলে আন্দাজ পঞ্চাশ টাকা কামাবে। কয়েকদিন গেল, এইভাবে প্রায় হরিলুটের মত বাংলা মহাভারতের কপি নিঃশেষ হয়ে গেল। সেদিনের দৃশ্য একজন দেখেছিল কালীপ্রসন্নের বাড়িতে বসে – প্রতাপচন্দ্র রায়, সিংহবাড়ির প্রিয় জোয়ান কর্মচারী, মাইনে যার সাত টাকা। প্রতাপ দেখেছিলেন অনেক অনুরাগী পাঠক পেলনা সেই বই। বড় আক্ষেপ রয়ে গেল তাদের।

কালীপ্রসন্ন অকালে মারা গেলেন। বঙ্গসমাজ চোখের জল ফেলল। এবার প্রতাপ চিৎপুর রোডে নর্মাল স্কুল- এর ধারে স্কুলের বই- খাতার দোকান খুললেন। রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে নর্মাল স্কুলে অল্প সময় পড়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের দোকান তিন বছরের মধ্যে লাভজনক হয়ে উঠল। এবার তিনি বই বিক্রি ব্যতীত বই ছাপানোর স্বপ্নও দেখলেন। মনে পড়েছিল কয়েক বছর আগে কালীপ্রসন্নর দরজা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া অনেক মানুষের কথা। ঠিক করলেন যেমন করে হোক মহাভারত ছাপবেন তিনি।এই খেয়াল সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৬৯ সালে প্রতাপ মহাভারত- এর প্রথম খন্ড ছাপলেন। দাম ৪২ টাকা। পরবর্তী সাত বছরে বাকিটুকু। ছাপা হল, সকলের মুখে প্রশংসাও পেলেন। অনেকে আক্ষেপ করেছিলেন বই তাঁরা পেলেন না। প্রতাপচাঁদের বাড়িতে তখন এক হাজার মহাভারত- এর কপি ছিল। বিনা পয়সায় বিলি করে দিলেন একদিনে।

এখন এল ভবিষ্যত পরিকল্পনা করবার সময়। পরবর্তী সংস্করণ ছাপতে গেলে অনেক অনেক সামর্থ্য দরকার। তিনি এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন, নাম দাতব্য ভারত কার্যালয়। দেশের লোকের টাকার সাহায্যে এই দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে সবার কাছে প্রচার করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দেশের রাজামহারাজারা অর্থ দিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম, কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী, পুটিয়ার শরতসুন্দরী উদার হাতে টাকা দিলেন। দূর বিদেশ

থেকে এল সংস্কৃত অনুরাগী বন্ধুদের উৎসাহ। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির স্বনামখ্যাত ডক্টর রস্ট, সংস্কৃতজ্ঞ ভারতপ্রেমী ম্যাক্সমুলার, এডউইন আরনল্ড (গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁর সুবিখ্যাত ইংরিজি কাব্যগ্রন্থ "লাইট অব এশিয়া")স্বাগত জানালেন এই প্রচেষ্টাকে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা নতুন জীবন পাবে, প্রাচীন বিদ্যার প্রসার হবে।

সাত বছর ধরে চলল দাতব্য ভারত কার্যালয়-এর এই কর্মযজ্ঞ। প্রতাপ এই সাত বছরে প্রকাশ করলেন মূল সংস্কৃত মহাভারতের তিন সংস্করণ, বাংলাতে চার সংস্করণ, হরিবংশের এক সংস্করণ, প্রত্যেক সংস্করণে বইয়ের সংখ্যা তিন হাজার। সব বিনা দামে বিক্রি হল। এবার রামায়ণ প্রেসে ছাপতে গেল। এবং সেই সঙ্গে প্রতাপ মহাভারতের ইংরিজি অনুবাদ করার পরিকল্পনা শুরু করলেন। প্রবল সাড়া পেলেন সেই উদ্যোগে। বিদেশ থেকেও অনেকে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু মহাভারত পৃথিবীর বৃহত্তম রচনা। আছে আঠারো খন্ড। ছত্র ২,২০,০০০, শ্লোক এক লক্ষ দশ হাজার। শ্লোকের পাঠান্তর আছে। আরো ভেদ রয়েছে। পরিকল্পনা হল একশো খন্ডে সম্পূর্ণ মহাভারত ছাপানো হবে। বই ওজন করলে হবে আধ মণ। খরচ হবে এক লাখ টাকার কম নয়। ম্যাক্সমুলার মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠিয়ে দিলেন প্রতাপকে। অনুবাদ করেছিলেন তাঁর এক জার্মান ছাত্র। সেই অনুবাদ অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। ভারতে থাকার সময় এডুইন আর্নল্ড কয়েক হাজার শ্লোক অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করে ওঠেন নি। কোন ইউরোপীয় পন্ডিত মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নি।পন্ডিত দুর্গাচরণ এই গুরুদায়িত্ব গ্রহন করলেন। ১৮৮৩ সালে প্রকাশ পেল মহাভারতের ইংরিজি অনুবাদের প্রথম খন্ড। পদ্যের ছন্দে রচিত। জগত জুড়ে প্রশংসা হল। বাংলা দেশের প্রকাশনার এই এক বিশেষ দিন। প্রতাপচন্দ্র লিখলেন ভূমিকাতে যে প্রথম খন্ড ১২৫০ কপি ছাপানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৫০ কপি এ দেশের খ্যাতিমান লোকেদের উপহার দেয়া হবে। ২৫০ কপি যাবে ভারতের শাসক ও কর্তৃপক্ষের লোকজনের হাতে, এই উদ্যোগে সহায়তার জন্য। কর্নেল নেভিল চেম্বারলিন ১৮৮৮ সালে প্রতাপকে সাধুবাদ জানালেন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে।

ক্রমশ

suchipotro

ঋকবাবুর রান্নাখেলা

এই সংখ্যায়ঃ-- রাশিয়ান বরশ স্যুপ

তনুশ্রী মুস্তাফি

জয়ঢাকের কিচেন

আচ্ছা ছোট ছোট ছেলেগুলি কী দিয়ে তৈরি হয় বলো তো? মেয়েদের মত খালি ভালো ভালো জিনিস দিয়ে নিশ্চয় নয়। সে তো আমার ঘরের নমুনাটিকে দেখলেই বুঝতে পারি।কী পাজি আর কী দুষ্টুই না রে বাবা! সর্বক্ষণই পায়ের তলায় চাকা(তিনি হাঁটতে খুব একটা পছন্দ করেন না অগত্যা হামেশাই স্কুটারবাহন) আর মুখে ফুটছে খই। কোনো কথা মাটিতে পড়ার অপেক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাজির তাঁর অমূল্য মতামত নিয়ে। দেখতে দেখতে ঋকবাবু ছয় বছরে পড়লেন। গোটা চারেক দুধে দাঁত খুইয়ে আর গোটা দুই দাঁত অর্জন করে তিনি এখন নিজেকে বড়ই বীর মনে করেন। মানে কাউকে পাত্তা দেওয়ার ব্যাপার আর খুব একটা নেই। থাকবেই বা কেন? নিজে নিজে খেতে পারেন, চান করতে পারেন, মায় খানিক খানিক পড়াশুনাও নিজে করে নেন। গল্পের বই পড়েন, রাস্তা চিনে যেতে পারেন। বেশ তালেবর ব্যক্তি।

এ হেন ব্যক্তিকে কিনা গরম পড়তেই মা দিলেন মাথা ন্যাড়া করে। স্কুলে তো মানে প্রেস্টিজ একেবারে ফুটো। কোথায় ছিলেন ক্লাসের উঠতি গুন্ডা না এখন সবাই একবার করে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায়। রাগে হাঁড়িচাচা পাখি হয়ে একদিন ফিরলেন স্কুল থেকে। মাঝরাস্তায় এসে ছেলে আর বাড়ি ফিরবে না। মায়ের উপর কী রাগ! অনেক সাধ্যি সাধনা করে তাকে বাড়ি তো আনা হলো। বিকেলবেলা বাবা বাড়ি ফিরে ওয়ারজোন খেলতে বসে দেখালেন ডেমোলিশন ম্যানেরও তো মাথা ন্যাড়া। কি রকম হাতে গ্রেনেড নিয়ে জাগলিং করে। ব্যাস ছেলে একেবারে ফিদা। তা তিনি আপাতত ডেমোলিশন ম্যান। শতকরা একানব্বই শতাংশ বিস্ফোরক। বাকিটা মা মাঝে মাঝে জল ঢেলে দেয় কিনা।

আপাতত ঋকের স্কুলে গরমের ছুটি। টানা দু মাস। মা বেচারির ত্রাস। দুষ্টুমি তবু সহ্য হয়, কিন্তু বকবক? সেটা কে থামাবে? সকালে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি মুখ চলছে তো চলছেই। গল্পের বই পড়ে শোনাও, প্রশ্নের চোটে হয় বই বন্ধ নাহলে ধমকে চমকে চুপ করাতে হয়। পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র ছেলে যে গল্প শুনতে গিয়ে, কম্পুটারে গেম খেলতে গিয়ে বকুনি খায়, কেন? না বকবকানির চোটে কানে ব্যথা হয়ে যায় বলে। সেদিন দুপুরে সিনেমা দেখছিল, যেমন দেখে থাকে সোফায় মাথা আর আকাশে পা করে(উনি সাধারণ মানুষের মত বসতে পারেন না তো, আর মাথায় অক্সিজেনটাও বেশি পৌঁছোয় কিনা উল্টে বসলে!), তা মায়ের সাধ হলো একটু দার্শনিক আলোচনা করবার (মায়ের যে কেন এরকম বিপজ্জনক সাধ হয় মাঝে মাঝে!)।

এতোলবেতোল নানা কথার মাঝে জিগ্গেস করলেন "ঋক সোনা তোমার সব চাইতে খারাপ লাগে কী?" শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সপাট উত্তর, "কিচ্ছু না।"

"কিছুই না? একেবারে কিছুই না?"
"নাহ কিচ্ছু না। আবার কী?"
"না ধর মা যখন বকে তোমায়?"
"সে তো তুমি পাগল হয়ে যাও তখন। হি হি হি।"
এক গাল মাছি। কেন যে এর সাথে কথা বলতে যাই!।

সে যাই হোক। আপাতত কিছুদিন ধরে ঋক সবজি খেতে খুবই আগ্রহী। মাঝে বাড়িতে সবারই একবার করে বসন্ত রোগ হয়ে গেছে। তা তখন ঋক নিমপাতা, উচ্ছে সবই খেয়েছে আর সোনামুখ করেই খেয়েছে। মাও এই ফাঁকে সবজি খাওয়ার উপকারিতা একেবারে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঋক এখন জানে রং মিলিয়ে মিলিয়ে এক এক সবজির এক এক রকম উপকারিতা। লাল বা কমলা রঙের সবজি আর ফলে থাকে সব চাইতে বেশি ভিটামিন সি যা আমাদের চামড়ার খেয়াল রাখে। সবুজ রঙের ফল আর সবজিতে আছে আয়রন যা দরকার শরীরে রক্ত তৈরির জন্য। নীল আর বেগুনি ফল বা সবজিতে আছে ক্যান্সার আটকানোর ক্ষমতা। সাদা ফল আর সবজি বাড়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিদিন খেতে বসে এখন ঋক মিলিয়ে নেয় আজ কী কী রঙের খাবার খেল।

এই ছুটিতে ঋক মায়ের সাথে তৈরি করেছে মাটির তলার নানা সবজির সুপ। মা বলেন অনেকদিন আগে রাশিয়া বলে এক বিশাল কনকনে ঠান্ডা আর বরফে ঢাকা দেশে থাকত জার নামের শক্তিশালী রাজা, তার রানি জারিনা, বড়লোক মন্ত্রীরা আর দেশ ভর্তি গরিব সৈন্য আর চাষী, জেলে, তাঁতি প্রজারা। একদিকে বড়লোকদের অনেক পয়সা। তারা পিপে পিপে মিষ্টি মদ, সাদা ধবধবে রুটি, বড় বড় হাঁসের রোস্ট এই নিয়ে রোজ খেত মহাভোজ। এদিকে দেশ ভর্তি প্রজারা বেশিরভাগই থাকত না খেয়ে। নুন আর ক্ষুদের জাউ ঘরের

বাচ্চাবুড়োগুলোকে খাওয়াতে পারলে তারা মনে করত অনেক হয়েছে। এরই মাঝে ঠাকুমা-দিদিমা- মায়েরা বরফের সাথে লড়াই করে অল্প চাষ করে আর বন জঙ্গল ঢুঁড়ে নিয়ে আসতো সস্তার যত সবজি- বাঁধাকপি, বিট, গাজর, আলু, শালগম এই সব। ভিনিগারে ভিজিয়ে অল্প জারিয়ে নেওয়া হত সেই সব সবজি যাতে অনেকদিন পর্যন্ত সেগুলো ভালো থাকে। তারপর গরু বা শুয়োরের হাড়, সস্তা মাংসের ছাঁটের সাথে সেই সবজি সেদ্ধ করে তৈরি হত বরশ সুপ। গরিব দুঃখী মানুষের খাবার। কিন্তু খাদ্যগুণে সব চাইতে সেরা। ভিটামিন আর খনিজ খাদ্যগুনে সমৃদ্ধ। সেই খেয়ে রুশি চাষীর ছেলে আকাশপাতাল এক করে ডাকত ' সিবকা বুরকা, জাদুকা লাড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া।' এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে ইলিয়া মুরমিতস, চাষীর ছেলে যেত তাতার দস্যুদের থেকে বন্দি রাশিয়াকে উদ্ধার করতে আর জিতেই ফেরত আসত।

বরশ সুপ বানানোর উপকরণ

(এই প্রণালীতে নিজের পছন্দমত অদলবদল করে নিতে পারো তবে বিট চাইই চাই):

বিট - মাঝারি মাপের চারখানা, কুঁচিয়ে
গাজর - সেও গোটা চারেক, কুঁচিয়ে
বাঁধাকপি - মাঝারি মাপের হলে তার আধখানা (আমরা দিই নি), কুঁচিয়ে
আলু - মাঝারি মাপের একখানা (আমরা দিই নি), কুঁচিয়ে
আপেল - এক খানা (আমরা দিই নি), কুঁচিয়ে
আদা - আধ ইঞ্চি মাপের একখানা, কুঁচিয়ে
রসুন - পাঁচ- ছটা কোয়া, কুঁচিয়ে
পেঁয়াজ - এক খানা, কুঁচিয়ে (আমরা আগে থেকে ভেজে নিয়েছি, তবে না করলেও চলে)
ভিনিগার - দু চামচ
চিকেন স্টক - ৪০০ মিলি (সোজা ভাষায় ৫০০ গ্রাম চিকেন আর এক লিটার জল একটা পাত্রে নিয়ে উনুনে বসিয়ে দাও। ওতে দাও কয়েকটা তেজপাতা, এক মুঠো রসুনের কোয়া আর গোটা গোলমরিচ, চারটুকরো করে কাটা দুটো পেঁয়াজ, আধ ইঞ্চি মাপের একটা আদার টুকরো, একটা গাজর, পারলে লিক আর সেলেরি। টগবগ করে ফুটে উঠলে নামিয়ে নাও। চিকেনের টুকরোগুলো তুলে রাখো। পরে স্যান্ডউইচ বানাতে বা স্যালাড বানাতে কাজে লাগবে। জলটা ছেঁকে নাও। ওটাই চিকেন স্টক। প্রায় দশ দিনের বেশি ফ্রিজে ভালো রাখা যায়। আর নানা রান্নায় কাজে লাগে।) চাইলে কিন্তু নিরামিষাশীরা চিকেন ছাড়াও বানাতে পারো। চিকেন বাদে শুধু সবজিগুলো দিয়ে স্টক বানিয়ে সেটা ব্যবহার কর।

চিকেন ডাম্পলিং বানানোর উপকরণ:

বোনলেস চিকেন - ২৫০ গ্রাম
মাশরুম - ছ'খানা
পালংশাক, ভাপানো - এক মুঠো বা এক থাবা, যে মাপে খুশি
ডিম - দুটো
দুধে ভেজানো পাউরুটি- চারখানা

প্রণালী:

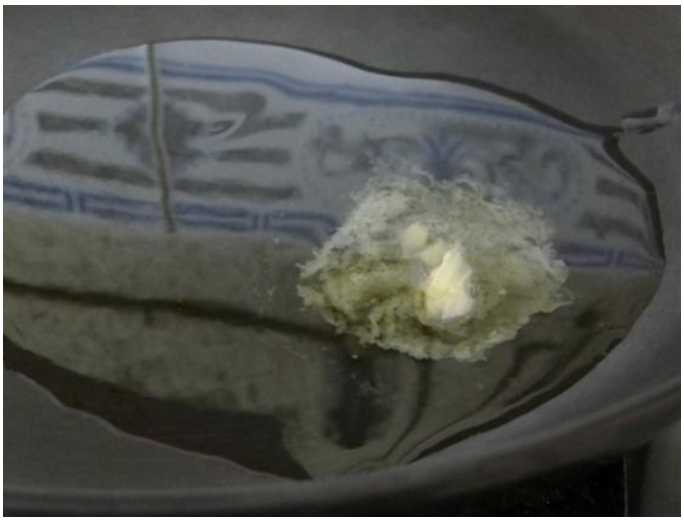

১। প্রথমে একটা প্যানে একচামচ সাদা তেল আর এক চামচ মাখন দাও। গরম হলে ওতে সব সবজি ঢেলে দাও। ভালো করে নেড়েচেড়ে মেশাও। তারপর একটা গল্পের বই খুলে নিয়ে পড়তে বস। ঋক অবিশ্যি এই পর্যায়ে বারবার কার্টুন দেখতে পালাচ্ছিল। তবে দশ মিনিট বাদে বাদে ডাকলেই এসে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে খানিক হাতা এবং হাতের কসরত দেখিয়ে যাচ্ছিল। মোটামুটি মিনিট কুড়ি বাদে যখন একটু রংটা পাল্টে পোড়া পোড়া হবে আর বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসবে বাতাসে ওতে অর্ধেক চিকেন স্টক ঢেলে দাও। এক চা চামচ নুন আর অল্প গোলমরিচ গুঁড়ো দিও। এবারে ঢাকা দিয়ে ফুটতে দাও। মিনিট দশেক বাদে ওতে ৬০০ মিলি জল ঢেলে দিয়ে ঢাকা দিয়ে আবার ফুটতে বসিয়ে দিও। পনের মিনিট বাদে নামিয়ে নাও। ঠান্ডা হলে হ্যান্ড ব্লেন্ডার বা মিক্সিতে পিষে নাও। এবারে ওতে দু চামচ ভিনিগার মিশিয়ে ফ্রিজে তুলে রেখে দাও। এক রাত বিশ্রাম পেলে ওর স্বাদ আরো বাড়বে। সেই কথাটা জান তো? স্টক আর স্টু যত পুরনো হয় তত স্বাদে বাড়ে। আগেকার দিনে ঠান্ডার দেশে কী করত জানো? ঘরে যে আগুনকুন্ড থাকত তাতে একটা একটা বড় হাঁড়ি চাপিয়েই রাখত। শুরুতে একবার হয়ত ঠিকঠাকভাবে সুপ বা স্টু বানানো হতো, তারপর থেকে যে যখন ইচ্ছে খানিক করে সবজি, বা মাংস বা মশলা বা জল ঢেলে দিত। দিনের পর দিন সেটা ফুটতেই থাকত আর বেড়েই যেত। শেষ আর হত না।

২। পর দিন সকালে একটা বড় ডেকচিতে বাকি চিকেন স্টক আর এক গ্লাস জল মিশিয়ে ফুটতে বসাও। উনুন অল্প আঁচে রাখবে। এবারে মিক্সিতে চিকেন ডাম্পলিং বানানোর সব উপকরণ নিয়ে পিষে নাও। একটা বাটিতে এই মিশ্রণটা ঢেলে নিয়ে হাতে করে মেখে নাও যেমন আটা মাখে। যদি দেখো জল বেরোচ্ছে তাহলে জলটা চেপে ফেলে দিয়ে আর একটা পাউরুটি হাতে ডলে মেখে নিও ভালো করে। এবারে হাতে করে ছোট ছোট গোল্লা পাকাও। এই পর্যায়ে ঋককে একটু সাহায্য করার

চেষ্টা করার জন্য গম্ভীর গলায় মাকে বকে দিয়েছে ঋক “এটা কের (কার বলতে পারে না ঋক) কাজ মা? হ্যা? কের কাজ? আমার না তোমার? দেখছ না আমি রান্না করছি?'

৩। ওদিকে দেখো চিকেন স্টকটা এখন টগবগ করে ফুটছে। ওতে পাঁচ ছটা করে গোল্লা এক একবারে ছাড় আস্তে করে। হাতে করে না দিয়ে একটা হাতায় গোল্লাগুলো নিয়ে আস্তে করে ডুবিয়ে দাও। দেখবে ওগুলো ডুবে গেছে। যেই ওগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে টুপ টুপ করে একটা একটা করে ভেসে উঠবে। এটা দেখতে ভারী মজা লাগে। যেই ওগুলো ভেসে উঠবে সাবধানে ছেঁকে তুলে একটা প্লেটে রাখো।

৪। এবারে ওই স্টকে আগে থেকে তৈরি বিটের সুপটা ঢেলে দাও। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এক চামচ তুলে নিয়ে চেখে দেখো তো নুন ঠিক আছে কিনা। যদি লাগে আরো খানিক নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে নাও। এবারে পরিবেশনের পালা।

৫। শীতের দিনে এই সুপ গরম গরম খেও প্রচুর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে। বাটিতে প্রথমে কয়েকটা চিকেন ডাম্পলিং দেবে। তারপরে উপর থেকে কয়েক হাতা সুপ। সাথে দুটো কড়কড়ে টোস্ট। শীত পালাবে বাপ বাপ বলতে বলতে।

৬। গরমের দিনে এই সুপ খেও ঠান্ডা ঠান্ডা। সাথে নিও এক চামচ টক দই। প্রাণটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়।

ঋকের বড় প্রিয় এই সুপ। বেশি চিবোতে হয় না, খেতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় না, সাথে মুরগিও খাওয়া যায় আবার সবজি খাওয়া হয় বলে মাও খুশি থাকে। শুধু দৌড়ঝাঁপ একটু বেড়ে যায় এই যা। আর বকরবকরও।

রাঁধুনীঃ ঋকবাবু
রান্নাগুরুঃ তনুশ্রী মুস্তাফি
ছবিঃ তনুশ্রী মুস্তাফি

suchipotro

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

উমা ভট্টাচার্য

সব দেশেই কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা নীরবে , লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে বিনা প্রচারে সাধারণ ও দীনদরিদ্র মানুষদের উপকার করে যান। এঁরা নিজেদের জীবন বা অর্থের কথা চিন্তাও করেন না।এমনই একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন হালিশহরের 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্য যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শুরুতে হালিশহর বিষয়ে কিছু কথা বলে নেয়া যাক। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর বাসস্থান হালিশহরের মানুষ সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে শরিক ছিলেন। হালিশহরের রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান রাজীবলোচন রায় ছিলেন বহরমপুরের সেনানিবাসে সেনা বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক, ও নেতা। ফাঁসি হয়েছিল তাঁর , সিপাহি বিদ্রোহের প্রশমনের পরেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনিই প্রথম বাঙালি শহীদ।

তাঁর আদর্শে ১৮৭০ সালে এই পরিবারের আর এক যুবক জীবনকৃষ্ণ চৌধুরী কিছু সাহসী আদর্শবাদী যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হালিশহরের সন্তানদল, যারা নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য সংকেতশব্দ নির্ধারিত করেছিল " স স ব ম" অর্থাৎ "সন্তান সম্প্রদায় বন্দেমাতরম।" সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি হচ্ছিল এই 'সন্তানদল'। গোপনে চলত তাদের অস্ত্রশিক্ষা। তখনও সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতির', 'আত্মোন্নতি সমিতি'বা যুগান্তর দলের মত বিপ্লবী সংগঠনের জন্মই হয়নি। তখন থেকেই হালিশহর ছিল বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষদের আবাস।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। চারিদিকে সাজো সাজো রব। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলাদেশের সর্বত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনই এক সময়ের মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সর্বভারতীয় বিপ্লবের প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হতে শুরু হল। চারিদিকে পুলিশের নির্মম অত্যাচার শুরু হল বিপ্লবীদের খোঁজে। ভারতরক্ষা আইনে শুরু হল ধরপাকড়,ফাঁসি, কালাপানি, যাপজ্জীবন কারাবাস,দ্বীপান্তর। বাংলাদেশের প্রায় সকল নামকরা বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ হতে শুরু হলেন । গ্রেপ্তারের ভয়ে সাধারণ বিপ্লবীরা কেউই বাড়িতে থাকতে পারে না, ফেরারি হয়ে ঘুরছিল এদিক ওদিক। খাওয়া নেই ,বিশ্রাম করার জায়গা নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই, হাতে টাকাপয়সাও নেই তাদের।

পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে,গভীর জঙ্গলে,কখনও খোলা আকাশের নীচে তাদের দিন কাটছিল। এই সব খবরই রাখতেন 'কলিকাতা কেলনার কোম্পানির' এক সামান্য খাজাঞ্চী যতীন্দ্রনাথ। নিজের সামান্য আয়কে ভরসা করে একদিন তিনি ঠিক করলেন এই আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন বিপ্লবীদের সাহায্য করতে হবে।

পলাতক বিপ্লবীদের একটি সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য হালিশহর চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা যতীন্দ্রনাথ নিরাপদ আর নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজতে লাগলেন। এখন যেখানে কাঁচড়াপাড়া বাগের মোড় সেই অঞ্চলটির নাম ছিল মল্লিকের বাগ। এখানকার 'বাগের খাল'-এর দিকটায় ম্যালেরিয়ার ভয়ে বিশেষ মানুষজনের বাস ছিলনা।

স্যাঁতসেতে, ঝোপঝাড় আর জঙ্গলময় নির্জন এই এলাকায়, বাগের খাল-এর জলধারার দক্ষিণ দিকে ১৪৪ টাকা বাৎসরিক খাজনার বিনিময়ে সাড়ে বাহাত্তর বিঘা পরিত্যক্ত জমি লিজ নিলেন যতীন্দ্রনাথ নিজের টাকায়, নিজের নামে। সেখানে কয়েকটি মুলিবাঁশের চালাঘর তুলে প্রতিষ্ঠা করলেন বিপ্লবীদের জন্য গোপন আশ্রয়। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন সমস্ত জমিটা। চারজন মালী রাখলেন সমস্ত জমিটা পরিষ্কার করে তাতে নানা সবজির চাষ করতে।

পতিত জমি সামান্য যত্নের প্রতিদানে দিতে লাগল প্রচুর তরিতরকারি। শুধু চালটা কিনে নিলেই বাগানের সবজিতেই অনেক মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এখানে দিবারাত্র সর্বক্ষণের জন্য খাদ্যসামগ্রী, বিছানাপত্র,আর ঔষধপত্রের ব্যবস্থা রাখা হল। কাছাকাছি গ্রামের কিছু দরদী মা বোনেদের ডেকে এনে এই মহৎ কাজের অংশীদার করা হল। তারা এইখানে এসে আশ্রয় নেয়া বিপ্লবীদের রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষার ভার নিল খাওয়া থাকার বিনিময়ে।

তাঁর এই মহৎ কাজের সহযোগীও জুটে গিয়েছিলেন কিছু । এঁদের মধ্যে ছিলেন খড়দহের রহড়া গ্রামের কিরীটীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বড় জাগুলির নিতাই চট্টোপাধ্যায় আর ভূপতি মুখোপাধ্যায়, কাঁচড়াপাড়া গ্রামের খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

যতীন্দ্রনাথ যখন কাজে যেতেন কলকাতায় ,তখন এঁরা পালা করে এই আস্তানার দেখভাল করতেন। কাঁটাতার আর জঙ্গলঘেরা জায়গাটিতে গাছপালা দেখে দূর থেকে মনে হত কোনও চাষীর বাড়ি। লোকে বলত ‘তারবাগানের বাড়ি।’ বিপ্লবীরা সাধারণত রাতের অন্ধকারে এখানে আসতেন, খাবার পেতেন, বিশ্রাম নিতেন , দরকারমত চিকিৎসাও পেতেন। তারপর ভোরের আলো ফুটে লোকজনের যাতায়াত শুরু হবার আগেই সেখান থেকে চলে যেতেন।

যতীন্দ্রনাথ যা আয় করতেন তা থেকেই চলত এখানকার খরচ আর বিপ্লবীদের রাহাখরচ। এইখানে যতীন্দ্রনাথ একটা বন্দুক রেখে দিয়েছিলেন হঠাৎ আক্রান্ত হলে বিপ্লবীদের বাঁচানোর জন্য।

এইভাবে অনেকদিন চলার পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ নজর রাখতে লাগল বাগানওলা বাড়িটির ওপর। অনেকদিন ধরে তারবাগানের বাড়ির কর্মচারীদের ওপর নজর রাখার পর পুলিশ টের পেল যে এটি বিপ্লবীদের সাময়িক আশ্রয় আর রসদের জায়গা। বোমা আর গুপ্ত অস্ত্রের খোঁজে বারবার বাড়ির খানাতল্লাসি হওয়া শুরু হল।

এইরকম একবারের এক খানাতল্লাশির সময় পুলিশ যতীন্দ্রনাথের বন্দুকটা পেয়ে বাজেয়াপ্ত করল। জানা গেল বাড়ির মালিক আর বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা হলেন হালিশহরের যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে যতীন্দ্রনাথের চাকরিটি গেল। অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারবাগানের আশ্রয়টির খরচ চালিয়ে গেলেন তিনি। প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হলেও কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ালেন না।।

যুদ্ধ শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকে সাড়া দিয়ে যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন বোলপুরে। সেখানে শ্রীনিকেতনের পল্লীসংঠন বিভাগটির গঠনমূলক পরিকল্পনায় যোগ দিলেন। এই সময় শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুলের কৃষি ও শিল্পসংগঠনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহকারী ছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বিলিতি জিনিস বর্জন আর স্বাধীনতার বাণী নতুনভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথের বাড়িতেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পরে শেষজীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের ডাকে বোলপুরে গিয়ে আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন কবির সহকারী হয়ে।

এরকম স্বার্থশূন্য মানুষ আজকের দিনে একেবারেই দেখা যায়না। ভারতমায়ের অনামা সেবক যতীন্দ্রনাথকে জয়ঢাক সেলাম জানায়।

suchipotro

সিনেমা হল

মকড়ী

মহাশ্বেতা

সেটা ২০০২ সালের শীতকাল, মনে হয় বড়দিন হবে। নিউ মার্কেটের গ্লোব সিনেমা হলে বাবা মায়ের সাথে গেছিলাম একটা সিনেমা দেখতে। নাম মকড়ী। ভয়ের সিনেমা দেখতে আমার চিরকালই ভাল লাগে। সিনেমা শুরু হওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যে মাকড়সা- টাকড়সা কিছু দেখতে না পাওয়ায় হতাশই হলাম। তারপরই সেই ডাইনির বিশাল বাড়ি, তাতে মুরগী চোর ছেলেটা ঢুকে পড়ল। ভয়ে ভয়ে অন্ধকার হলঘরে ঢুকল, তার একদিকে বিশাল একটা চেয়ার, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে উঁচু মত একটা জায়গা। তার ওপর ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াতেই ঝপাৎ করে একটা পর্দা এসে নেমে চার দিক দিয়ে ঘিড়ে ফেলল তাকে। তারপর? পর্দা উঠতেই দেখে, চোরের বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা---

-- সে গ্রামে থাকত চুন্নি আর মুন্নি বলে দুই যমজ বোন। বাড়িতে তাদের বাবা ও ঠাকুমা। মা মারা গেছে। দেখতে অবিকল একরকম হলে হবে কি, মুন্নি যেমনি শান্ত, ভিতু, পড়াশোনায় ভাল, চুন্নি তেমনি ডানপিটে আর ভয়ডরহীন। তার প্রিয় বন্ধু হচ্ছে মুরগির দোকানীর পোষ্যপুত্র মুঘল- ই- আজম। ভালই আছে তারা। চুন্নি চারিদিকে দুষ্টুমি করে বেড়ায় আর কেউ ধরতে এলেই গালে একটা নকল তিল লাগিয়ে মুন্নি সেজে তাদেরকে বোকা বানিয়ে হাত ফস্কে পালায়। কিন্তু এমনই একদিন বোকা বানানোর ফলে মুন্নি তাড়া খেয়ে ঢুকবি তো ঢোক, সোজা ডাইনির বাড়িতে। চুন্নি তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে ঢুকে দেখে মুন্নি নেই, তার বদলে আছে একটা মুর্গি! তাই দেখে সে ডাইনির পায়ে পড়ল। মুন্নিকে মানুষ বানিয়ে দেওয়ার জন্য হাজার কাকুতি মিনতি করল। ডাইনি তখন রাজি হল, কিন্তু একটা শর্তে। প্রতিদিন একটা একটা করে একশোটা মুর্গি এনে হাজির করতে হবে তার কাছে। তবেই সে মুন্নিকে আবার মানুষ করে দেবে। আর সে কথা কাউকে বলা চলবে না, নইলে--

বাকিটা চুন্নির লড়াইয়ের গল্প। সারাদিন চুন্নি ও মুন্নি দুই সেজে থাকা, আর রাতের অন্ধকারে যেখান থেকে হোক, মুর্গি এনে ডাইনির হাতে তুলে দেওয়া। আর এত বড় কথাটা কাউকে না বলে বুকে চেপে রেখে দেওয়া। চুন্নির প্রায় ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। কিন্তু সে হাল

ছাড়ল না। নিজের মনের জোর, বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে কীভাবে সে বোনকে উদ্ধার করল, আর ফাঁস করল বিশাল এক ষড়যন্ত্র - এটার গল্পই বলে 'মকড়ী'।

শুধু রহস্যই নয়, হাসির খোরাকও আছে প্রচুর এ ছবিতে। গ্রামের মানুষ প্রত্যেকে বিচিত্র---- পাগল মুর্গিওয়ালা কাল্লু থেকে শুরু করে মোটা পুরুত প্রত্যেকেই হাসায়। তাছাড়া আছে চুন্নির নানা শয়তানী, ও মুঘল- ই- আজামের সাথে বন্ধুত্ব। কিন্তু সবশেষে আছে ওই ভয়কে জয় করবার গল্প। ছবির সুরও পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজের নিজের দেওয়া, আর গানগুলো একেবারে জমজমাট। আমার প্রিয় অবশ্য কাল্লুর মুর্গিদের নিয়ে গাওয়া গানটা।

যারা মকড়ী দেখনি তারা শিগগিরি দেখে ফেল আর লিখে পাঠাও জয়ঢাককে কেমন লাগল।

<u>তথ্যঃ</u>

নাম- মকড়ী

পরিচালনা- বিশাল ভরদ্বাজ

সাল- ২০০২

ভাষা- হিন্দি

রেটিং- একা দেখা যায়, তবে ভয় লাগতে পারে। বাবা মা, বা বড়ো দাদা/দিদির সাথে দেখলে ভাল।

suchipotro

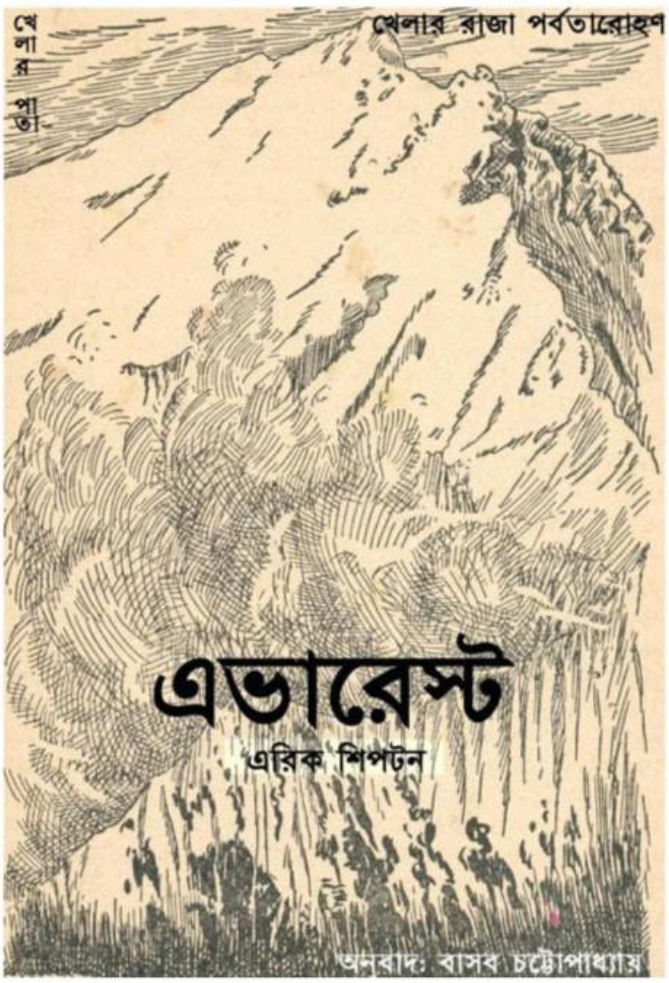

বিকল্প পথ, উত্তর- পূর্ব গাত্রের চূড়া থেকে আড়াআড়িভাবে দৃশ্যমান ছোট উপত্যকার শীর্ষস্থান পৌঁছে ব্ল্যাক ব্যান্ডের নীচ দিয়ে উত্তর গাত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অভিযানের দ্বিতীয় ধাপে এসে পৌঁছোন জায়গাটার ১০০ গজের মধ্যে তার অবস্থান। এই ছোট্ট উপত্যকাই গ্রেট কুলিয়র নামে পরিচিত। পশ্চিম পর্যন্ত এটি এমন একটি শৈলশিরার দ্বারা বেষ্টিত যা ব্ল্যাক ব্যান্ডের প্রাচীরে একটি সুরক্ষিত ফাটলপথ নির্মাণ করেছে। নর্টন এই পথটি নির্বাচন করলেন এবং সে পথে গ্রেট কুলিয়র পৌঁছনো সত্ত্বেও প্রধানত শারীরিক ক্লান্তির কারণে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলেন। এছাড়া ঝুলন্ত পাথরের স্তর থাকায় সেই পথ আরোহণ করা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। রিজ ধরে অগ্রসর হওয়ার পথটিকেই ম্যালোরি নিরাপদ মনে করে দক্ষ শৈলারোহীদের দলভুক্ত করলেন।

অধিকাংশ সদস্যই ঐ আবহাওয়ায় অগ্রসর হতে সমর্থন জানালেন। কোন অভিযান চলাকালীন পনেরো দিনব্যপী ভালো আবহাওয়ার কোন পর্যায় মিললে তা অভিযাত্রীদের পক্ষে অনুকূল সময় নির্দেশ করে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ এবং জুন মাসের প্রথম দিক, আরোহীদের পক্ষে অভিযান খুবই বিপজ্জনক। শুরু হয় তুষার ঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টির মরসুম। ঝুরো বরফে ঢেকে যায় হিমালয় এবং আরোহণের পক্ষে পথ হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। অতএব অভিযান তখনই সফল হবে যখন সঠিক অভিযাত্রীর সঠিক মুহূর্তে, সঠিক স্থানে, সঠিক অবস্থার মেলবন্ধন ঘটাবে।

পরিবেশের সাথে শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার (Acclimatization) সঠিক পর্যায়ভুক্ত অবস্থা সম্পর্কে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত অভিযাত্রীদের স্বচ্ছ কোন ধারণা ছিল না। পরবর্তী সময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানা গেল চতুর্থ শিবিরে যে ব্যক্তি যত দ্রুত পৌঁছতে পারবে, তার

সক্ষমতা শীর্ষে অগ্রসর হবার উপযুক্ত। কিন্তু ঐ শিবিরে পৌঁছতে বিলম্ব হলে ধরে নিতে হবে ঐ ব্যক্তির পক্ষে শীর্ষারোহণ প্রায় অসম্ভব।

সে সময় আরোহীদের মধ্যে অক্সিজেন ব্যবহারের প্রতি নির্ভরতা ছিল না। ১৯২৮ সালে নর্টন এবং সামারভেল শৃঙ্গের ৯০০ ফুট নীচ পর্যন্ত অক্সিজেন ছাড়াই পৌঁছে গেছিলেন। আবার অক্সিজেন ব্যবহার সত্ত্বেও ম্যালোরি ও আরভিনের মৃত্যু হল। একদিকে যেমন অক্সিজেন সিলিন্ডারের ওজন ঐ উচ্চতায় ব্যবহারের সাজসরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হওয়ায় তা বহন করার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক, তার পাশাপাশি এটাও ঠিক যে এইধরণের কৃত্রিম সাজসরঞ্জাম ব্যতীত শৃঙ্গারোহণ অত্যন্ত কঠিন। সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত হল ১৯৩৩- এর অভিযান হবে কৃত্রিম অক্সিজেন ব্যতীত।

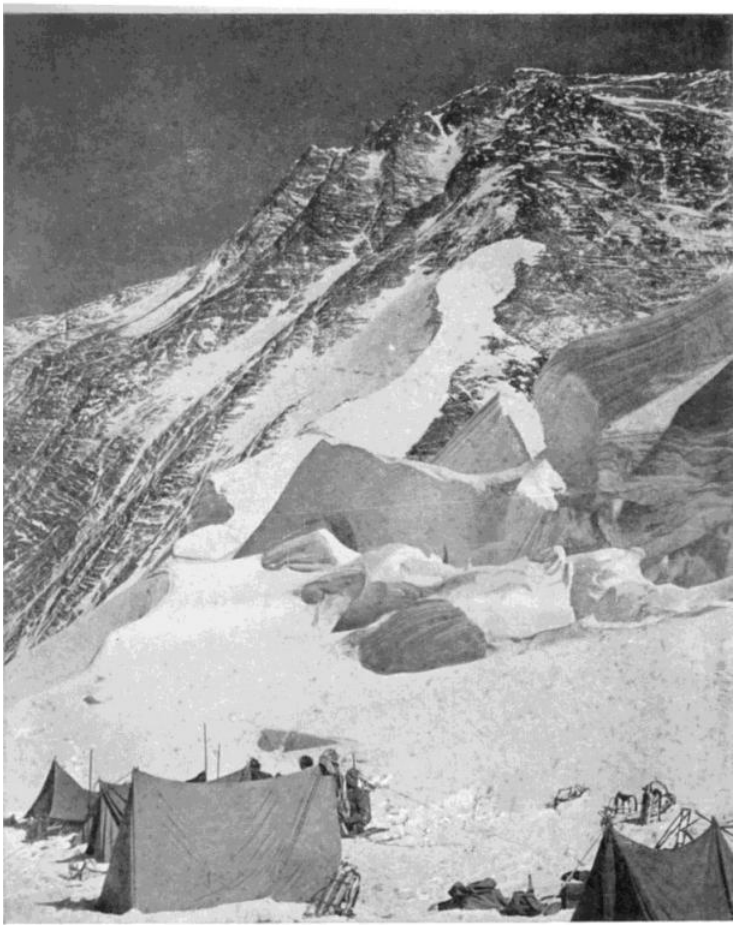

১৬ এপ্রিল আমরা রংবুক পৌঁছলাম। তিনদিন পর বেসক্যাম্প থেকে মাল ফেরি করা শুরু হল। ২রা মে পূর্ব রংবুক গ্লেসিয়ারের উপর দিকে তিন নম্বর শিবির স্থাপন করা হল। সামনে তখন দৃশ্যমান নর্থকলের পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ ঢাল। কঠিন তুষারাচ্ছাদিত এই অঞ্চল ১৫০০ ফুট বিস্তৃত। ধীরে চলমান এই হিমবাহের প্রতি বছর রূপ পরিবর্তিত হয়। ফলে আমাদের কাজ তখন মই এবং দড়ির সাহায্যে পথ অন্বেষণ এবং মালবাহকদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

পথ তৈরি করতে আমরা সকলে মিলে হাত লাগালাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে তৃতীয় শিবির থেকে পায়ে হেঁটে পর্বতসমষ্টির উঁচু দুই শিখরের মধ্যবর্তী নীচুস্থানে (col) পৌঁছলাম। তীব্র বায়ুর প্রভাবে শাখানদীর অববাহিকার উপর আচ্ছাদিত বরফের উপর ঝুরো বরফের চিহ্ন দেখা গেল না। আমরা যেন হাঁটতে লাগলাম একটা আইস স্কেটিং রিঙ্কের উপর দিয়ে। শক্ত বরফের উপর হাঁটার অভ্যাস না থাকলে এক পা অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। বরফ কেটে সিঁড়ি তৈরি করে আরো উচ্চতর স্থানে পৌঁছনো পর্বতারোহীদের পক্ষে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কিন্তু তার চেয়ে কঠিন সেই শক্ত বরফের চাদরে পিটন পুঁতে দড়ি

১৯৩৩ অভিযানের রুট ম্যাপ

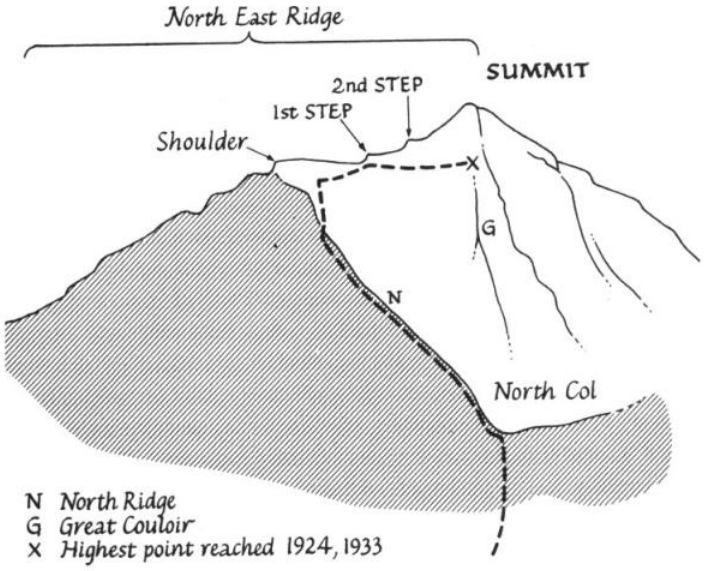

লাগিয়ে আরও উচ্চে পৌঁছনো। অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমে এই উচ্চতায় আবার শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। ২০ মিনিটে আইস অ্যাক্স দিয়ে কেটে বানানো যায় একটি মাত্র বরফের ধাপ। তবে মুশকিল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিনেই ধাপ কেটে কেটে আমরা আকাঙ্খিত উচ্চতায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছেও তীব্র তুষার ঝড়ে এবং সারাদিন ধরে চলতে থাকা হাওয়ার দাপটে অভিযাত্রীদের পক্ষে নিজেদের অন্যান্য কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

ছবিঃ সার ফ্রানসিস ইয়ংহাজব্যান্ডের “এভারেস্ট দা চ্যালেঞ্জ বই থেকে)
ম্যাপঃ আনসওয়ার্থ- এর ‘এভারেস্ট’ বই থেকে।

suchipotro